বিশেষ সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গ

মার্চ-অক্টোবর, ২০২১

তৃতীয়বার

শপথ

চক্ষুদানের মুহূর্তে

উত্তরবঙ্গ সফরের একটি মুহূর্ত

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মুখপত্র

মার্চ-অক্টোবর, ২০২১

বর্ষ-৫৩ সংখ্যা ১১-১২
বর্ষ-৫৪ সংখ্যা ১-৬

মূল্য : ৫০ টাকা

সূ • চি • প • ত্র

সম্পাদকীয় ৩

নতুন রেকর্ড গড়ে ভবানীপুরে
মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিপূরণের জয় ৪

দার্জিলিং সফর: ৬
পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান শিল্পের উন্নয়নে

প্রতিশ্রুতির রূপায়ণ ১০

- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ১০
- পড়াশোনায় অর্থ বাধা নয় ১৪
  দেশে প্রথম স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড এই রাজ্যে
- 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের টাকা দ্বিগুণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ২৬
- বাংলা সহায়তা কেন্দ্র ৩৪

আমূল পরিবর্তনের পথেই বিপুল জয় ৩৫

তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রীর শপথ ৬৬

নতুন রাজ্য মন্ত্রিসভার তালিকা ৭০

উন্নয়নের অভিমুখ ৭২

- 'দুয়ারে সরকার'-এর প্রশংসায় অমর্ত্য সেনের প্রতীচী ট্রাস্ট ৭২
- করোনার তৃতীয় ঢেউ ঠেকাতে
  শপথ নিয়েই রাশ ধরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৭৪

উপদেষ্টা সম্পাদক
প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী

প্রধান সম্পাদক
আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
সুপ্রিয়া রায়

সহ-সম্পাদক
রাতুল দত্ত সর্বাণী আচার্য

প্রচ্ছদ পরিচিতি
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয়বারের জন্য শপথ নিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদের ছবি: **অশোক মজুমদার**
প্রচ্ছদ অলংকরণ- **সুরজিৎ পাল**

সম্পাদকীয় শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), কলকাতা ৭০০ ০০১
দূরভাষ (০৩৩) ২২৫৪ ৫০৮৬ ই-মেল : editbengali@gmail.com
বিতরণ শাখা: ১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০, দূরভাষ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধিগৃহীত একটি সংস্থা) **১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত**

- ঘূর্ণিঝড় যশে বিধ্বস্ত বাংলা ৮২
  দুয়ারে ত্রাণ নিয়ে এলাকা পুনর্গঠনে জোর দিল রাজ্য সরকার
- রাজ্যের সঙ্গে যৌথভাবে ক্যানসার ৮৮
  প্রতিরোধে সামিল টাটারা
- শিক্ষকদের বদলিতে নতুন পোর্টাল 'উৎসশ্রী' ৯০
- 'বাংলার বাড়ি' দেশের মধ্যে সেরা পশ্চিমবঙ্গ ৯১
- বিশ্ব আদিবাসী দিবস ৯২
- জনগণ ও সরকার—মাঝে কেউ ছিল না ৯৬

দপ্তর কথা ১০০

- রাজ্যবাসীর সার্বিক উন্নয়নই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য ১০০
- খ্যাতির শীর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১০৯

সাক্ষাৎকার ১১০

- করোনা মোকাবিলায় সম্পূর্ণ তৈরি রাজ্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ১১০
  ডাঃ যোগীরাজ রায়ের সাক্ষাৎকার

বঙ্গদর্শন ১১৪

- পুজোর গন্ধে মেতেছে মানুষ ১১৫

বিশেষ নিবন্ধ ১১৬

- পর্যটন শিল্পে করোনার থাবা: বামাপদ গঙ্গোপাধ্যায় ১১৬
- পরিবেশ ও পাখি: তাপস কুমার দত্ত ১৩০
- ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব: সুব্রত ঘোষ ১৪০
- মিউকরমাইকোসিস: রাতুল দত্ত ১৪৬
- মিউজিক থেরাপি— ১৫১
  লকডাউনে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য : দীপাঞ্জনা রায়চৌধুরী

আমার জেলা ১৫৪

- ইতিহাসের আলোয় বর্ধমান : অরবিন্দ সরকার ১৫৪
- বনকাটি পিতলের রথ: প্রণব ভট্টাচার্য ১৭৮
- অজয় নদ—ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮
- জেলায় জেলায় শিক্ষাঙ্গন ১৯২

স • ম্পা • দ • কী • য়

তৃতীয়বার : আস্থার জয়

যুদ্ধ চলছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও করোনার বিরুদ্ধে। তবু চলে জীবন। অপ্রস্তুত হওয়ার উপায় নেই।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই পরিস্থিতিতে ভরসার স্থল হিসেবে পাশে পেয়েছে রাজ্য সরকারকে।

জন্ম-মৃত্যুর মাঝের সময়টুকু রাজ্যবাসীর প্রতিটি প্রয়োজনের সঙ্গে এই রাজ্যের সরকার জুড়ে রয়েছে। প্রকল্প শব্দটার মধ্যে যে অসীম ব্যাপ্তি আছে সেটাই নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিটি প্রকল্প যেন এক একটি ধাপ। প্রকল্পের সিঁড়ি দিয়ে তৈরি হল উন্নয়নের চূড়ায় ওঠার পথ। প্রান্তিক মানুষেরাও আজ ওখানে ওঠার স্বপ্ন দেখছে।

বিনা পয়সায় রেশন থেকে পরীক্ষার্থীদের হাতে ট্যাব কেনার পয়সা পাঠানো হয়েছে। এবার চালু হচ্ছে শিক্ষাঋণের জন্য ক্রেডিট কার্ড। দশ লক্ষ টাকার। বাড়ি বাড়ি রেশন পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় পাশাপাশি ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। টাকা যাচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।

জীবন গড়ে দেওয়ার ব্রতের পাশাপাশি প্রতিটি মানুষের সাধারণ চাওয়া-পাওয়া, অভাব-অভিযোগ মেটানোর দায়িত্ব সরকার তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। 'জননী সুরক্ষা' থেকে 'সমব্যথী' হয়ে জীবন-সীমার শেষ প্রান্তেও সরকারকে ডাকতে হচ্ছে, থাকতে হচ্ছে। শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদের জীবন আগলে রাখছে সরকার। শিশুআলয়, মিড-ডে-মিল, বৃদ্ধ ভাতা, বিধবা ভাতা, মানবিক, জয় বাংলা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, শিক্ষার নানা প্রকল্প—কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, ঐক্যশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী—আরও অজস্র প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গকে, পশ্চিমবঙ্গবাসীদের।

অতিমারী আরও বেশি করে এই নির্ভরশীলতার বন্ধনকে দৃঢ় করেছে। এই পারস্পরিক দৃঢ়তার প্রমাণ আবার তৃতীয়বারের জন্য বিপুল জয়।

এই সংখ্যায় সাম্প্রতিক রাজ্য বাজেট-সহ নিয়মিত বিভাগ রয়েছে। রয়েছে মূল্যবান প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন।

নিবন্ধ লেখকের মতামত নিজস্ব। অনিচ্ছাকৃত যে কোনও ত্রুটি মার্জনীয়।

নতুন রেকর্ড গড়ে ভবানীপুরে
মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিপূরণের জয়

ভবানীপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে নিজের রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়লেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ নির্বাচন হল। ২ অক্টোবর ঘোষণা হল ফল।

উল্লেখ্য, ২০১১ ও ২০২১ সালে, দু-বারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর উপনির্বাচনে জিতে বিধায়ক হলেন। এবং ভবানীপুর থেকেই। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি এখান থেকেই বিধায়ক হিসাবে জয়ী হয়ে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হন। ভবানীপুর একটি কসমোপলিটন এলাকা হিসেবে পরিচিত। পুরোনো কলকাতার এই বনেদি অঞ্চল এখন বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্মের ও সংস্কৃতির মানুষের আবাসস্থল, কর্মস্থল। এই অঞ্চল থেকে তিনি তিনবার বিধায়ক হলেন। অনায়াসে। বিধায়কের এলাকা উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো।

এই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা দু' লক্ষাধিক। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১-র নির্বাচনে ভোট দেন ১,৫৮,৫৮০ জন। বিগত দু-বারের জয়ের ব্যবধানের নিরিখে এবারের জয় এসেছে রেকর্ড ভোটের ব্যবধানে। ৫৮৯৪৩। ৭১.৯ অর্থাৎ প্রায় ৭২% ভোট পেয়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দী বিজেপির প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালকে পরাজিত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন ৮৫২৬৩টি ভোট। বিজেপি প্রার্থী পেয়েছে ২৬৩২০টি ভোট অর্থাৎ প্রায় ২২ শতাংশ ভোট। বামপ্রার্থী ৪২২৬টি ভোট পায় অর্থাৎ ৩.৫৬ শতাংশ।

এই জয়ের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সবচেয়ে আনন্দের দিকটি হল তিনি প্রতিটি ওয়ার্ডেই জিতেছেন। অবাঙালি অধ্যুষিত ৭০ ও ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের জয়ের বার্তাকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তুলে ধরার মতো একটি ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে।

ওয়ার্ড ভিত্তিক ফলাফলের দিনে তাকালে দেখা যাবে, ২০২১-র নির্বাচনে পিছিয়ে থাকা ওয়ার্ডগুলিতেও এগিয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৭০ নং ওয়ার্ডে ৪৭০ ভোটে পিছিয়ে ছিল নির্বাচনে। উপনির্বাচনে সেখানেই দেড় হাজারেরও বেশি ভোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৭৪ নং ওয়ার্ডে বিধানসভা নির্বাচনে পিছিয়ে থাকলেও ২১৬৭৯ ভোটে উপনির্বাচনে এগিয়ে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০২১-র নির্বাচনে ২৯২টি আসনে ভোট হয়। ২১৩টি আসন পায় তৃণমূল কংগ্রেস। বাকি আসন বিজেপির ঝুলিতে যায়। বিপুল ভোটে জয়ের নিশানায় এখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজেপি ও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। ফলাফলের ব্যাপারে জোরালো ভাবে কোনও মতামত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কিছুটা নিশ্চুপতা দেখা গিয়েছিল। একমুখী প্রত্যয় তেমন স্পষ্ট ছিল না। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জুড়ে গিয়েছিল বাংলার মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি সহ জীবনের অপরিহার্য দিকগুলির সঙ্গে। প্রান্তিক মানুষও ভাবতে শুরু করেছিল কোন দল নির্বাচন তাকে সুরাহা দেবে। প্রতিটি ভোটই ছিল গভীর আত্মবিশ্লেষণের ফসল। ভোটাররা সহজে মাটি ছেড়ে দেয়নি। সহজে তাদের বিভ্রান্ত করা যায়নি। ভোটারের সুচিন্তিত মতামত বা রায় অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে দেখা দেয়। বিপুল ভোটে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। দীর্ঘদিন এই রাজ্যে শাসনে থাকা কংগ্রেস ও সিপিএম অন্য একটি অতি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনে দাঁড়ালেও কোনও আসন তো পায়ই না, জামানত বাজেয়াপ্ত হয় অধিকাংশ কেন্দ্রে।

ভবানীপুরের বিধায়ক হিসাবে বিধানসভায় শপথ নিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ অক্টোবর, ২০২১।

এই জয়ের ফলাফল বাংলার মানুষের ঐক্যকে জোরালোভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই ভাবনার ধারা শুধু অব্যাহতই নয়। আরও বলিষ্ঠতা পেয়েছে। কারণ সরকার গঠন করেই নানা প্রকল্পের সুবিধা সকলের হাতে তুলে দিচ্ছেন। সরকারি পরিষেবার সুবিধা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে। কৃষকরা বছরে ১০০০ টাকা পাচ্ছেন। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের দশ লক্ষ টাকা ঋণের সুযোগ, লক্ষীর ভাণ্ডার—এইসব প্রকল্পের কাজ চার মাসের মধ্যেই সেরে ফেলে যে সরকার তাদের পাশে মানুষ এসে দাঁড়াবে এটাই তো স্বাভাবিক। আর হয়েছেও তাই।

জঙ্গীপুর আর সামসেরগঞ্জের উপনির্বাচনও এই সঙ্গেই হয়েছে। বিপুল ভোটে জয় এসেছে। ৩০ অক্টোবর আরও চার কেন্দ্রে উপনির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়।

জঙ্গিপুর বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী জাকির হোসেন ৯২,৫৭৭টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলেন এই উপনির্বাচনের মাধ্যমে। বিজেপি প্রার্থী সুজিত দাস পেয়েছেন ৪৩,৯৬৪টি ভোট। ২০২১-র নির্বাচনে এই কেন্দ্রে ভোট হয়নি। নিমতিতা স্টেশনের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ফেব্রুয়ারি মাসে স্টেশন চত্বরেই গুরুতর আহত হন এই প্রাক্তন মন্ত্রী। সুস্থ হয়ে ফিরে এসে তিনি মনোনয়ন জমা দিলেও জোটপ্রার্থী প্রদীপ নন্দীর মৃত্যুতে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। ৩০ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচন হয় এখানে।

এই উপনির্বাচনের আরেকটি কেন্দ্র ছিল সামশেরগঞ্জ। ৯৬,১২০ ভোট পেয়ে জয়ী হলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আমিরুল ইসলাম। কংগ্রেস প্রার্থী জইদুর রহমান ৭০,০৩৮টি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকল।

৩০ অক্টোবর ২০২১-এ চারটি বিধানসভায় উপনির্বাচন হয়। খড়দহ, গোসাবা, দিনহাটা ও শান্তিপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে ছিলেন যথাক্রমে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মন্ডল, উদয়ন গুহ ও ব্রজকিশোর গোস্বামী।

দার্জিলিং সফর

পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান শিল্পের উন্নয়নে

বাস্তব ছোঁয়া উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থক প্রয়োগই যে কোনও ক্ষেত্রে স্থায়ী সমাধানের পথ হয়ে ওঠে। দার্জিলিং-এ উত্তরের পাহাড়-অঞ্চলের মানুষের সমস্যাগুলোকে বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এটাই স্বাভাবিক।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গত ২৬ অক্টোবর, ২০২১-এ কার্শিয়াং-এ প্রশাসনিক বৈঠক করেন। পাহাড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কণ্ঠস্বরকে চুপ করিয়ে দিতে স্থায়ী সমাধানের পথেই সকলকে নিয়ে হাঁটতে উদ্যোগী হন। এই উদ্যোগের অগ্রভাগে রয়েছে পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি। তাদেরও উদ্দেশ্য, অস্থিরতার অবসান ঘটানোর পাশাপাশি এই অঞ্চলের স্থায়ী সমাধান।

মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি, ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার অনীত থাপাসহ একাধিক নেতা উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে সকলকে এক হয়ে উন্নয়নের কাজে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি বলেন, বাংলার মধ্যে দার্জিলিংকে রেখেই উন্নয়নের কাজ চালাতে চাই, এ ব্যাপারে পাহাড়ের মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে মদত করতে চান। 'শান্তির পক্ষে আমরা, আমরা উন্নয়নের পক্ষে।' এই কথা বারবার নানাভাবে তিনি বৈঠকে বুঝিয়ে দেন।

আগামী প্রজন্মের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের কথাও তিনি বলেন। মুখ্যমন্ত্রী, দার্জিলিং-এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব তৈরিকে প্রধান কাজ বলে মনে করেন। পর্যটন বা চা শিল্পের পাশাপাশি আইটি হাব করার অনুকূল পরিবেশ এখানে আছে বলেও অভিমত প্রকাশ করেন তিনি।

এই অঞ্চলের 'সবুজ'কে ব্যবহার করে উন্নয়নচিত্রকে সজীব করে তুলতে চান। পাহাড়ের পরিবেশকে কোনওভাবে নষ্ট করা যাবে না বলে উল্লেখ করেন। স্পষ্টতই বলেন, আর কংক্রিট নয়। পরিবেশবান্ধব পর্যটনের আরও বিকাশ দরকার। তাই এখানের ৭০০০ একর জমিকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। চা-বাগানের ১৫% জমিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই চা-পর্যটনের পাশাপাশি চা-বাগানগুলিতে আরও অনেক কিছুই করা যেতে পারে। ছোট ছোট শিল্পউদ্যোগ তৈরি ও বিপণন কেন্দ্র খোলার কথাও বলেন। পর্যটনমুখী শিল্পের প্রসারে আরও অনেক ধারার কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বর্তমানে তিনি রাজ্যের ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপের চেয়ারম্যান। ফলে শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছেই আসে। রাজ্যের সার্বিক শিল্পভাবনার চিত্রটি স্বভাবতই তাঁর কাছে এখন অনেক স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'আমার আগামীর লক্ষ্য হচ্ছে শিল্প। এক একটা এলাকায় এক একটি শিল্পভাবনা আসতে পারে।' তাই এগুলি নিয়ে ছোট ছোট পরিকল্পনা করে তাঁর কাছে পাঠাতে বলেন।

এখানে কৃষি, খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ, পশুপালনকে ভিত্তি করে শিল্পের বিকাশের কথা বলে আইটি হাব গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে বলেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের নিয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গড়ার কথা বলেন। এই অঞ্চলের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের নিয়ে রপ্তানি বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য দিক খুলে দেওয়ার কথা বলা হয়। স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এই কাজ করা যায়। ভোটার তালিকা সংশোধন করে জিটিএ নির্বাচন

করার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। জিটিএ-র দায়িত্ব দার্জিলিং-এর জেলাশাসকের ওপর দেন ওই বৈঠকে। দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েতের পরিবর্তে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের আইনসম্মত ব্যবস্থা করে এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা বলেন তিনি। অনীত থাপা জিটিএ-তে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করার কথা বললে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি জানান, নির্বাচনের আগে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ফিরলে সবই হবে।

উপস্থিত সচিব ও আধিকারিকরা নানা বিষয়ে অগ্রগতির খতিয়ান দেওয়ার পাশাপাশি নতুন পরিকল্পনা ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের নানা পথ বেরিয়ে আসে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্প ও কর্মসংস্থানে জোর দেওয়া হবে। পরিযায়ী শ্রমিকেরা এখানে বেশিরভাগই থেকে গিয়েছেন। নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। করোনার টিকাকরণের কাজ এখানে রেকর্ড মাত্রায় হয়েছে। নতুন কর্মোদ্যমে সামিল হচ্ছে পাহাড়ের মানুষ। এই উদ্যমকেই উদ্যোগে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর মুখ্যমন্ত্রী।

সমস্ত রকমের বিচ্ছিন্নতা রুখে দিয়ে 'পাহাড়ের রানি'-কে তিনি বিশ্ববাংলার মানচিত্রে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরতে চান। তৃতীয়বার বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণের পর পুজোর ছুটি কাটতেই তিনি প্রথম জেলাসফর শুরু করেন দার্জিলিং দিয়ে। তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তাঁর পাখির চোখ—শিল্প। এই বার্তাই দিয়ে এলেন উত্তরবঙ্গে।

ফেরানো যাবে না স্বাস্থ্যসাথী কার্ড কড়া নির্দেশিকা স্বাস্থ্য দপ্তরের : রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে এবার থেকে বাধ্যতামূলকভাবে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ করতে হবে সমস্ত সরকারি ও তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে না হলে সেই হাসপাতালের লাইসেন্স পর্যন্ত বাতিল করে দেওয়া হবে। এমনই কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। ২৫ অক্টোবর শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে আলোচনা করেন। এরপরেই এই সম্পর্কে অ্যাডভাইজারি জারি করে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

একইসঙ্গে 'স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে'র ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও যাতে কোনও ছাত্র-ছাত্রীকে বাধার মুখে পড়তে না হয়, সেজন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন মুখ্যসচিব ও স্কুলশিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিবকে। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক নার্সিংহোম স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড অবহেলা করছে। সরকারি প্রকল্পকে মান্যতা দিতেই হবে। না হলে তো তাদের লাইসেন্স বাতিল হতে পারে।' কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের আওতায় চিকিৎসা করাতে গিয়ে কলকাতা এবং নানা জেলায় বিভিন্ন নার্সিংহোম থেকে অনেক রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ২০১৬ সালে ৩০ ডিসেম্বর রাজ্যে সরকারিভাবে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি পরিবার প্রত্যেক বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুযোগ পায়। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১৯০০ প্যাকেজ রয়েছে। কিন্তু এর বাইরেও বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল টাকা নিচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে অভিযোগ এসেছে। নির্দিষ্ট প্যাকেজের বাইরে টাকা নেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। আরও বলা হয়েছে, হাসপাতালে ভর্তির সময় রোগীকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বা যে কোনও সরকারি প্রকল্পের কার্ড যেমন, ইএসআইসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম কার্ড বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম কার্ড দেখাতে হবে। এর ফলে একদিকে ভর্তি হওয়া সমস্ত রোগীর তথ্য যেমন নথিভুক্ত করতে সুবিধা হবে। আবার, অন্যদিকে রাজ্যবাসীর

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতের নাগালেই থাকবে।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড যদি কারও না থাকে, সেক্ষেত্রে হাসপাতাল থেকেই কার্ড করিয়ে দেওয়া হবে। সঙ্গে রাখতে হবে আধার কার্ড। অ্যাডভাইজারি-তে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও ভর্তির সময় কোনও রোগী যদি তা নিয়ে যেতে ভুলে যান, সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী পোর্টাল থেকেই নাম খুঁজে নেবে হাসপাতাল।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'লক্ষীর ভাণ্ডারে আবেদন করতে পারেননি অনেকে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকলে সেই সুবিধা কেও পাবেন না, এটা ভুল। অন্য নথি ঠিক থাকলে তাঁরাও সুবিধা পাবেন।'

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও সরকারি রেটেই বিল করতে হবে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ব্যবহার বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। সবাই যাতে এই কার্ডের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন এবং সব হাসপাতালে যাতে এই কার্ড গ্রহণ করা হয়, তার জন্যই এই নতুন নির্দেশিকা বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। অ্যাডভাইজারি-তে বলা হয়েছে, আপৎকালীন ক্ষেত্রে সার্জারি প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট প্যাকেজের বাইরে বেরিয়ে চিকিৎসার অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু, ওষুধ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ বাবদ সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা নেওয়া যেতে পারে। তার পরেই রোগীকে কোনও না কোনও প্যাকেজের আওতাভুক্ত করে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

পাশাপাশি, এদিনের বৈঠকে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা পেতে ব্যাংক বা সরকারের তরফে কোনও সমস্যা রয়েছে কি না তা দেখে নিতে। আধিকারিকেরা জানান, অনেক ব্যাংক কিছু করেনি। আবেদন পড়ে রয়েছে দুই-তিন মাস ধরে। সেগুলি অন্য ব্যাংকে নেওয়া হয়েছে। পুজোর পরে নতুন করে অনুমোদন দেওয়া শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, প্রতিদিন একবার করে দেখে নিতে কতগুলি আবেদন আটকে রয়েছে। আর সেগুলি কেন আটকে রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি চাই পড়ুয়ারা এই সুবিধা পাক। তাতে ব্যাংকেরও ভালো হবে।'

এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়েও আলোচনা করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্তাদের তিনি এদিন জানিয়ে দেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রাজ্যেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের রাজ্য থেকে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে চাকরির জন্য। সেখানে তাদের কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। থাকা-খাওয়ার জন্যও অনেক খরচ হয়। আমাদের উদ্যোগী হতে হবে এবং তাদের বোঝাতে হবে

যাতে তারা এখানেই থেকে যায় এবং ছোটোখাটো ব্যবসা শুরু করে। যুবক-যুবতীদের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে আমাদের—যার মাধ্যমে নানারকম কাজ করে তারা অর্থ রোজগার করতে পারে। রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে তিনি বলেন, রাজ্যের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক-এর তথ্য সাম্প্রতিক করতে।

২৫ তারিখের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিএসএফ-এর জুরিসডিকশন-এর বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে ৫০ কিলোমিটার ভিতর পর্যন্ত বিএসএফ তল্লাশি অভিযান চালাতে পারবে এবং রাজ্য পুলিশের অনুমতি ছাড়াই গ্রেফতার করা বা তল্লাশি করে প্রাপ্ত সামগ্রী নিজেদের হেফাজতে নিতে পারবে। এতদিন এই ক্ষমতা সীমানা থেকে ১৫ কিলোমিটার ভিতর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, এর ফলে রাজ্যের মোট ভৌগোলিক এলাকার প্রায় ৩৭ শতাংশ কেন্দ্রীয় প্যারামিলিটারি ফোর্স-এর হাতে চলে যাবে। বৈঠকে তাঁর অভিযোগ, 'রাজ্যের অভ্যন্তরে একটা বড়ো অংশের উপর আসলে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করতে চাইছে কেন্দ্র। বাংলাদেশ, ভুটান এবং নেপালের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো। বিএসএফ-এর ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন আমাদের রাজ্যে নেই।

প্রতিশ্রুতির রূপায়ণ

নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি রূপ পায় আন্তরিকতায়, আস্থায়। পারস্পরিক বিশ্বাসে।
তৃতীয়বার সরকার গঠন করেই 'কৃষকবন্ধু'র টাকা বাড়ানো হল। চালু হয়ে গিয়েছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প। পরীক্ষার আগে ট্যাব বা স্মার্ট ফোন কিনতে দশ হাজার টাকা দেওয়া হয় দ্বাদশের ছাত্র-ছাত্রীদের। এবছরও দেওয়া হচ্ছে। আর রাজ্যের উচ্চশিক্ষার বিস্তারে সূচনা হল—'স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড'-এর। অর্থাৎ, একই বন্ধনে বাঁধা পড়ল লক্ষ্মী-স্বরস্বতী। অন্নের আয়োজনের সঙ্গেই গড়ে উঠল এই মেলবন্ধন।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

মহিলারা পাবেন মাসিক ৫০০ এবং ১০০০ টাকা

অর্ধেক আকাশ জুড়ে যাদের অবস্থান, তাদের জন্য আজও না-পাওয়ার অনেকটা জমি পড়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গ এমন একটা রাজ্য যেখানে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিশ্বের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অংশ। পরাধীন ভারতবর্ষের এই অংশ প্রগতিশীলতায় এগিয়ে গিয়েছিল নজিরবিহীন সাফল্য সৃষ্টি করে। এই গতিশীলতা বাংলার নারীর জীবনেও শিকড় ধরে টান দেয়। আলোর জগতে উদ্ভাসিত হয় নারী। মধ্যযুগের অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটতে থাকে। বৈধব্যের ভয় কাটিয়ে মেয়েরা পা বাড়ায় শিক্ষার জগতে। বাংলায় এই কাজ শুরু হয় কয়েকজন মণীষীর হাত ধরে। তৈরি হয় মেয়েদের জন্য স্কুল।

শুরু হয়েছিল মহিলা চিকিৎসক তৈরির ভাবনা থেকে নারী শিক্ষার। আর আজ? বহুদূর পথ হাঁটা হয়ে গিয়েছে। বাংলার নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন আজ যেন গল্পকথা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে পথ দেখাচ্ছে এরাজ্যের মেয়েদের। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। শিক্ষার হাত ধরেই শক্ত করতে হবে নিজের হাত। পায়ের তলার মাটি।

কিন্তু দেশ আজ পরাধীন নয়। পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস পার হয়ে গেল। সবক্ষেত্রেই মেয়েরা আজ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সকলের কাছে সমানভাবে সুযোগ পৌঁছোয়নি, পৌঁছোয় না। তাই আর্থিক স্বচ্ছলতা অনেকের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে। সামান্য অর্থও অনেক মহিলার জীবনে আজ বড়ো প্রাপ্তির বিষয়।

এই রাজ্যে নানা ধর্মের, নানা বর্ণের মানুষ আছেন। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মহিলার পাশে অঙ্গীকারবদ্ধ বর্তমান সরকার। তাই প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা, যাদের কোনও স্থায়ী উপার্জন নেই, যাদের বয়স পঁচিশ থেকে ষাটের মধ্যে তাদের হাতে প্রতি মাসে কিছু অর্থ তুলে দিতে চেয়েছে। নিবার্চনের অঙ্গীকার পূরণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শপথ গ্রহণের পরেই। সাধারণ মহিলাদের ৫০০ ও তফশিলি জাতি ও আদিবাসী মহিলাদের ১০০০ টাকা করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে। এই প্রকল্পভুক্ত হতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক। এই কাজ শুরু হয়েছে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন থেকে। দুয়ারে সরকারের শিবিরে ফর্ম নিয়ে পূরণ করে জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে আগস্টের মাঝামাঝি থেকে। সুতরাং নিজস্ব এলাকায় বসেই এই

কাজ করতে পারছেন মহিলারা। দূরে যেতে হচ্ছে না। একা একা গিয়েই একাজ করতে পারছেন। এর ফলে মহিলারা বিশেষ সুযোগ নিতে পারছেন। দুয়ারে সরকার প্রকল্পের এটা একটা বড়ো সাফল্য।

এই সুবিধা অবশ্য সকলের জন্য নয়। সরকারের অন্য যেসব প্রকল্পে যারা আর্থিক সহায়তা পায় তারা এটা পাবে না। সমাজকল্যাণ দপ্তর দীর্ঘদিন ধরেই বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা দিয়ে থাকে। সম্প্রতি তপশিলি ও আদিবাসী মহিলারা ষাটের ওপর বয়স হলে প্রকল্পের মাসিক ভাতা পাচ্ছেন। মানবিক প্রকল্পের মাধ্যমে অন্যভাবে সক্ষম মহিলারাও ভাতা পাচ্ছেন। কন্যাশ্রীর মাধ্যমে মেয়েরা টাকা পাচ্ছে।

ফলে দেখা যাচ্ছে, এক বিরাট অংশের মহিলারাই প্রতি মাসে সরকারের কাছ থেকে স্থায়ীভাবে কিছু আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে।

মহিলারা যতটুকু উপার্জন করে ততটুকু তারা নিজের অথবা পরিবারের জন্য ব্যয় করে। জীবনের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি খুব জরুরি বিষয়। বিভিন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে, পরিবারে মেয়েদের হাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও টাকা পয়সা দেওয়া হয় না। কমবেশি হিসেব এখন সকলেই বোঝে। ফলে টাকা-পয়সার সঠিক ব্যবহারে তাদের অসুবিধা হয় না।

যাদের হাতে এক পয়সা আসত না, মাস গেলে হাতে পাঁচশো বা হাজার টাকা তাদের কাছে অনেক। মুখে তাদের হাসির ঝলক একথা ভেবেই। অনেক পরিবারে মেয়েরা সব ধরনের কাজ করতে পারে না। তাদের কাছে এটা স্বস্তির বিষয়। সম্মানেরও। সরকার, বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই। সকলেই শিক্ষাগত যোগ্যতায় চাকরি পাওয়ার উপযুক্ত নয়। কিন্তু কিছু কাজ করে কিছু উপার্জন করতে চান। ঘর সংসারের দায়িত্বও মূলতঃ তাদের। বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। অথচ সংসারের জন্য সারাটা দিন, সারাটা জীবন চলে গেলেও তারা কপর্দকশূন্যই থেকে যায়।

গত কয়েকবছর ধরে একের পর এক আঘাত নেমে এসেছে ভারতীয় অর্থনীতিতে। সর্বভারতীয় অর্থনীতির এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতির শিকার হয়েছে বাংলার মানুষও। ভেঙে পড়েছে অনেক সংসারের আটপৌরে কাঠামোও। যেমন, মধ্যরাতের কেন্দ্রীয় সরকারের 'নোটবন্দী'-র ঘোষণা (২০১৬-র ৮ নভেম্বর)। সেই মুহূর্তেই যিনি গর্জে উঠেছিলেন তিনি হলেন এই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দোপাধ্যায়। অবিবেচকের মতো সরকারের এই ঘোষণায় চমকে উঠেছিল আপামর দেশবাসী। বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়ালো রাজ্য সরকার। থমকে যাওয়া অর্থনীতির বদ্ধ জলে হাঁপিয়ে উঠল মানুষ। যেন খাবি খেতে লাগলো।

সেই দুঃসহ দিনগুলো ইতিহাসে স্থায়িত্ব পেয়েছে। অনেক বেশি উজ্জ্বলতা নিয়ে ধরা আছে সেই ছবিও যেখানে দেখি, নোটবন্দীর প্রতিবাদে পথে নেমেছেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। বাংলার বাইরে কর্মহীনতায় আটকে পড়া মানুষের, মূলত শ্রমিকদের ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হয় নতুন করে শিল্প উদ্যোগ শুরু করার জন্য বা ছোটখাটো ব্যবসার জন্য। তিনি ঘোষণা করলেন 'সমর্থন' প্রকল্প।

আচমকা নেমে এল করোনার থাবা। ২০২০-র মার্চ। সারা বিশ্ব জুড়ে নেমে আসা অতিমারীর তীব্রতায় দিশাহারা সকলে। উন্নত বিশ্বের মৃত্যুসংখ্যায় হতচকিত বাকি বিশ্ব। ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে ঘরবন্দী মানুষ। কাজকর্ম শিকেয় উঠল। ঘরে থেকেও রক্ষে নেই। রোগ ঘরে এসে ঢুকলো। টেনে নিয়ে গেল ঘরের মানুষকে চিরকালের জন্য। ঘরে, বাইরে সর্বত্র অসুস্থ মানুষকে সেবা করার লোকে ঘাটতি পড়লো। কাজহারা বাঙালিরা ভারত তথা বিশ্বের নানা জায়গা থেকে পাড়ি জমালো নিজের ঘরে। এখানে খাওয়ার অভাব রাখেনি সরকার। দিচ্ছে চিকিৎসার সুযোগ। 'স্নেহের পরশ' প্রকল্প ঘোষণা করা হল। এককালীন ১০০০ টাকা দেওয়া হল। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। সরাসরি। ফিরে আসা শ্রমিকদের দেওয়া হল ১০০ দিনের কাজের সুযোগ।

বিনা পয়সায় পর্যাপ্ত রেশনের পাশাপাশি মিড ডে মিলের খাবারের উপকরণ শিশুদের জন্য অভিভাবকেরা বাড়ি নিয়ে গেল। নিয়মিতভাবে। এখনও চলছে এই নিয়ম। প্রতিটি প্রকল্পের অর্থ সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অগ্রীম জমা পড়ছে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে।

'প্রচেষ্টা' প্রকল্পের মাধ্যমে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক দের জন্য মাথাপিছু এককালীন এক হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সামাজিক সুরক্ষা যোজনার সুযোগ-সুবিধা বা সামাজিক পেনশন না পাওয়া শ্রমিকদের জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে একটু সহায়তার কথা ভাবা হয়।

স্বনিভর দল তৈরি হয়েছে রাজ্যের মহিলাদের নিয়ে। গ্রাম, শহর, আধাশহর তো আছেই। পাহাড়ি এলাকার

মহিলাদের পাশাপাশি খরাপ্রবণ এলাকার মহিলারাও স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে আয় সৃজনে মাতলেন নানা প্রকল্পের হাত ধরে। একদিকে কাজের আনন্দ। আরেকদিকে নিজের হাতে উর্পাজনের খুশি।

দলের সদস্যরা স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা পেলো। সমাজসাথীর সুবিধা তো ছিলই বিপদে আপদে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখগুলি প্রতিদিনই একটু একটু করে উজ্জ্বল হতে লাগল। ঘরের শিশু কিশোর কিশোরীরা দল বেঁধে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। পাচ্ছে খাবার। বইখাতা। জামা-জুতো। ভাতা। বৃত্তি। সাইকেল। উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক টাকা মাসে মাসে। কখনও এককালীন অনেক টাকা। নতুন করে বলার যদিও কিছু নেই। কিন্তু ফেলে আসা উজ্জ্বল পথের কথা মনে করাতে, মনে করতে ভালো লাগে। সেদিনের ছবিগুলো খুব পুরোনো হয়নি। দলবেঁধে 'সবুজসাথী'-র সাইকেলে চেপে ছেলেমেয়েরা মুক্ত বিহঙ্গের মতো চলেছে স্কুলে, কলেজে। 'শিশুআলয়'গুলো কচিকাঁচাদের কলতানে ছিল মুখর।

স্তব্ধতা নেমে এল। চোখে দেখা যায় না এমন এক ভাইরাস সব তছনছ করে দিল। সাজানো সংসার ছারখার হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি সংসার নিয়েই তো সমাজ, সরকার। সকলের জন্য চালু হল স্বাস্থ্যসাথী। চালু হল বিনা পয়সায় রেশন। তবুও অনটন চলেই।

তাই কাজহারা, আয়হারা, স্বজনহারা মানুষের পাশে আরেকটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সরকার নতুন করে ভাবতে লাগলো। 'লক্ষীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের মধ্যে বাধা পড়ল এই চিন্তার রসদ। 'জয় বাংলা' প্রকল্পের মাধ্যমে করোনার ঠিক আগেই তপশিলি জাতি ও আদিবাসী মহিলা যাদের বয়স ষাটের ওপর তাদের মাসে হাজার টাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এবার লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ২৫ থেকে ৬০-র মধ্যে যাদের বয়স ঘোরাফেরা করছে তাদেরও মাসে মাসে এক হাজার টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রান্তিক মানুষদের পুষ্টিগত উন্নয়ন খুব জরুরি বিষয়। রাজ্যে চল্লিশটি আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে। নানা কারণে তাদের মধ্যে কয়েকটি গোষ্ঠী উন্নয়নের দিক থেকে বেশ পিছিয়ে। নানা ধরনের প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বিরতিহীনভাবে এদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। তবুও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যাচ্ছে না নানা বির্পযয়ের কারণে। মহিলাদের হাতে তাই সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে মাসে মাসে হাজার খানেক টাকা পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগ সকলের কাছেই তারিফযোগ্য।

সাধারণ মহিলাদের জন্য মাস গেলে ৫০০ টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। তবে সবক্ষেত্রেই কিছু শর্তাবলী আছে।

(১) কারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন—

প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেক মহিলা সদস্য এই সুবিধা পেতে পারেন যদি—

- তিনি এই রাজ্যের বাসিন্দা হন।
- তাঁর বয়স ২৫-৬০ বছরের মধ্যে হয়।
- রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারি কোনও দপ্তরে স্থায়ী অথবা অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মীরা এই সুবিধা পাবেন না।

পাশাপাশি, সরকার অধিগৃহীত সংস্থা, পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মচারী যাঁরা নিয়মিতভাবে বেতন বা পেঁনশন পান, তাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারবেন না।

(২) আবেদনকারীর নিজের একার নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা সরাসরি তাঁর অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হবে। ওই অ্যাকাউন্টে আধার লিংক থাকা জরুরি।

(৩) আবেদনকারীর স্বাস্থ্যসাথী/আধার কার্ড না থাকলে, প্রাথমিকভাবে লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আওতায় তাঁর নাম প্রভিশনালি রেজিস্টার্ড হবে। এরপর তাঁর স্বাস্থ্যসাথী বা আধার কার্ড তৈরির কাজ হবে এবং পর্যায়ক্রমে তিনি লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

এই প্রকল্পের সুবিধা কোনও ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হলে অথবা সুবিধাভোগীর প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার শর্ত বা অবস্থা আর না থাকলে সরকারি এই আর্থিক সুবিধা বন্ধ করে দিতে পারে। সুবিধাভোগীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে।

নামকরণের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য। 'জাগো'। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সূচনালগ্নে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয় এই প্রকল্পে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতায়, শর্তাবলী মেনে, রাজ্যের প্রায় সকল মহিলাদের গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার জন্য এই প্রকল্প।

জাগরণের বাংলায় মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতায় জাগাতে এই জাগো প্রকল্প। স্থানীয় ভিত্তিতে মহিলারা একতাবদ্ধ হওয়ার মধ্যে নারীর শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। সচেতনতার প্রসার ঘটার পাশাপাশি বাস্তব সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। লিঙ্গবৈষম্যের হ্রাস তখনই সম্ভব ঘরের মহিলারা যখন নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি ঘরের মেয়েদের ক্ষমতায়নে ভরসা রাখতে পারবে।

এই রাজ্যে মেয়েদের উন্নতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একের পর এক প্রকল্প ও কর্মসূচি রূপায়িত হয়ে চলেছে।

জননীর সুরক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ও গর্ভবতী মায়ের জন্য যেসব পরিষেবা বিনা পয়সায় পাওয়া যায় সেগুলি সবক্ষেত্রেই বিবেচ্য। প্রসব ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন সকলের নজর কেড়েছে। শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এ রাজ্যে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রসূতিকে আগে থেকেই প্রসবকেন্দ্রের কাছাকাছি এনে রাখার জন্য প্রতীক্ষালয় গড়ে তোলা হচ্ছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের ফলে বাল্যবিবাহের প্রবণতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। মেয়েরা যে শুধু লেখাপড়া শেখাতেই আগ্রহী হচ্ছে তা নয়। শিক্ষার ফলে তাদের মধ্যে যেমন বোধের বিকাশ ঘটছে, তেমনি তারা অনেকবেশি প্রযুক্তিমুখী হয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে মহিলাদের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে প্রযুক্তির ব্যবহার তাদের শ্রম লাঘব করছে, সময় সাশ্রয় হচ্ছে। ঘর, সংসার, সন্তান সামলেও তারা দুটো পয়সা রোজগারে এগিয়ে আসছে। অর্থ উপার্জনের জন্য ঘরে বসেও কাজ করছে। 'উৎকর্ষ বাংলা'-র মাধ্যমে প্রান্তিক মহিলারাও প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। নানাবিধ কাজে তারা প্রশিক্ষিত হয়ে দক্ষ হয়ে উঠছে। নিজেরা ছোটোখাটো কিছু উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবতে পারছে। একজনকে দেখে উৎসাহিত হচ্ছে আরেকজন।

এখন প্রায় সকলের বাড়িতেই একটি অন্তত স্মার্টফোন আছে। কিংবা পরিচিত কারোর। ইউটিউব ব্যবহার করে নিজেরাও অনেক কিছু জানতে পারছে, শিখতে পারছে। একটু একটু করে ঘরের মেয়েরা, মহিলারা এই যে উন্নত হচ্ছে, এর ফলেই এই রাজ্যে নারীর ক্ষমতায়ন একটি বিশেষ মাত্রায় বাঁধা পড়ছে। কিশোরী মেয়েদের অপুষ্টিজনিত সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য প্রাথমিক স্তর থেকেই মেয়েদের আয়রণ ট্যাবলেট খাওয়ানো হয় রুটিনমাফিক। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই কাজ চলছে। নারীর প্রজননগত স্বাস্থ্যের উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে সবলা, কিশোরী শক্তি যৌজনার মতো প্রকল্প রপায়ণে কড়া নজর রেখেছে। অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বেড়েছে। শিশু, গর্ভস্থ শিশু ও গর্ভবতী মায়ের পুষ্টির বিষয়টিও এই কেন্দ্রের কাজের সঙ্গে অনেকাংশে যুক্ত। সুস্থ শিশু, সুস্থ মা সমাজের সম্পদ। রাজ্যের প্রজনন স্বাস্থ্যের ছবিটিও অন্যরূপ নিচ্ছে ধীরে ধীরে। এর ফলে, রাজ্যের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও সদর্থক দিক দেখা গেছে।

বর্তমানে, উন্নয়ন ভাবনায় মানবসম্পদ উন্নয়ন যে গুরুত্ব পাচ্ছে সেকথা এই রাজ্যের উন্নয়নের ধারায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হলেও মহিলাদের জন্য যেসব প্রকল্পের রপায়ণ চলছে সেগুলি সত্যিই কার্যকরী ও বাঁচার ছন্দে অনেক সাবলীলতা এনেছে।

এই প্রেক্ষাপটেই, শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো একটি প্রকল্প সার্বিক নারী উন্নয়নের পাশাপাশি এক বিশেষ সামাজিক উন্নয়নের অনুঘটক হয়ে উঠবে। বিন্দু বিন্দু জলে যেমন সিন্ধু তৈরি হয়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বিন্দু বিন্দু অর্থে তেমনি সম্ভব হবে কিছু সমস্যার মোকাবিলা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কোনও বিচ্ছিন্ন প্রকল্প নয়। সরকারের উন্নয়ন ভাবনায় বিভিন্ন স্তরে একের পর এক প্রকল্প রূপায়িত হয়ে চলেছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের যে কাজ চলছে রাজ্য জুড়ে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সেই ধারাতেই যেন আরেক সংযোজন। পম্পার মতো মায়েরা যেন হাতে স্বর্গ পাবে। দুই মেয়ের মা পম্পার স্বামী ওদের দেখে না। বাপের বাড়িতে থাকে। দুই মেয়ের পড়ার খরচ ওকে জোগাতে হয়। বাবাকেও হাতে কিছু দিতে হয়। এই টাকা পেলে মেয়েদের জন্য খরচ করতে পারবে।

তেমনি স্বপ্ন দেখে তানিয়া সুলতানা। টানাটানির সংসারে একটু তো সুরাহা হবে। প্রায় ষাট ছুঁইছুঁই সুখী হেমব্রম। বীরভূমের পল্লীগাঁয়ের সুখীর সংসারে সরকারের নানা প্রকল্প সুবিধা এনেছে অনেক। ও নিজেও মাসে হাজার টাকা পাবে। এটাই ওর জীবনের সবচেয়ে খুশির খবর।

প্রান্তিক মহিলাদের মতো শহুরে মহিলাদের ঘরেও খুশির আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

পড়াশোনায় অর্থ বাধা নয়

দেশে প্রথম স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড এই রাজ্যে

উল্টোরথের দিন দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিয়ে টাকা-পয়সার হিসেব নিয়ে বসেছিল সুবল মাইতি। বীরভূমের ছোট্ট শান্ত গ্রাম পদ্মাবতীপুর। গ্রামের শেষ মাথায় বড় শিরিষ গাছের নীচে সুবলের পাঁচমিশেলি জিনিসের দোকান। গরিব মানুষের গ্রামের বিক্রিবাট্টা তেমন নেই বললেই চলে।

কপালে ভাঁজ ফেলে অনেক ভেবেও সুবল কুলকিনারা করতে পারল না। কোথা থেকে এত টাকা জোগাড় হবে? এসব কি আর তাদের মতো ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য? কিন্তু ছেলেটা একেবারে জেদ ধরে বসে আছে। গোটা দেশের বড়ো সাহেব হওয়ার পরীক্ষা দেবে। কী যেন আই এ এস না কী একটা নাম। সুবল ঠিক মনে করতে পারল না।

সেই পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করতে দিল্লির একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে হবে। তার উপর দিল্লির মতো শহরে থাকা-খাওয়া সব মিলিয়ে বিস্তর খরচ। মাথায় হাত দিয়ে খানিক বসে রইল সুবল।

তবে কি ছোটোমেয়ের বিয়ের জন্য রেখে দেওয়া জমিটাই এবার.....?

এমনই প্রয়োজনে সুবলদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত সরকার। নির্বাচনের আগেই এ রাজ্যের পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে সাহায্য করার কথা ভেবেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩০ জুন নবান্ন থেকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের সূচনা করে সেই ভাবনাকেই এবার বাস্তব রূপ দিলেন তিনি।

প্রকল্পের লক্ষ্য

(১) দশম শ্রেণি থেকেই মিলবে এই ঋণের সুবিধা।

(২) ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, আইন, আই এএস, আইপিএস, ডব্লুউবিসিএস, এসএসসি, ইউপিএসসি, পিএসসি-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কোচিং ইনস্টিটিউটে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরাও এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন।

(৩) স্নাতক, স্নাতকোত্তর, নানা বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রম থেকে গবেষণা সমস্ত ক্ষেত্রেই এই ঋণ প্রযোজ্য হবে।

(৪) দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরেও পড়াশোনার জন্য এই ঋণের অর্থ ব্যবহার করা যাবে।

(৫) সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নেওয়া যাবে। সুদের হার ৪ শতাংশ।

কোন কোন ক্ষেত্রে এই শিক্ষাঋণের অর্থ ব্যবহার করা যাবে—

(১) পাঠ্যক্রমের ফি—স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া হবে।

(২) ছাত্রছাত্রীর থাকার খরচ—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হস্টেলে অথবা হস্টেলের বাইরে বাড়িভাড়া বা পেয়িং গেস্ট হিসাবে বাস করার খরচ।

(৩) কশন ডিপোজিট, বিল্ডিং ফান্ড, অন্যান্য ফেরতযোগ্য ডিপোজিট, পরীক্ষার ফি, লাইব্রেরী/ ল্যাবরেটরি ফি—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিল/ রশিদ জমা দিতে হবে।

(৪) বই, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট বা শিক্ষার কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি কেনার খরচ।

(৫) স্টাডি টুর, প্রোজেক্ট ওয়ার্ক বা থিসিস তৈরির খরচ।

(৬) অ-প্রতিষ্ঠানজনিত খরচ হিসাবে মোট ঋণের ৩০ শতাংশ একজন ছাত্র/ছাত্রী ব্যবহার করতে পারবে।

(৭) লিভিং এক্সপেন্সেস হিসাবে খরচ করা যাবে মোট ঋণের ২০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ।

সমস্ত ক্ষেত্রেই অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে রসিদ বা প্রমাণ জমা করতে হবে ছাত্রছাত্রীকে।

ছাত্রীছাত্রীর যোগ্যতা

(১) আবেদনকারীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং ১০ বছর এরাজ্যে বসবাস করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর সেল্ফ ডিক্লেয়ারেশন-ই এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হবে।

(২) আবেদনকারী ছাত্র/ছাত্রীর বয়স সর্বাধিক ৪০ বছর হতে পারে।

(৩) wbscc.wb.gov.in ওয়েবসাইটে রেজিস্টার করা যাবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য পৃথক ড্যাশবোর্ড থাকবে—যা নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উচ্চশিক্ষা দপ্তর এবং ব্যাংক দেখতে পারবে।

(৪) ছাত্রছাত্রীর আধার কার্ড বা দশম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে আবেদন করা যাবে।

(৫) উচ্চশিক্ষা দপ্তর সমস্ত খতিয়ে দেখে আবেদন পাঠাবে ব্যাংকের কাছে।

(৬) ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবক প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করলে ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড দেবে।

(৭) প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন নোডাল অফিসার থাকবেন যিনি ছাত্রছাত্রীর ড্যাশবোর্ড অ্যাকসেস করতে পারবেন।

(৮) প্রত্যেক সেমিস্টার বা বার্ষিক পরীক্ষার পরে পোর্টালে ফলাফল আপলোড করতে হবে।

ঋণের পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য

(১) সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা ঋণ পাওয়া যাবে বার্ষিক ৪ শতাংশ সরল সুদের হারে।

(২) সুদের হার ঋণের সম্পূর্ণ সময়কালের জন্য একই থাকবে।

(৩) পাঠ্যক্রমের যে কোনো সময়েই এই প্রকল্পের আওতায় ছাত্রছাত্রীরা ঋণ পেতে পারে।

(৪) ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকের ঋণের আবেদন করতে হবে।

(৫) ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবককে ব্যাংকের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে।

মার্জিন মানি

(১) চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য কোনো মার্জিন মানি লাগবে না।

(২) চার লক্ষ টাকার উপরে ঋণের আবেদনের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ অর্থ ছাত্রছাত্রী বা তাদের অভিভাবককে জোগাড় করতে হবে।

(৩) সেক্ষেত্রে স্কলারশিপের টাকা মার্জিন মানি-তে গণ্য করা হবে।

ঋণের জন্য কোল্যাটারাল সিকিউরিটি

(১) ঋণ মঞ্জুর করার সময় ব্যাংক কোনো শর্ত চাপাতে পারবে না।

(২) ব্যাংক কোনো কোল্যাটারাল সিকিউরিটি চাইতে পারবে না। শুধুমাত্র অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ-ই এক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে গণ্য হবে। রাজ্য সরকার ব্যাংকের সঙ্গে পৃথকভাবে এই বিষয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। রাজ্য সরকার নিজেই এই শিক্ষাঋণের গ্যারান্টার।

ইনসিওরেন্স

ছাত্র-ছাত্রীর নামে 'লাইফ-কভার', থাকবে—যত টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হবে সেই মূল্যের। ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম ছাত্রছাত্রীকে দিতে হবে অথবা তার ঋণের অংক থেকে তা কেটে নেওয়া যেতে পারে।

ঋণের অর্থ কীভাবে পাওয়া যাবে

(১) কোর্স ফি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য খরচের জন্য টাকা সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে চলে যাবে।

(২) কম্পিউটার, ল্যাপটপ, বই, লিভিং এক্সপেন্সেস-এর জন্য ঋণের টাকা ছাত্রছাত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।

ঋণ পরিশোধ

(১) ১৫ বছর ধরে ঋণ শোধ করা যাবে।

(২) ছাত্রছাত্রী বা তাদের অভিভাবক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে ব্যাংক কোনো পেনাল্টি বা প্রসেসিং ফি চাপাতে পারবে না।

(৩) পাঠ্যক্রমের সময়সীমার মধ্যেই সুদের পরিমাণ সম্পূর্ণ শোধ করতে পারলে ছাত্রছাত্রীদের ১ শতাংশ হারে সুদে ছাড় মিলবে।

(৪) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণের অংক ফেরত দিতে হবে।

(৫) ছাত্রছাত্রীদের ৪ শতাংশ হারে ঋণ দেওয়া হলেও অতিরিক্ত সুদের অংক প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য সরকারের তরফে ব্যাংককে প্রদান করা হবে।

(৬) পাঠ্যক্রম শেষ হওয়া অথবা চাকরি পাওয়ার (যেটি আগে হবে) এক বছর পর থেকে ঋণের অংক পরিশোধ করা যাবে।

মনিটরিং সিস্টেম

উচ্চশিক্ষা দপ্তর এবং স্কুলশিক্ষা দপ্তর থেকে জেলা ও রাজ্যস্তরের মনিটরিং কমিটি গঠন করা হবে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে ঠিকমতো এই ঋণের সুবিধা পায় তা নিয়ে নজরদারি করবে এই কমিটি। সরকারি এবং বেসরকারি সমস্ত স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প যাতে ঠিকমতো চলে—সেটাও দেখবে এই কমিটি।

পাবলিক গ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল সিস্টেম

এই প্রকল্প নিয়ে কারও কোনো ক্ষোভ থাকলে তিনি সরাসরি টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২ ৮০১৪-এ ফোন করে নিজের অভিযোগ জানাতে পারবেন। অথবা মেল করতে হবে support-wbscc@bangla.gov.in-এ। একজন উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকের নেতৃত্বে গঠিত সেল এই অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করবে।

স্কুল শিক্ষা দপ্তর এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। সেটি এখানে তুলে ধরা হল।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রেডিট কার্ড স্কীমঃ প্রশ্ন উত্তর		
ক্রমিক সংখ্যা	**প্রশ্ন**	**উত্তর**
সাধারণ পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রশ্ন		
১।	পশ্চিমবঙ্গ ক্রেডিট কার্ড স্কীমে ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকারি ওয়েবসাইট কি আছে?	পশ্চিমবঙ্গ ক্রেডিট কাড স্কীমে ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকারি ওয়েবসাইট পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা দপ্তরের banglaruchchashikkha.wb.gov.in অথবা http://wbscc.wb.gov.in contactwbscc@gmail.com
২।	পশ্চিমবঙ্গ ক্রেডিট কার্ড স্কীমের সহায়তার জন্য হেল্প ডেস্ক নম্বর ও ই-মেল কি?	পশ্চিমবঙ্গ ক্রেডিট কার্ড স্কীমের জন্য হেল্প ডেস্ক নম্বর: 18001028014 সহায়ক ই-মেল: support-wbscc@bangla.gov.in
৩।	রেজিস্ট্রেশনের পর ছাত্র-ছাত্রীরা কি নিশ্চিতকরণের জন্য SMS বা ই-মেল পাবেন?	হ্যাঁ, সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পরে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে নিশ্চিতকরণ SMS পাবেন।
৪।	অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের সময় কি কি নথিপত্র আপলোড করতে হবে? আপলোড করা নথিপত্রের মাপ কি হবে?	—দরখাস্তকারীর রঙিন ছবি (.jpeg/.jpg-এ করতে হবে/50 kb maximum এবং 20 kb minimum) —অভিভাবক/সহআবেদনকারীর রঙিন ছবি (.jpeg/.jpg-এ করতে হবে/50 kb maximum এবং 20 kb minimum) —ছাত্রের স্বাক্ষর (.jpeg/.jpg-এ করতে হবে/50 kb maximum এবং 10 kb minimum) —অভিভাবকের স্বাক্ষর (.jpeg/.jpg-এ করতে হবে/50 kb maximum এবং 10 kb minimum) —ছাত্রের আধার কার্ড (.pdf-এ করতে হবে এবং 400 kb maximum এবং 100 kb minimum) —ছাত্রের স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণপত্র (.pdf-এ করতে হবে এবং 400 kb maximum এবং 100 kb minimum) —ভর্তির রশিদ (.pdf-এ করতে হবে এবং 400 kb maximum এবং 100 kb minimum) —ছাত্রের প্যান কার্ড (যদি প্যান কার্ড না থশকে তাহলে পোর্টালে যে FORMAT দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী অঙ্গীকার পত্র) Upload করা নথি .pdf-এ করতে হবে এবং 400 kb maximum এবং 100 kb minimum)
৫।	এই স্কীমটি সম্পূর্ণ করার জন্য আবাসন শংসাপত্র এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শংসাপত্রের প্রয়োজন আছে কি?	ফর্ম ভর্তির জন্য আবাসন শংসাপত্র এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই
৬।	SSC Scheme-এর জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হিসেবে কাকে গণ্য করা হবে? আবাসনের প্রমাণ হিসেবে কোনও প্রমাণপত্র বা পথিপত্রের জমা দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি?	ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসনের প্রমাণ হিসেবে তাদের স্বঘোষণাকে মান্যতা দেওয়া হবে।

৭।	রেজিস্ট্রেশন ফর্মের হার্ড কপি পাঠানোর প্রয়োজন আছে কি?	না। আপনি নিজের কাছে রেখে দিতে পারেন ভবিষ্যতের জন্য।
৮।	কলেজ যদি সাহায্য না করে তবে কার কাছে সাহায্য চাইতে পারি?	নিজের প্রতিষ্ঠানের হেল্প ডেস্ক অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন অথবা State Help Desk (Toll Free No. 1800 1028 014 Support Mail ID: Support-wbscc@bangla.gov.in contactwbscc@gmail.com)
৯।	SCC Scheme-এ ছাত্র-ছাত্রীরা কি পরিমাণ ঋণ পেতে পারে?	এই SCC Scheme-এ ছাত্র-ছাত্রীরা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন।
১০।	কি কি কারণে ঋণ চাওয়া হতে পারে?	নিম্নলিখিত প্রয়োজনগুলির কারণে ঋণের টাকা ব্যয় করা যেতে পারে: বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের ফি দেওয়ার জন্য, যেমন-স্কুল/কলেজ/ইউনির্ভাসিটি/বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান/ কোচিং ক্লাস যেখানে পড়েন তার ফি। এছাড়াও UPSC/SSC/PSC-র প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য Coaching Institute-এর ফি ও SCC Scheme—এর আওতায় আছে। এর মধ্যে ফেরতযোগ্য টাকা/পরীক্ষা/Library/Laboratory ফি (স্কুলের বিল অথবা রসিদ দ্বারা প্রমাণিত) অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া হোস্টেলের থাকা, বাড়ি ভাড়া করে থাকা, হোস্টেলের বাইরে থাকার জন্য ঋণের টাকা ব্যয় করা যাবে।
১১।	SCC পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুমোদিত ঋণের টাকা শতকরা কতখানি অংশ কোন প্রয়োজনে ব্যয় করা যাবে?	কোনও নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক কোর্স সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত থাকা খাওয়ার জন্য ঋণের ২০% ব্যয় করা যাবে। নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক course সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ঋণের টাকার 30%-এর বেশি অপ্রতিষ্ঠানিক কারণে ব্যয় করা যাবে না।
১২।	প্রতিষ্ঠানকে দেয় টাকা কিভাবে নিতে হবে?	নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ফি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রদানযোগ্য অন্যান্য টাকা সরাসরি ওই প্রতিষ্ঠানের Bank A/c.-এ চলে যাবে।
১৩।	অপ্রতিষ্ঠানিক ব্যয় অথবা কোর্স চলাকালীন ছাত্র বা ছাত্রীর থাকা খাওয়ার ব্যয়ের টাকা কিভাবে নিতে হবে?	এই ধরনের ব্যয়ের জন্য টাকা ছাত্রের রেজিস্টার্ড Bank Account-এ দেওয়া হবে।
১৪।	এই ঋণের জন্য কোন NOC লাগবে কি?	Scc স্কীমে আবেদন করার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হল পশ্চিমবঙ্গের কোন বোর্ডের থেকে ক্লাস নাইন পাশ। আবেদনকারী ছাত্রকে ক্লাস X অথবা XII-এর স্বীকৃত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অথবা Coaching ইনস্টিটিউট-এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভর্তি হতে হবে অথবা ডাক্তারী/ইঞ্জিনিয়ারিং/আইন বা UPSC/PSC/SSCএর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কোচিং/ ইন্সিটিটিউটে ভর্তি হতে হবে। আবেদনকারী ছাত্রকে অথবা পরিবারকে অন্তত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

১৬।	যদি আগের বছর বা Semester-এর সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারে তাহলে পরের বছরের Course Fee-র জন্য ঋণের আবেদন কি করা যাবে?	হ্যাঁ, যে পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তার মধ্যেই আবেদন করতে হবে।
১৭।	ঋণের কিস্তি পাওয়ার জন্য প্রতিটি Semester-এর পর Marksheet-এর Copy Bank-এ জমা দেওয়া কি আবশ্যক?	Bank-এর নিয়ম অনুযায়ী যা যা নথিপত্র জমা দেওয়া প্রয়োজন ঋণের কিস্তির জন্য জমা দিতে হবে।
১৮।	কোন Final Year-এর ছাত্র বা ছাত্রী SCC স্কীমে কি আবেদন করতে পারে?	হ্যাঁ। কোর্স চলাকালীন যে কোন সময়ে ছাত্র বা ছাত্রী এই স্কীমের জন্য আবেদন করতে পারে।
১৯।	অন্য কোন রাজ্যের বাসিন্দা হলে এই স্কীমের জন্য কি আবেদন করতে পারে?	না। যে ছাত্র বা ছাত্রীর পরিবার অন্তত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেছে শুধু তারাই এই স্কীমে আবেদন করত পারে।
২০।	আমি যদি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হই এবং অন্য কোন রাজ্যে পড়াশোনা করি তাহলে কি আমি এই স্কীমে আবেদন করতে পারি?	হ্যাঁ। পশ্চিমবঙ্গের কোন স্বীকৃত বোর্ডের স্কুলে দাম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে থাকলে, অথবা পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষের অন্য যে কোন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান অথবা কোচিং Institute-এ ভর্তি হলে ঋণের আবেদন করতে পারবে। ডাক্তারি/ইঞ্জিনিয়ারিং/আইন অথবা UPSC/SSC/PSC-র প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য Coaching Centre-এ ভর্তি হলে ও পারবে আবেদনকারীর পরিবার যদি অন্তত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।
২১।	আমি কি SSC স্কীমে ঋণ পেতে পারি যদি আমি পশ্চিমবঙ্গের নিবাসী হয়ে ভারতবর্ষের অন্য কোন জায়গায় পড়াশোনা করি?	হ্যাঁ। বাইরে পড়াশোনার জন্য ঋণ পাওয়া যেতে পারে।
২২।	SCC স্কীমে ঋণ পাওয়ার জন্য কত শতাংশ নম্বর পেতে হবে?	SCC স্কীমে ঋণ পাওয়ার জন্য প্রাপ্ত নম্বরের কোন সম্পর্ক নেই।
২৩।	আমি ঋণ না নিয়ে কি Credit Card ফেরত দিতে পারি?	হ্যাঁ। আপনি ঋণ প্রদানকারী Bank-কে Credit Card ফেরত দিতে পারেন।
২৪।	Credit Card আমার ভাই বা বোনকে Transfer করতে পারি?	Credit Card ট্রান্সফার করা যাবে না।
২৫।	Credit Card হারিয়ে অথবা চুরি গেলে কি করব?	আবেদনকারীকে স্থানীয় Police Station-এ যোগাযোগ করত হবে।
২৬।	Card নষ্ট হয়ে গেলে, Duplicate Card-এর কি ব্যবস্থা আছে?	ঋণ প্রদানকারী Bank-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
২৭।	আমার ঋণের আবেদন মঞ্জুর হল কি না কিভাবে জানাব?	আপনার Regd. Mobile No.-এ SMS পাবেন।
২৮।	আমি আমার SCC কিভাবে পাব?	ঋণ মঞ্জুর হয়ে গেলে Bank আপনাকে Credit Card দেবে।

২৯।	সমস্যা জানানোর জন্য কোন Grievance Cell আছে কি?	সমস্যা সমাধানের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: State Help Desk No. 18001028014 Support Mail Id: support-wbscc@bangla.gov.in contactwbscc@gmail.com
৩০।	আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের সুবিধা পশ্চিমবঙ্গ ক্রেডিট কার্ড স্কীমে আছে কি?	না। SCC স্কীমের সুবিধা শুধুমাত্র অনুমোদন প্রাপ্ত Bank-ই দিতে পারবে।
৩১।	আবেদন করার জন্য উপার্জনের কোন উর্দ্ধসীমা আছে কি?	না। আবেদন করার জন্য উপার্জনের কোন উর্দ্ধসীমা নেই।
৩২।	আবেদন করার জন্য বয়সের কোন উর্দ্ধসীমা আছে কি?	না। আবেদনের জন্য আবেদনকারীর বয়স ৪০ বছর অতিক্রম করা যাবে না।
৩৩।	স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে Integrated Course-এ ভর্তি ছাত্ররা কি আবেদন করতে পারবে?	হ্যাঁ। Integrated UG/PG Course-এর ছাত্রা আবেদন করতে পারবে।
৩৪।	রিসার্চ স্কলার/ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট/ পোস্ট ডক্টরেল রিসার্চের ছাত্ররা এই স্কীমে কি আবেদন করতে পারবে?	হ্যাঁ। রিসার্চ স্কলার/ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট/ পোস্ট ডক্টরেল রিসার্চের ছাত্ররা এই স্কীমে আবেদন করতে পারবে।
৩৫।	আমি UPSC/PSC/SSC পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি স্নাতক হওয়ার পর আমি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর Degree-র জন্য ভর্তি হইনি কিন্তু আমি প্রাইভেট Coaching-এ ভর্তি হয়েছি। আমি কি ঋণ পেতে পারি?	হ্যাঁ। যদি পরিবার ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়।
৩৬।	আমি ১২ শ্রেণি পাশ করে কোন College-এ ভর্তি হইনি। আমি NEET/ AEEE/পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি ও পরের বছর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য Private Coaching Institute-এ ভর্তি হয়েছি। আমি কি আবেদন করতে পারি?	হ্যাঁ। SCC স্কীমে আবেদন করার জন্য আপনার পরিবারকে গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
৩৭।	কোর্স চলাকালীন যে কোন সময়ে কি আমি এই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারি?	হ্যাঁ। কোর্স চলাকালীন যে কোন সময়ে ঋণের জন্য আবেদন করা যাবে।
৩৮।	কোন ছাত্র যদি বৃত্তি বা Freeship পায় এই স্কীমের জন্য কি আবেদন করতে পারে?	হ্যাঁ। যদি ছাত্র বৃত্তি বা Freeship পায় তবে এই স্কীমের জন্য প্রাপ্ত অর্থ Margin Money হিসাবে ব্যবহার করা হবে যদি ঋণের পরিমাণ ৪ লক্ষের বেশি হয়।
৩৯।	সাদা কালো ছবি অনলাইনে অ্যাপ্লাই করার সময় দেওয়া যাবে কি?	না, শুধু রঙিন ছবি দেওয়া যাবে।
৪০।	ছাত্র/অভিভাবক/সহআবেদনকারীর ছবির কোন নির্দিষ্ট মাপ আছে কি?	ছবি ও আপলোড করার নথিপত্রের মাপ আবেদনপত্রে ও User manual-এ দেওয়া আছে।
৪১।	আমি আবেদন করার সময় আমার ছবি আপলোড করেছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। সমস্যার সমাধান কি ভাবে হবে?	আবেদনকারীকে অ্যাপ্লিকেশন আইডি-সহ হেল্প ডেস্ক নম্বর: 18001028014 সহায়ক ই-মেল: support-wbscc@bangla.gov.in contactwbscc@gmail.com

৪২।	SCC Scheme-এ কোন কোন ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড/ঋণ দেবে?	State Co-operative Bank/Central Co-operative Bank অথবা যেকোনো প্রাইভেট বা পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক এই ক্রেডিট কার্ড স্কীমে ঋণ মঞ্জুর করতে পারবে।
৪৩।	ব্যাঙ্কের কোন শাখা আমার ঋণ প্রদান করবে?	Portal-এর ড্রপ ডাউন মেনু থেকে নিজের ব্যাঙ্ক নির্বাচন করতে হবে।
৪৪।	কি হিসাবে ঋণ মঞ্জুর করা হবে? মেয়াদী ঋণ/Cash Credit ঋণ?	Scc Scheme-এ Bank মেয়াদী ঋণ দেবে।
৪৫।	এই স্কীমে কোন মার্জিন মানি আছে কি?	৪ লাখ পর্যন্ত ঋণের গ্রহিতাকে কোন মার্জিন মানি দিতে হবে না। ৪ লাখের ঊর্দ্ধে হলে মোট ঋণের ৫ শতাংশ গ্রহিতাকে দিতে হবে। কোন বৃত্তি বা আর্থিক সহায়তা পেলে ঋণ গ্রহিতা সেটা মার্জিন হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে।
৪৬।	ঋণ গ্রহিতাকে অতিরিক্ত কোন Security দিতে হবে কি?	১০ লাখ পর্যন্ত অতিরিক্ত কোন Security দিতে হবে না।
৪৭।	দরখাস্তকারীকে কোন চুক্তিপত্র করতে হবে কি না?	ঋণ পাওয়ার আগে ব্যাঙ্কের সঙ্গে গ্রহিতা/সহআবেদনকারীকে চুক্তিপত্র করতে হবে।
৪৮।	SCC স্কীমে ঋণ পেতে সুদের হার কি?	স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড স্কীমে সুদের হার ৪% বার্ষিক সরল সুদ। পড়াশুনা করাকালীন সম্পূর্ণ সুদ শোধ করলে ১% সুদের হার মুকুব হবে।
৪৯।	ঋণ গ্রহিতা ঋণ নেবার কতদিন পরে ঋণ শোধ করা শুরু করতে পারবে?	ঋণ শোধ করার জন্য ১ বছরের সময় পাওয়া যাবে (Moratoriam)। ঋণ পরিশোধ করতে হবে কোর্স সমাপ্ত হবার পর অথবা চাকরি পাওয়া, যা আগে হবে।
৫০।	উক্ত ১ বছরে কি ঋণ গ্রহিতাকে ঋণের জন্য সুদ দিতে হবে?	উক্ত ১ বছরে ঋণ গ্রহিতাকে ঋণের জন্য দিতে হবে ৪% বার্ষিক হারে সরল সুদ।
৫১।	ঋণ গ্রহিতা ঋণ শোধ করার জন্য মোট কত সময় পাবে?	১৫ বছরে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।
৫২।	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ শোধ করলে কোন সুবিধা পাওয়া যাবে কি?	কোর্স চলাকালীন যদি সুদ শোধ করা হয় তাহলে ১% সুদ মুকুব করা হবে।
৫৩।	ঋণ গ্রহণের সময় ব্যাঙ্ক কোন ফি নেবে কি না/ আগে শোধ দিলে কোন Penalty হবে কি?	Bank কোনো ফি নেবে না। Penalty হবে না।
৫৪।	Processing Fee লাগবে কি?	না।
৫৫।	ঋণ পরিশোধ কি প্রতি মাসে নির্দিষ্ট হারে দিতে হবে?	হ্যাঁ। EMI-এর মাধ্যমে।
৫৬।	আবেদনকারীর অবর্তমানে কোন ছাড় আছে কি না?	হ্যাঁ। ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী জীবন বিমা করতে হবে। বিমার Premium ঋণের টাকা থেকে কেটে নেওয়া হবে।
৫৭।	সহআবেদনকারীর সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি?	স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড স্কীমে সহআবেদনকারীকে ঋণ গ্রহিতার সঙ্গে আবেদন করতে হবে।

৫৮।	কোর্স সময়কালীন ঋণ বর্ধিত করা যাবে কি?	পোর্টালে ঋণ বর্ধিত করার সুযোগ আছে। ১০ লাখ টাকা সীমার মধ্যে।
৫৯।	আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড-এর জন্য উপযুক্ত আবেদনকারী, কিন্তু আমার State Co-operative Bank-এ Account নেই, আমি কি আবেদন করতে পারি?	State Co-operative Bank-এ Account থাকা বাধ্যতামূলক নয়। যে কোন ব্যাঙ্কে Account থাকলেই হবে।
৬০।	আমি যদি আমার ই-মেল বা নিজের ব্যক্তিগত তথ্য পরিবর্তন করতে চাই রেজিস্ট্রেশনের পরে তাহলে কিভাবে করব?	ছাত্রকে স্টেট হেল্প ডেস্ক নম্বর: (18001028014 সহায়ক ই-মেল: support-wbscc@bangla.gov.in)/contactwbscc@gmail.com আধার কার্ড থাকলে দশম শ্রেনির রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে আবেদন করতে হবে।
৬১।	ছাত্রের যোগ্যতা/উপযুক্ততা কে যাচাই করবে?	ছাত্র যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠান যাচাই করবে।
৬২।	আবেদনপত্র জমা দেওয়ার আগে পোর্টালে আবেদনপত্র পরিবর্তন করা যাবে কি?	হ্যাঁ। পোর্টালে আবেদনপত্র পরিবর্তন করা যাবে, যদি আবেদন পত্র জমা না হয়ে গিয়ে থাকে। জমা দেওয়ার পরে কোন পরিবর্তন করা চলবে না।
৬৩।	আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর যদি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তাহলে কি করতে হবে?	ছাত্রকে স্টেট হেল্প ডেস্ক নম্বর: 18001028014-এ যোগাযোগ করতে হবে অথবা support-wbscc@bangla.gov.in ই-মেল করতে হবে অথবা contactwbscc@gmail.com
৬৪।	রেজিস্ট্রেশনের পরে যদি আমি আমার Login/Password ভুলে যাই?	পোর্টাল থেকে User Id/ Login/ Password উদ্ধার করা যাবে।
৬৫।	আমি একটি WB Private Engineering College-এর ছাত্র। আমি কি আবেদন করতে পারি?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।
৬৬।	আমি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অবস্থিত Govt. Engineering College-এ পড়ছি। আমি কি আবেদন করতে পারি?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।
৬৭।	আমি Deemed University-এ স্নাতক Course-এ ভর্তি হয়েছি। আমি আবেদন করতে পারি?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।
৬৮।	আমি পশ্চিমবঙ্গের একটি Private Engineering College-এ পড়ছি কিন্তু আমার PAN CARD নেই। আমি কিভাবে এই Scheme-এ আবেদন করব?	হ্যাঁ। আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু ঋণ নেবার পূর্বে PAN CARD আবশ্যিক। PAN CARD না থাকলে আবেদনপত্রের সঙ্গে অঙ্গীকার পত্র (Undertaking) দিতে হবে।
৬৯।	আমি স্নাতক স্তরে Hotel Management College-এর ছাত্র কিন্তু College AICTE-র অনুমোদন প্রাপ্ত নয়। আমি আবেদন করতে পারি কি?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।

৭০।	আমি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে একটি National Institute of Technology-তে পড়ছি। প্রতিষ্ঠানের কোন NIRF Rank নেই। আমি কি আবেদন করতে পারি।	হ্যাঁ। যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি যদি স্বীকৃত হয়। SCC-তে আবেদনের জন্য প্রতিষ্ঠানের NIRF Rank বাধ্যতামূলক নয়।
৭১।	আমি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অবস্থিত Private Engineering College-এর ছাত্র। কিন্তু আমার College-এর নাম Drop down List-এর সূচীতে নেই। আমি কি আবেদন করতে পারব ?	contactwbscc@gmail.com বা support-wbscc@bangla.gov.in-এ সাহায্যের জন্য Email করুন।
৭২।	আমি পশ্চিমবঙ্গের একটি UGC অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ছাত্র। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের AICTE অনুমোদিত নয়। আমি কি আবেদন করতে পারি?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।
৭৩।	আমি অন্য State-এর National Institute of Technology-তে Engineering-এ PHD করছি। আমি কি আবেদন করতে পারি ?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।
৭৪।	আমি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা Tripura-য় Engineering পড়ছি। আমি কি Tripura-য় আমার ব্যক্তিগত বাসস্থানের জন্য ঋণ পেতে পারি?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।
৭৫।	আমি AICTE অনুমোদিত ৩ বছরের Diploma Engineering Course-এর ছাত্র। আমি মাধ্যমিক/ICSE পরীক্ষায় পাশ করেছি কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ নই। আমি কি আবেদন করতে পারি?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।
৭৬।	আমি পশ্চিমবঙ্গের Self Financing Engineering Programme-এ Tution Waiver Scheme-এর আওতায় আছি। আমি কি আবেদন করতে পারি ?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।
৭৭।	আমি West Bengal Engineering Course-এর ছাত্র এবং SVMCM বৃত্তি প্রাপ্ত। আমি কি এই স্কীমের জন্য উপযুক্ত?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে। আপনার বৃত্তির টাকা ৫% Margin Money-র জন্য ব্যবহার করা হবে যদি ঋণের পরিমাণ ৪ লাখের বেশি হয়।
৭৮।	আমি ৪ (চার) বছরের Engineering Degree Course-এর অন্তিম বর্ষের ছাত্র। আমি কি এই স্কীমের জন্য উপযুক্ত?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।

৭৯।	আমি ৪ (চার) বছরের Engineering Degree Course বেসরকারী কলেজ থেকে সমাপ্ত করেছি। কোর্স চলাকালীন আমি পার্সোনাল লোন নিয়েছিলাম। আমি কি SCC-তে লোন নিয়ে এই পার্সোনাল লোন পরিশোধ করতে পারি?	না। Re-imbursement-এর কোনো ব্যবস্থা নেই।
৮০।	AISHE Code কি? NIRF কি? NAAC accreditation কি?	AISHE-এর full form 'All India Survey of Higher Education' NIRF হল National Institutional Ranking Framework যার মাধ. মে প্রতিষ্ঠানের র‍্যাঙ্কিং করা হয়। NAAC হল জাতীয় স্তরের স্বীকৃতির প্রক্রিয়া।
৮১।	আমি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ Computer Science এবং Engineering-এর ছাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানের NAAC স্বীকৃতি নেই বা NIRF rank ও নেই কিন্তু কোর্সটি NBA দ্বারা স্বীকৃত আমি কি SCC-তে আবেদন করতে পারি?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।
৮২।	আমি পশ্চিমবঙ্গের Civil/Mechanical/ Electrical Engineering-এ AMIE করেছি এবং এখন Engineering College-এ স্নাতকোত্তর কোর্স করছি। আমি কি SCC-র জন্য আবেদন করতে পারি?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।
৮৩।	আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Technical Education and Training Department -এর ITI Course-এর ছাত্র। আমি কি আবেদন করতে পারি?	হ্যাঁ। SCC আবেদন করার সময়, যদি আপনার পরিবার গত ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃত হয় এবং আপনার এই স্কীমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।

‘কৃষকবন্ধু’ প্রকল্পের টাকা দ্বিগুণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গেল টাকা

প্রতিশ্রুতি পূরণে এবং কৃষকদের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে যে নতুন প্রকল্প ‘কৃষকবন্ধু’ রাজ্য জুড়ে চালু হয়েছিল, তার টাকা দ্বিগুণ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেই সঙ্গে চালু হল কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্প। ১৭ জুন, ২০২১ তারিখে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্প নবরূপে সূচনা করেন। একই সঙ্গে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। নাম ‘প্রতিশ্রুতি পূরণ’। প্রথম দিনেই ২২টি জেলায় ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫৩১ জন কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২৯০ কোটি টাকা পৌঁছে গেল বলে জানা গিয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে যশে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের কৃষকদের হাতে স্বর্ণবীজের ধান তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

নতুন কৃষকবন্ধু প্রকল্প অনুসারে একজন কৃষক ১ একর বা তার বেশি চাষযোগ্য জমির জন্য বছরে সর্বাধিক ১০ হাজার টাকা পাবেন। ১ একরের কম জমির জন্য আনুপাতিক হারে ন্যূনতম ৪ হাজার টাকা দেওয়া হবে। নথিভুক্ত কৃষকদের দুটি সমান কিস্তিতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এর মধ্যে প্রথম কিস্তি খরিফ মরশুমের শুরুতেই সরাসরি চলে যাবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা সর্বদা কৃষকদের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে চলি। এখনও পর্যন্ত ৬১.২১ লক্ষ কৃষক এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। যাঁর এক কাঠারও কম চাষযাগ্য জমি রয়েছে, তিনি চাষের জন্য বছরে ৪ হাজার টাকা পাবেন। আবেদন পদ্ধতিও সহজ হয়েছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু চাষের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়, এমন নয়। ১৮-৬০ বছর বয়সি কৃষকের মৃত্যু হলে সেই পরিবারকে এককালীন ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত এই সুবিধা ২৮ হাজার কৃষক পেয়েছেন। খরচ হয়েছে ৫৫৫ কোটি টাকা। ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে কৃষকদের দেওয়া হয় বার্ধক্যভাতা। মাসে ১ হাজার টাকা করে প্রায় ১ লক্ষ কৃষক এই সুবিধা পান। অন্যদিকে রাজ্যে শস্যবিমার আওতায় রয়েছেন ৬৪ লক্ষ কৃষক। বিমার প্রিমিয়াম দেয় রাজ্য সরকার। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরও গত ৯ বছরে ৩৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের রুখা-শুখা জমিকে সুফলা করতে 'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্প করা হয়েছে। কৃষিকাজে সাফল্যের জন্য এই রাজ্য টানা ৬ বার 'কৃষি কর্মণ' পুরস্কার পেয়েছে।

কৃষি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির বৃহত্তম অংশ এবং রাজ্যের জনসংখ্যার প্রায় ২/৩ অংশ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। রাজ্যে ৯৬% কৃষক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণির, যাদের চাষযোগ্য জমির গড় পরিমাপ ১.৫ একর এবং এরা দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির শিকার। পরিমাপের এই অর্থনীতি অধিকাংশ কৃষকদের জন্য একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। তদুপরি, রাজ্যের কৃষকদের সমস্যা হল আবহাওয়ার প্রতিকূলতা এবং অপর্যাপ্ত মূলধন। এছাড়া অর্থ উপার্জনকারী কৃষকের অকালমৃত্যু, পুরো কৃষক পরিবারটিকে চরম আর্থিক সংকটের মুখে ঠেলে দেয়, কারণ তাদের অন্য কোনো জীবিকার সুযোগ থাকে না।

অথচ এত প্রতিকূলতার মধ্যে, জনসংখ্যার এই অংশটি সকল নাগরিকের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে। তাই রাজ্য সরকার কৃষিকে আর্থিকভাবে সফল জীবিকা করার লক্ষ্যে সকল কৃষক ও ভাগচাষিদের কৃষিকাজে আর্থিক সাহায্য এবং কৃষক পরিবারকে কৃষকের অকালমৃত্যুর ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। এই লক্ষ্যে, রাজ্য সরকার ১৭-১-২০১৯ সালে 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে যার দু-টি উপাদান রয়েছে।

(১) কৃষক বন্ধু (নিশ্চিত আয়) প্রকল্প যাতে প্রতি কৃষক ও ভাগচাষিকে ১ একর বা তদূর্ধ্ব চাষযাগ্য জমির জন্য বছরে সর্বাধিক ৫,০০০/- টাকা এবং আনুপাতিক হারে ১ একরের কম চাষযোগ্য জমির জন্য সমতুল্য এবং ন্যূনতম ২,০০০/- টাকার আর্থিক সাহায্য করা হয়। এই সাহায্য বছরে দুটি কিস্তিতে—প্রথমবার খরিফ মরশুমের (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) শুরুতে এবং দ্বিতীয়বার রবি মরশুমের (অক্টোবর-মার্চ) শুরুতে দেওয়া হয়; এবং

(২) কৃষকবন্ধু (মৃত্যুকালীন সহায়তা) প্রকল্প যার মধ্যে ১৮-৬০ বছর বয়সি কৃষকের মৃত্যুতে তার পরিবারকে সামাজিক সুরক্ষার জন্য এককালীন দুই লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

শুরুতে কেবলমাত্র ROR/পরচায় নথিভুক্ত কৃষক এবং নথিভুক্ত ভাগচাষি এই প্রকল্পে যোগ্য বিবেচিত হতেন। কিন্তু নথিভুক্ত ROR/পরচা পেতে কৃষকদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা বিবেচনা করে, সরকার স্মারক নং-১৩২৪-এজি/ও/৯এম (ন্যাব)-২২/২০১২ ২৪-১২-২০২০ তারিখে স্বঘোষণার ভিত্তিতে কৃষকদের নথিভুক্ত করণের সুযোগ প্রদান করেছে।

কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি, কৃষিতে বর্ধিত উৎপাদন ব্যয় এবং ক্রমবর্ধমান জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে কৃষিকে লাভজনক করার লক্ষ্যে কৃষকবন্ধু (নিশ্চিত আয়) প্রকল্পে প্রদত্ত সাহায্যের অর্থ আরও বাড়ানো প্রয়োজন অনুভূত হয়।

প্রকল্পটির বৈশিষ্ট্য ও রূপায়ণের পদ্ধতি :

(অ) আর্থিক সহায়তার বিবরণ : কৃষকবন্ধু (নিশ্চিত আয়) প্রকল্পে নথিভুক্ত প্রতি কৃষক ও ভাগচাষিকে ১ একর বা ততোধিক চাষযোগ্য জমির জন্য বছরে সর্বাধিক আর্থিক সাহায্য ১০,০০০/- টাকা এবং ১ একরের কম চাষযোগ্য জমির জন্য আনুপাতিক হারে সর্বনিম্ন ৪,০০০/- টাকা দেওয়া হবে। আর্থিক সাহায্য নথিভুক্ত কৃষকদের দুটি সমান কিস্তিতে দেওয়া হবে। ১ম কিস্তি খরিফ মরশুমের (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) শুরুতে এবং ২য় কিস্তি রবি মরশুমের (অক্টোবর-মার্চ) শুরুতে প্রতি বছর যোগ্য নথিভুক্ত কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি স্থানান্তর (DBT) করা হবে।

কৃষকবন্ধু (মৃত্যুকালীন সাহায্য) প্রকল্পে প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে।

(আ) উপভোক্তার যোগ্যতা : নথিভুক্ত ভাগচাষিসহ সকল কৃষক যাঁদের চাষযোগ্য জমি আছে তাঁরাই এই নতুন প্রকল্পের যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবেন। কৃষকবন্ধু (নিশ্চিত আয়) প্রকল্পে নথিভুক্ত সকল কৃষক ও ভাগচাষি এই নতুন প্রকল্পে সরাসরি আর্থিক সাহায্যের উপভোক্তা হিসাবে বিবেচিত হবেন। যে সকল কৃষক, ভাগচাষিসহ যাঁরা এখনো নথিভুক্ত হননি, তাঁরা ব্লকস্তরে সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে জমির মালিকানা দখলনামার তথ্য এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য-সহ আবেদন করবেন।

(ই) উপভোক্তার তালিকা ভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া : সহ-কৃষি অধিকর্তা প্রয়োজনীয় নথি-সহ আবেদনকারী কৃষকের আবেদনের যথার্থতা যাচাই করে নাম তালিকভুক্ত ও অনুমোদন করবেন। বছরের যে কোনো সময়েই এই আবেদন করা যাবে।

(ঈ) প্রকল্পের নিরীক্ষণ : রাজ্যস্তরে রাজ্য পরিচালন কমিটি যার সভাপতিত্বে মুখ্যসচিব, কৃষি বিভাগীয় সচিব, আহ্বায়ক সদস্য, অর্থ দপ্তর, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, সমবায় দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, প্রধান সচিব/ সচিব ও কৃষি উপদেষ্টাকে নিয়ে গঠিত শীর্ষ কমিটি এই নতুন প্রকল্পের সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ, পরিচালন ও তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।

জেলাস্তরে ডি এল আই এম সি গঠিত হবে জেলাশাসকের নেতৃত্বে যেখানে উপ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) কমিটির আহ্বায়ক সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধিকারিকগণ এই কমিটির সদস্য থাকবেন। এই কমিটি প্রকল্পের রূপায়ণে প্রয়োজনীয় তদারকি ও অভিযোগ নিরসন করবেন।

ব্লক স্তরে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের নেতৃত্বে গঠিত বিএলইএমসি-তে সহ-কৃষি অধিকর্তা, আহ্বায়ক সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ সংশ্লিষ্ট ব্লকস্তরে প্রকল্প রূপায়ণ ও তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।

(উ) প্রকল্পের রূপায়ণ : রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর এবং সমবায় দপ্তরের সাহায্য নিয়ে এই প্রকল্প রূপায়ণ করতে কৃষি অধিকর্তার দপ্তর এই প্রকল্পের রূপায়ণকারী সংস্থা ব্লকস্তর সহ কৃষি অধিকর্তা এই প্রকল্পের নোডাল অফিসার তিনি আবেদনকারী কৃষকের আবেদনের ভিত্তিতে প্রকল্পের প্রদত্ত অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করাবেন। ব্লকের বিএল এবং এলআরও আবেদনকারীর জমি সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাই করতে সহ-কৃষি অধিকর্তাকে সাহায্য করবেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড। আবেদনকারী প্রদত্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথি যাচাই এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পে অর্ডারের ভিত্তিতে প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে সরাসরি স্থানান্তর (DBT) করবেন।

(ঊ) আর্থিক তাৎপর্য : এই প্রকল্পে [কৃষকবন্ধু (নতুন)] সর্বাধিক আর্থিক সাহায্য বছরে প্রতি কৃষক পরিবার পিছু এক একর বা ততোধিক চাষযোগ্য জমির জন্য ১০,০০০ টাকা প্রতি বছর এবং ১ একরের কম জমির জন্য আনুপাতিক হারে সর্বনিম্ন ৪,০০০ টাকা।

কৃষকবন্ধু (নিশ্চিত আয়) প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান

প্রকল্পের প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ : ১৭ জানুয়ারি, ২০১৯

রাজ্যব্যাপী কৃষকদের নিবন্ধীকরণ শুরু : ২৮ জানুয়ারি, ২০১৯

প্রকল্পের উদ্বোধন : মুখ্যমন্ত্রী ৩০ জানুয়ারি, ২০১৯ বীরভূম জেলায় চেক প্রদান করে প্রকল্পটির সূচনা করেন।

সার্বিকভাবে রাজ্যব্যাপী সহায়তা প্রদান শুরু : ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

প্রকল্পের সহায়তা প্রাপক : চাষযোগ্য জমি আছে এমন সব কৃষক ও ভাগচাষি।

সহায়তা প্রদান : বছরে দুই মাস সহায়তা প্রদান করা হয় (খরিফ ও রবি মরশুমে)।

নিবন্ধীকরণের স্থান : সব ব্লকের সহ-কৃষি অধিকর্তার দপ্তরে এবং **এই সংক্রান্ত আয়োজিত বিশেষ শিবিরে।**

কৃষি কর্মণ পুরস্কার

ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গকে ছয়বার কৃষি কর্মণ পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।

২০১১-১২ ডাল শস্য
২০১২-১৩ মোট খাদ্য শস্য
২০১৩-১৪ মোটা দানা শস্য (ভুট্টা)
২০১৪-১৫ তৈল বীজ
২০১৫-১৬ ডাল শস্য
২০১৭-১৮ মোটা দানা শস্য (ভুট্টা)

এরপর আর কোনো পুরস্কার ঘোষণা হয়নি।

নিবন্ধীকরণের পদ্ধতি : নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথি-সহ জমা করতে হবে।

কৃষকদের নিবন্ধীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নথি :
(১) ভোটার পরিচয়পত্র
(২) কৃষি জমির পরচা/স্বঘোষণাপত্র-সহ নথি
(৩) ব্যাঙ্ক পাশবুক
(৪) আধার কার্ড
(মূল নথি দেখিয়ে এক কপি করে প্রতিলিপি জমা দিতে হবে)

বর্তমানে এই প্রকল্পে নিবন্ধীকৃত কৃষকের সংখ্যা : ৬১.৩১ লক্ষ

এখনও পর্যন্ত এই তহবিল থেকে মোট সহায়তার পরিমাণ : ৪৫০০ কোটি টাকা।

কৃষক বন্ধু (নতুন) প্রকল্পের জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	জেলা	নথিভুক্ত কৃষকের সংখ্যা	ক্রমিক নং	জেলা	নথিভুক্ত কৃষকের সংখ্যা
১	দার্জিলিং	২৫,০২৭	১২	বাঁকুড়া	২,৯৬,৯৬৮
২	কালিম্পং	১০,০৬৮	১৩	পুরুলিয়া	১,৭০,০২৩
৩	জলপাইগুড়ি	৬২,৪৩৮	১৪	পশ্চিম মেদিনীপুর	৬,৭৩,২০৫
৪	কোচবিহার	২,৪৪,৯২০	১৫	ঝাড়গ্রাম	১,০৬,৪৬৯
৫	আলিপুরদুয়ার	৫৩,১৯১	১৬	পূর্ব মেদিনীপুর	৮,৮৫,০৯৩
৬	উত্তর দিনাজপুর	২,৬৪,২২৭	১৭	হাওড়া	১,৩০,৬৬৭
৭	দক্ষিণ দিনাজপুর	১,৫৭,২২৪	১৮	হুগলি	৩,১৭,০৬৩
৮	মালদা	২,৮৭,৬০৫	১৯	পূর্ব বর্ধমান	৪,২১,৫৯৩
৯	মুর্শিদাবাদ	৪,৫৮,১১১	২০	পশ্চিম বর্ধমান	৩৪,৭৩৫
১০	নদিয়া	৩,৩১,৯৫৫	২১	দক্ষিণ ২৪-পরগনা	৪,৯৪,৩০২
১১	বীরভূম	২,৯৮,০৪৩	২২	উত্তর ২৪-পরগনা	৪,০৫,৯৫৩
মোট ৬১,২১,৮৮০					

কৃষক বন্ধু (মৃত্যুকালীন সহায়তা) প্রকল্প

স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কারণে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী কৃষকের মৃত্যু হলে এই প্রকল্পে মৃতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এককালীন সহায়তা প্রদান করা হয়।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ১লা জানুয়ারি, ২০১৯ প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন।

কৃষক বন্ধু (মৃত্যুজনিত সহায়তা) প্রকল্পের জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	জেলার নাম	সহায়তা প্রাপ্ত কৃষক পরিবারের সংখ্যা	ক্রমিক নং	জেলার নাম	সহায়তা প্রাপ্ত কৃষক পরিবারের সংখ্যা
১	দার্জিলিং	১৮১	১২	বাঁকুড়া	১০৫৬
২	কালিম্পং	২৯	১২	পুরুলিয়া	৬৬১
৩	জলপাইগুড়ি	২৮১	১৪	পশ্চিম মেদিনীপুর	২৯৪০
৪	কোচবিহার	১০৪৪	১৫	ঝাড়গ্রাম	৪৮৭
৫	আলিপুরদুয়ার	৩০২	১৬	পূর্ব মেদিনীপুর	৩৪০৭
৬	উত্তর দিনাজপুর	১২৫৬	১৭	হাওড়া	২৯৮
৭	দক্ষিণ দিনাজপুর	১১৯২	১৮	হুগলি	১১৬০
৮	মালদা	৩১৮৭	১৯	পূর্ব বর্ধমান	১০২
৯	মুর্শিদাবাদ	৩৬১৬	২০	পশ্চিম বর্ধমান	৯৯১
১০	নদিয়া	৯৫৫	২১	দক্ষিণ ২৪-পরগনা	১৪৪২
১১	বীরভূম	১৭৭৮	২২	উত্তর ২৪-পরগনা	১৪০১
মোট ২৭,৭৬৬					

এই প্রকল্পে অদ্যাবধি ২৭,৭৬৬টি পরিবারকে মোট ৫৫৫.৩২ কোটি টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

কৃষক বার্ধ্যক্য ভাতা (জয় বাংলা)

মাসিক ১ হাজার টাকা হারে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কৃষক বার্ধক্য ভাতা প্রদান

রাজ্যে ১ (এক) লক্ষ কৃষককে এই ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা আছে

জুন ২০২১ পর্যন্ত ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

‘বাংলা শস্য বিমা যোজনা’ (খরিফ ও রবি)

বৎসর		বিমাকারী কৃষকের সংখ্যা (লক্ষ)	বিমার আওতাভুক্ত এলাকা (লক্ষ হেঃ)
২০১৮-১৯	খারিফ/রবি	২৪.৩৭/২৮.৮৭	৯.৬৪/১১.০৭
২০১৯-২০	খারিফ/রবি	৪৪.১৯/৪১.৭১	১২.২২/১১.৯৪
২০২০-২১	খারিফ/রবি	৬৩.৯৩/৫২.১৩	২১.০৪/১৫.৩২

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে অদ্যাবধি ৩৬.৩৫ লক্ষ কৃষক বিমার মাধ্যমে ১৫১৫ কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা লাভ করেছেন। রাজ্য সরকার প্রধান ফসলগুলির জন্য কৃষকের দেয় প্রিমিয়ামের সমস্তটাই বহন করে। শুধুমাত্র আলু ও আখের সামান্য প্রিমিয়াম বিমাকারী কৃষক বহন করেন। আগের বছরের তুলনায় ২০২০-২১ বর্ষে ৩৫% এবং ২০১৯-২০ বর্ষে ৬১% বিমাকারী কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আগের বছরের তুলনায় ২০২০-২১ বর্ষে ৫১% এবং ২০১৯-২০ বর্ষে ১৭% বিমার আওতাভুক্ত এলাকার বৃদ্ধি হয়েছে।

২০১৭-১৮ বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সমস্ত রাজ্যের মধ্যে ধান, আলু, পাট এবং মেস্তা উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

প্রধান ফসলগুলির এলাকা-ফলন-মোট উৎপাদনের তালিকা (২০২০-২১, তৃতীয় অগ্রিম অনুমিত হিসাব)

ক্রমিক নং	ফসল	এলাকা (’০০০ হে.)	ফলন (কেজি/হে.)	উৎপাদন (’০০০ মে.টন)
১	মোট চাল	৫,৫৮০	৩,০২১	১৬,৮৫৮
২	গম	১৯৩	৩,০০০	৫৭৯
৩	মোট ভুট্টা	৩৬৩	৬,৬৯৭	২,৪৩২
৪	মোট তণ্ডুল	৬,১৪৬	৩,২৩৫	১৯,৮৮০
৫	মোট ডালশস্য	৪৬০	৯১৩	৪২০
৬	মোট তৈলবীজ	৯২৮	১,২৫৯	১,১৬৮
৭	আলু	৪৫৭	১৮,৯২৬	১৩,২১৯
৮	পাট+মেস্তা	৫১৯	১৫	৭,৬১৪

পাট+মেস্তা, ফলন (বেল হেঃ) ও উৎপাদন (’০০০ বেল)। ১ বেল=১৮০ কেজি

রাজ্যের শস্য নিবিড়তা ১৭৭% (২০১০-১১) থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ১৯২% (২০১৯-২০) হয়েছে।

কৃষক বন্ধু সহায়তা ফোন নম্বর

6291720406/8336957370

(৬২৯১৭২০৪০৬/৮৩৩৬৯৫৭৩৭০)

জেলার উপ-কৃষি অধিকর্তার (প্রশাসন) অফিসের ফোন নম্বর

ক্রমিক নং	জেলা	ফোন নং	ক্রমিক নং	জেলা	ফোন নং
১	দার্জিলিং	৮৭৭৭৫৮৭৬৫৮	১২	বাঁকুড়া	৭৪৭৮৪০১০৬১
২	কালিম্পং	০৩৫৫২২৫৫০০১	১৩	পুরুলিয়া	৯৪৩৪৬৫৯৯৭২
৩	জলপাইগুড়ি	০৩৫৬১২২৪৩৯৯	১৪	পশ্চিম মেদিনীপুর	৯৪৩৩৩১৮৬৫১
৪	কোচবিহার	০৩৫৮২২২৭৫৪৫	১৫	ঝাড়গ্রাম	৯৪৩২৩৫৬৪৯০
৫	আলিপুরদুয়ার	৯৪৩৪৪১৩৪৫০	১৬	পূর্ব মেদিনীপুর	০৩২২৮২৭০৪৪৪
৬	উত্তর দিনাজপুর	০৩৫২৩২৪৬০৭০	১৭	হাওড়া	৯৪৩২৫৮০০৪৮
৭	দক্ষিণ দিনাজপুর	০৩৫২২২৫৫২৫৩	১৮	হুগলী	০৩৩২৬৮৬২৪০৫
৮	মালদা	৯৪৭৪০৬৬৭২৮	১৯	পূর্ব বর্ধমান	৯৪৭৪১১৩০১৭
৯	মুর্শিদাবাদ	৯৮৩০৩২৪৩৯৫	২০	পশ্চিম বর্ধমান	৯৪৩৪৩৩৫৭৬১
১০	নদিয়া	৯৪৩৩১৪৫৫২১	২১	দক্ষিণ ২৪-পরগনা	০৩৩২৪৭৯৩৮৪৪
১১	বীরভূম	৮৩৪৮৫৮০৯৪০	২২	উত্তর ২৪-পরগনা	০৩৩২৫৪২৩৩৬৯

বাংলা সহায়তা কেন্দ্র

বিনামূল্যে সমস্ত পরিষেবার তথ্য ও আবেদনের সুযোগ এক জায়গা থেকেই

সাবিনা পরভিন—বছর ৩৫-এর গৃহবধূ। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামে। নিজের মেয়ের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্পে আবেদন করতে চান। কিন্তু স্কুল যে বন্ধ। কোথায় কার কাছে সাহায্য পাবেন ভেবেই কূলকিনারা করতে পারছেন না। পাশেই সীমা মণ্ডল থাকেন। তাঁরও সমস্যা সেই একই। এবার এঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল খোদ রাজ্য সরকার-ই। শুরু হল বাংলা সহায়তা কেন্দ্র।

এবার থেকে যে কোনও প্রকল্পের সুবিধা পেতে সরাসরি এইসব কেন্দ্রে হাজির হলেই চলবে। কোনও সরকারি দপ্তরে ঘোরাঘুরি করার প্রয়োজন আর নেই। এই সমস্ত কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৩৮টি দপ্তরের ২৬৭টি পরিষেবার তথ্য ও আবেদনের সুযোগ পাবেন সাধারণ মানুষ। আবেদন করতে পারবেন অনলাইনে। মিলবে সমস্ত ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সঠিক তথ্য। এখনও পর্যন্ত ২৩টি জেলায় ৩৫৬০টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। তারমধ্যে জেলাশাসক, এসডিও এবং বিডিও অফিস চত্বরে ৪৩৫টি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১৫০০টি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারে ৭৪৮টি, বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে ৭২৬টি ও পুরসভার নানা অফিসে ১৫১টি কেন্দ্র রয়েছে।

Bangla Sahayata Kendra

এক ঝলকে দেখে নেওয়া যেতে পারে বিভিন্ন দপ্তরের প্রদত্ত পরিষেবার তালিকা—

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

আমূল পরিবর্তনের পথেই বিপুল জয়

(১)

এক ছকভাঙা পরিবর্তন।

দশ দশটি বছর। একটু একটু করে জিতে নিয়েছে মানুষের আস্থা। বিশ্বাস। হয়ে উঠেছে ভরসার স্থল। ভালবাসার আশ্রয়। এ যেন এক ভূমিজয়। মানুষের মনোভূমিজয়। এ কোনও অতিকথন নয়। ২০১১-র বিধানসভার আগের দিনগুলো মনে পড়ে। মহানগরের প্রাণচঞ্চল মোড়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে মানুষ। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। আকাশে মাথাতুলে দাঁড়িয়ে আছে 'পোস্টার'। লেখা—'পরিবর্তন চাই'।

রাজ্যের মানুষের মনের গভীরে শিকড় নাড়িয়ে দিল এই পোস্টার। শিক্ষিত, সচেতন মানুষও খুঁজতে লাগলো এই শ্লোগানের পিছনে যারা আছে তাদের নাম। রাজ্যের মানুষের মধ্যে গুণগুণ করে গুঞ্জরিত হতে লাগল-- 'পরিবর্তন চাই'। সকলেই তো চাইছে পরিবর্তন কিন্তু আনবে কে? গ্রাম গ্রামান্তরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো এই কথা।

২০১১-র নির্বাচন নিয়ে এল পরিবর্তন। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটল। রাজ্য পেল প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী।

তবে তিনি এই প্রথম মন্ত্রী হলেন তা নয়। কেন্দ্রের মন্ত্রিত্ব সামলানোর সাফল্যের পালক আছে তাঁর মুকুটে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হিসেবে সমগ্র ভারতের জনজীবনের সঙ্গে ঘটেছে তাঁর মনের যোগ। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখার শুরুও তাই অনেক আগে থেকেই।

আন্দোলনের আরেক নাম মমতা বন্দোপাধ্যায়। এক দশক ধরে যিনি এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আবারও তিনি ফিরলেন সেই পদে। ফিরলেন বিপুল জয় নিয়ে। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফল সত্যিই যেন হতচকিত করে দিল সকলকে। রাজ্যবাসীর কাছে একটু শান্তি অনেক বড়ো পাওয়া। আর এই শান্তির প্রহরী যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের শান্তির দায় যেন নিজে তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আর একথা সকলেই গভীরভাবে বিশ্বাস করে।

মানবিকতাই এখানে হিমালয়ের চূড়া হয়ে আছে। যে কোনও বৈষম্যের বিরুদ্ধেই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সমতার কোনও শ্লোগান এখানে কৃত্রিম কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হয় না। যা কিছু ভাবা হয় তা সকলের ভালোর জন্য। সকলের কল্যাণের জন্য। সকলের কল্যাণ না হলে প্রকৃত কল্যাণ আসবে না কোনওদিন। জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো আগে মেটাতে হবে। মানুষ নিজেকে যেন মানুষ বলে ভাবতে শেখে। দু মুঠো অন্নের জন্য যেন সারা রাত তাকে জেগে কাটাতে না হয়। নিরন্ন মুখে শিশুরা যেন ঘুরে না বেড়ায় খোলা মাঠে। একবেলা খাওয়ার জন্য শৈশব যেন অকালে ঝরে না যায়। এই দরিদ্র, নিঃস্ব মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। তৈরি করতে হবে সেই প্রশাসন, সেই সরকার। ভাবনার এই নতুন মোড়কই আসল পরিবর্তন।

এই দরিদ্র, নিঃস্ব মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। তৈরি করতে হবে সেই প্রশাসন, সেই সরকার। ভাবনার এই নতুন মোড়কই আসল পরিবর্তন।

মানুষের কল্যাণ করা খুব সহজ কথা নয়। 'কল্যাণ'-এর অর্থ একেক জনের কাছে একেক রকম। সকলের কল্যাণের চরিত্রও সমান নয়। কিন্তু যে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে এক পা এগোনই অগ্রগতি। প্রত্যেককেই একপা একপা করে এগোতে হবে। এই এগোনোর জন্যই চিহ্নিত হল প্রতিটি আলাদা আলাদা ক্ষেত্র। আর প্রতি ক্ষেত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

দশ কোটির বেশি রাজ্যবাসীর জন্য সরকারের কোমল ছোঁয়া যেন রূপকথার গল্পকে মনে করিয়ে দেয়। যদি পাশে কেউ না থাকে তবু তার পাশে সরকার আছে। এই দশ বছরে এরাজ্যের মানুষ বুঝেছে সরকার তার নিজের। ভোট সে যে দলকেই দিক সরকার তাকে ফেরাবে না। এইভাবেই কাছে এসে এসে পাশের বন্ধু হওয়ার আসনটা পাকা করে ফেলেছে। প্রকট সমস্যাতেও মানুষকে দিশা দেখানো সম্ভব হচ্ছে। কারণ একটাই। সেটা হল, ওপর থেকে কোনও তত্ত্বকে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। প্রতিটি প্রয়োজনকে নির্দিষ্ট অবস্থানে রেখেই পথ দেখানোর চেষ্টা হয়েছে।

মানুষের সরকার--এ কথা কোনও অত্যুক্তি নয়। গরিব মানুষকে নিয়ে যে সরকার এগোবার চেষ্টা করে, প্রাধান্য দেয় সেই মানুষগুলোর চাওয়া-পাওয়ার ভাবনাকে, তার জন্য ভাবনার আকাশটা যত ছড়িয়ে দেওয়া যায় ততই সাফল্য আসে। যদিও একথা স্বীকার করতেই হবে, মানুষকে আত্মনির্ভরতার স্বপ্নে জাগাতে না পারলে দীর্ঘ পথ এইভাবে হাঁটা যাবে না। চাওয়া এবং পাওয়া-- দুটোই সমানভাবে একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না।

প্রয়োজন হল স্বপ্ন দেখতে শেখা মানুষকে গড়ে নেওয়া। এই সেই ভূমি বারেবারে যেখানে 'মহামানব' এসেছেন সাধারণ মানুষের রূপ ধরে। শতকের পর শতক চলে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যার পাহাড় বেড়েছে বই কমেনি। রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি যে পথের দিশা দেখিয়ে গিয়েছেন সেই পথে কতটা হাঁটতে পেরেছি আমরা? এপ্রশ্ন আমাদের নিজের মধ্যে নিজের জন্য উচ্চারিত।

অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তাঁরা। প্রতিটি জীবনপ্রদীপ স্থিরভাবে যেন আলো দিতে পারে। বাঙালির পথপ্রদর্শক এই মানুষগুলো বারবার সেই কথাই বলতে চেয়েছেন, আমরা পারলে তোমরাও পারবে। কী সেই পারা? আত্মশক্তির জাগরণ ঘটানো। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন বলে যিনি বিশ্বাস করতেন, যিনি বিশ্বাস করতেন সব ধর্মই সমান, যিনি বিশ্বাস করতেন নারী-পুরুষে কোনও ভেদ নেই, যিনি বিশ্বাস করতেন যে টাকা মাটি মাটি টাকা সেই মানুষের উপলব্ধির আলোয় আমাদের হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন এক বীর সন্ন্যাসী। সর্বস্ব ত্যাগ করে যিনি ডেকে বলতে পেরেছেন, বলো দরিদ্র ভারতবাসী,মুর্খ ভারতবাসী আমার রক্ত, আমার ভাই। ভারতীয়ত্বের এই ডাকে বাঙালি সেইদিন থেকে নিজেকে দীক্ষিত করেছে। বাঙালির ঘরে ঘরে দিবারাত্র এই মন্ত্র জপ হয়ে চলেছে। আজও। প্রতিদিন। রামকৃষ্ণের ভাবনা বিবেকানন্দের 'সর্ব জীবে প্রেম'-এর বাণীর মধ্য দিয়ে বাঙালি জীবনকে প্রকৃত চোখ খুলতে শিখিয়েছে।

যেমন, বিদ্যাসাগর। বাঙালিকে নিজের অপরিসীম ভালবাসায় অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। শুধু বাঙালি হিসেবে নয়, একজন প্রজ্ঞাবান ভারতীয় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দারিদ্র্যক্লিষ্ট কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্যে একটু বড়ো আকৃতির মাথা নিয়ে, মেরুদণ্ড সোজা করে, ধুতি আর চটি পড়া, পৈতেধারী সেই মানুষটি ব্রিটিশ ভারতের শাসকদের দেখিয়েছিলেন, এখানকার মানুষদেরও এক উজ্জ্বল অতীত আছে। শাস্ত্রমতে, বিধবাবিবাহ চালু করে ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করে বাঙালি নারীর জীবনে তিনি এনেদিলেন খোলা হাওয়া। নারীর শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে সমগ্র এশিয়া মহাদেশকে নতুন বার্তা দিলেন। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, রামমোহন রায় সতীদাহপ্রথা রদ করে বাঙালি নারীকে এক পৈশাচিক ঘটনার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সমাজকে বাধ্য করেছিলেন নারীর স্বাধীন জীবন সম্পর্কে ভাবতে। নারী স্বাধীনতার এক মজবুত ভিত তৈরি করে যিনি আধুনিক ভারতের সূচনা করেছিলেন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার মাধ্যমে সনাতন ভারতীয় দর্শনের ঔপনিষদিক সত্যকে জীবন-আচরণের মধ্যে স্থান দিলেন। যার ফলে প্রগতিশীল এক মানবিক জীবনধারার বিকাশ ঘটল হিন্দু বাঙালির রক্ষণশীল জীবনে। গড়ে উঠল এক নতুন সমাজ। ব্রাহ্মসমাজ। চেতনার দিকবলয়ে নতুন সূর্যের দেখা মিলল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ব্রাহ্মসমাজকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করলেন। বিস্তার ঘটালেন সমগ্র ভারতময়। পির আলির কারণে কয়েক প্রজন্ম আগে হিন্দুধর্মের মূল শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বংশধরদের ঘটনায় যন্ত্রণাবিদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় নতুন জীবনধর্মের সন্ধান পেলেন। এরই খনিটুকু তুলে দিলেন প্রিয় পুত্র রবীন্দ্রনাথের হাতে। যিনি মানুষ আর প্রকৃতির নিবিড় বন্ধনের মাঝে সেতু গড়ে দিলেন। শুধু বাঙালি নয়, শুধু ভারতবাসী নয়, বিশ্বের মানুষ সেই সেতুর উপর দিয়ে নিত্যকালের খেলায় মেতেছে। যেন বহু আগেই কেউ গেয়ে গেছেন 'খেলা হবে' সেই গান।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, রামমোহন রায় সতীদাহপ্রথা রদ করে বাঙালি নারীকে এক পৈশাচিক ঘটনার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সমাজকে বাধ্য করেছিলেন নারীর স্বাধীন জীবন সম্পর্কে ভাবতে। নারী স্বাধীনতার এক মজবুত ভিত তৈরি করে যিনি আধুনিক ভারতের সূচনা করেছিলেন।

বাংলা এইভাবে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের সম্মান ফিরিয়ে আনতে মরিয়া হয়ে উঠল। সে ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। আমরা ভুলে যাইনি, জোঁড়াসাকোর দেবেন ঠাকুরের পরিবারের এক ছেলে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম আই সি এস হলেন। আমরা ভুলে যাইনি, এই দেবেন ঠাকুরের পরিবারের আর এক ছেলে এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কারটা নিয়ে এলেন সাহিত্যে। ভুলে যাইনি, কলকাতার শিমলেপাড়ার বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, গৈরিক সন্ন্যাসী শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে সনাতন ভারতীয় ধর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিতে বাধ্য করলো। ভুলিনি সেই বৈজ্ঞানিকের বিশ্বজয়ী সত্যপ্রতিষ্ঠার কঠিনতম লড়াই ও জয়, যিনি প্রমাণ করলেন, গাছেরও প্রাণ আছে এবং বিশ্বকে স্তম্ভিত করে ঘোষণা করলেন, জড় ও জীবের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

আর ভুলব না কোনওদিন, ভারতমাতার স্বাধীনতার জন্য ছদ্মবেশে ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে গিয়ে লড়াই করতে করতে আজও না ফেরা নেতাজিকে।

ভুলিনি। ভুলব না। আরও কত শত কথা। কত আত্মত্যাগের গাথা। এইসব নিয়েই বাঙালির ঘর-গেরস্থালি। বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। যা প্রতিমুহূর্তে বহুগুণিত হয়ে চলেছে। এই আবহে বাঙালির বেড়ে ওঠা,বেঁচে থাকা। এই মানসভূমি বাঙালিকে এক মুহূর্ত ভুলতে দেয় না তার আবহমান কালের স্বপ্ন। ভুলতে দেয়না বীর সন্ন্যাসীর সেই সত্যদৃষ্টির বাঙ্ময় প্রকাশ। চাষির ঘর থেকে বেড়োবে নতুন ভারত।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন হয়তো সত্য হতে শুরু করেছে। এই রাজ্য কৃষিভিত্তিক। রাজ্যের প্রায় আশি শতাংশ মানুষ কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত। এই সরকার গত দশ বছরে কৃষিক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। নানা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষিকাজে যেসব বিষয় যুক্ত তার প্রতিটি বিষয়ে সরকার ছোটো ছোটো প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা দিয়েছে। কৃষিকে জুড়ে অজস্র প্রকল্প। প্রান্তিক কৃষক এতে উপকৃত হয়েছে। তার ফল পেয়েছি হাতেনাতে। বছরের পর বছর কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে পাচ্ছে এই রাজ্য কৃষিকর্মণ পুরস্কার। অন্যদিকে, কৃষকের আয় বেড়েছে তিনগুণ। এই আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সরকারের জমিনীতির সঙ্গে আপোষহীন মানসিকতা। কৃষিজমির কোনওরকম অপব্যবহার করা যাবেনা। যতোবড়ো শিল্প-উদ্যোগের ভাবনা আসুক না কেন, উদ্যোগপতিকে সঠিক দামে জমি কিনে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সরকার অটল। সিঙ্গুর আন্দোলনের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে এই সরকারের ক্ষমতায় আসা। বিশ্বজুড়ে কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অন্যতম প্রধান স্থানে। এই আন্দোলন দেখিয়েছে, কৃষিজমি কৃষকের কাছে সন্তানতুল্য, প্রিয়। মাতৃসম শ্রদ্ধার। প্রেয়সীর মতো কাছের। বাংলার কৃষি জীবনের সঙ্গে বংশপরম্পরায় জুড়ে আছে। বিত্তশালী মানুষের কাছেও যেমন, তেমনি প্রান্তিক মানুষটির কাছেও নিজস্ব জমির পরিমাণ যেন তার পরিচয় হয়ে ওঠে, আস্থার বিষয় হয়ে ওঠে। গত দশ বছরে এই রাজ্যে কৃষিজমি শিল্পের জমিতে পাল্টে যায়নি।

শিল্প কলকারখানার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তারজন্য তিনফসলি জমিকে কারখানার শেডে পরিণত করা যাবে না জমিমালিকদের অন্যায় উপায়ে বাধ্য করে। শুধু শিল্প নয়, উন্নয়নের জন্যও ন্যায্যমূল্যে জমি কিনতে হবে জমি মালিকের কাছ থেকে। সে সরকারই হোক আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই হোক। জমি ক্রমশ অমূল্য হয়ে উঠছে। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে তিনভাগ জল। মাত্র এক ভাগ স্থল। এই রাজ্যের দক্ষিণ জুড়ে মহাসাগর। উত্তরে পাথুরে পাহাড়। পশ্চিমে রুক্ষ মালভূমি। উর্বর সমভূমি অংশের জন্য কোনও আপোস নয়। তাহলে, এই রাজ্য যে শুধু খাদ্য সংকটের মধ্যে পড়বে তাই নয়, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমস্যা দেখা দেবে। আমরা জানি, বংশ পরম্পরায় আজো কৃষি পরিবারের সদস্যদের ছোটো বড়ো সকলকেই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়তে হয়। বছরের বেশ কিছু সময় কৃষি শ্রমিকের বিপুল চাহিদা তৈরি হয়। একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে চলে যায় শ্রমিক। স্থানীয়ভাবে কৃষিশ্রমিকের আকাল তৈরি হয়। যেহেতু কৃষি আজও আবহাওয়ানির্ভর তাই সময়ের সঙ্গে কৃষিকাজ করতে হয়। এই ঋতুনির্ভরতা কৃষিকে বাধ্য করেছে সবকিছু অস্বীকার করতে। এই করোনা অতিমারিতেও দেখা গেছে, নানা বিধিনিষেধ কঠোরভাবে মেনে সব থেমে যাওয়া বিশ্বে মাঠে নামতে হয়েছে কৃষককে, কৃষক পরিবারকে। নির্দিষ্ট ঋতুতে নির্দিষ্ট ফসলের চাষ হয়। কৃষকসমাজে এই ক্যালেণ্ডার মনে গাঁথা। যেহেতু এরা চিরাচরিত চাষবাসেই যুক্ত। তবে, সম্প্রতি, বিকল্প চাষের জন্য শস্যবৈচিত্রের মাধ্যমে চাষবাসে কিছু বেশি আয়ের মুখ দেখছে চাষিরা। প্রথাগত আয় তো আছেই। নতুন নতুন শস্য, সবজি, ফল, ফুল, ভেষজ গাছের চাষের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্র নতুন দিশা পেয়েছে।

এই করোনা অতিমারিতেও দেখা গেছে, নানা বিধিনিষেধ কঠোরভাবে মেনে সব থেমে যাওয়া বিশ্বে মাঠে নামতে হয়েছে কৃষককে, কৃষক পরিবারকে।

বাংলার কৃষি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। এই কৃষি-ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে শুধু বজায় রাখতেই নয়, আরও উন্নত করতে গত কয়েকবছরে রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলিকে একটু ফিরে দেখা।

কৃষি

আমার ফসল, আমার গাড়ি

উৎপাদিত ফসল খেত থেকে তোলার পর ক্ষতি রোধ করা এবং উৎপাদিত ফসল দ্রুত বাজারজাত করার জন্য কৃষিজ বিপণন দপ্তরের পক্ষ থেকে **আমার ফসল, আমার গাড়ি** প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, কৃষক গোষ্ঠী সমূহ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে নির্বাচিত উপভোক্তাদের ৬টি প্লাস্টিক ক্রেট-সহ ভ্যান রিকশা/মনুষ্যচালিত সবজি বহনকারী গাড়ি দেওয়া হয়।

এক্ষেত্রে নির্বাচিত উপভোক্তা একটি ভ্যান রিকশা ক্রয় করার জন্য কৃষিজ বিপণন অধিকারের তরফ থেকে ১০,০০০ টাকা ভরতুকি হিসাবে অনুদান পেয়ে থাকেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে জেলা কৃষিজ আধিকারিক দরপত্রের মাধ্যমে ভ্যান গাড়ি ক্রয় করে নির্বাচিত উপভোক্তাদের মধ্যে বণ্টন করতে পারেন।

আমার ফসল, আমার গোলা

উৎপাদন পরবর্তী স্তরে ফসলের অপচয় রোধে এবং গুণগত মান বজায় রেখে যথাযথভাবে মজুত করার উদ্দেশ্যে কৃষিজ বিপণন দপ্তরের **আমার ফসল, আমার গোলা** এই প্রকল্পে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের গোলা নির্মাণের জন্য আবেদন-পত্র সাপেক্ষে ভরতুকি হিসাবে অনুদান দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে চিরাচরিত গোলা নির্মাণের জন্য ৫০০০ টাকা, উন্নত মানের গোলা নির্মাণের জন্য ১৭,৩২৯ টাকা এবং পেঁয়াজের গোলা নির্মাণের জন্য ৩২,৮৩৯ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে।

আমার ধান, আমার চাতাল

ধান ও অন্যান্য কৃষি পণ্য রোদে শুকানোর জন্য চাতাল এবং তা সংরক্ষণের জন্য চিরাচরিত গোলা নির্মাণের উদ্দেশ্যে **আমার ধান, আমার চাতাল** এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, কৃষক গোষ্ঠী সমূহ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্য থেকে নির্বাচিত উপভোক্তাদের চাতাল ও চিরাচরিত গোলা নির্মাণের জন্য কৃষিজ বিপণন দপ্তরের পক্ষ থেকে যথাক্রমে ১৭,৯৭৫ টাকা ও ৫০০০ টাকা ভরতুকি হিসাবে অনুদান প্রদান করা হয়।

কৃষির উন্নয়নে কৃষকের পাশে সর্বদা সরকারের তৃণমূলস্তর পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্মী ও আধিকারিকরা থাকেন। ন্যায্যমূলে চাল কেনা হয় কৃষকের থেকে। গ্রামে গ্রামে শিবির করে।

সুফল বাংলা

২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সালে কৃষিজ বিপণন দপ্তরের **সুফল বাংলা প্রকল্প** শুরু হয়। চাষিদের থেকে লাভজনক দামে সরাসরি কৃষিপণ্য সংগ্রহ করে, যুক্তিযুক্ত দামে, তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় চলমান অথবা স্থায়ী বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে। এইসব 'সুফল বাংলা' বিপণিতে এক ছাদের তলায় সবজি, ফল, মাংস, দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য, চাল, ডাল, সবধরনের সুগন্ধী চাল পাওয়া যায়। সিঙ্গুর তাপসী মালিক কৃষক বাজার এই প্রকল্পের মুখ্যকেন্দ্র। প্রকল্পের ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রতিদিন কৃষিপণ্য ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য প্রচার করা হয়।

খাদ্যসাথী

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের **খাদ্যসাথী** প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল সুলভ মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা দেওয়া।

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন এবং রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবার, বিশেষ অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবার ও রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা-১ এর তালিকাভুক্ত পরিবারের সমস্ত মানুষের কাছে রাজ্য সরকার খাদ্যশস্য পৌঁছে দিচ্ছে।

খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অনুপ্রেরণায় ৪০ লক্ষের বেশি মানুষের জন্য বিশেষ প্যাকেজের মাধ্যমে স্বাভাবিক বরাদ্দের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে। জঙ্গলমহল, আয়লায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার, চা-বাগানের সমস্ত পরিবার, দার্জিলিং-এর পাহাড়বাসী, সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক পরিবার, টোটোপাড়ার আদিম জনজাতিভুক্ত পরিবার এই বিশেষ প্যাকেজের আওতায় আছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে **পুষ্টি-পুনর্বাসন কেন্দ্রে** চিকিৎসাধীন শিশু, মা ও তাদের পরিবারের জন্য মাসে ৫ কিলোগ্রাম চাল, ২.৫ কিলোগ্রাম গম, ১ কিলোগ্রাম মুসুর ডাল ও ১ কিলোগ্রাম ছোলা বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে 'বিশেষ কুপন' চালু করে।

গণবণ্টন ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য ডিজিটাল রেশন কার্ডের প্রচলন ও সার্বিক কম্পিউটার ব্যবস্থাপনার সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে।

মা প্রকল্প

দরিদ্র মানুষের জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রতিদিন সুলভে দুপুরবেলার অন্নসংস্থান। 'মা' প্রকল্প শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১। রাজ্যের শহর ও মফঃস্বল এলাকার মানুষের জন্য রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ অত্যন্ত মানবিক এবং অনন্য। জনদরদি এই প্রকল্প কীভাবে রূপায়িত করছে রাজ্য সরকার, তা দেখতে হাজির ছিলেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার নিকলো, ব্রিটিশ কাউন্সিলের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ডিরেক্টর দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ। ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী ও পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম প্রমুখ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী, যেখানে যেখানে কমিউনিটি কিচেন হচ্ছে, সেখানকার কর্মীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করে কথা বলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বারবার নজর দিতে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, 'মা' এমন একটি শব্দ, যার মধ্যে মমতা রয়েছে। তাই প্রকল্পের নাম 'মা' দেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হলেও অনেকেই বাইরে খান। তাঁদের রান্না করা খাবার হলে সুবিধে। তাই এটি চালু হল। গরিব মানুষের জন্য এটি করা হলেও যে কেউ ৫ টাকা দিয়ে দুপুরে পেট ভরতি ভাত, সবজি, ডাল, ডিম খেতে পারবেন। সরকার প্রতি প্লেট খাবারে ১৫ টাকা ভরতুকি দিচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা এই প্রকল্পে কাজ করবেন। ক্রমে সারা রাজ্য জুড়ে এই প্রকল্পের মাধ্যমে অত্যন্ত কমদামে স্বাস্থ্যকর খাবার পাওয়া যাবে। আর্থিকভাবেও বহু মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে উঠবেন।

জলতীর্থ

জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের **জলতীর্থ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল রাজ্যের খরাপ্রবণ জেলাগুলিতে বৃষ্টির জল ধরে রাখা ও সেচের কাজে লাগানো। রাজ্যের অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষি যা প্রধানত বৃষ্টিনির্ভর। নদী-নালা-পুকুর-দিঘি-খাল-বিল-বেষ্টিত অঞ্চলে সারা বছরই চাষ কম-বেশি করা সম্ভব। সেচের কাজও সহজে করা যায় সেসব অঞ্চলে। কিন্তু রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে যেমন পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূমে ভূ-প্রাকৃতিক কারণে জলের অপ্রতুলতার পাশাপাশি বৃষ্টির জল ধরে রাখার ক্ষমতা কম। ফলে মূল্যবান বৃষ্টির জল সংরক্ষণের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে নানা সেচ পদ্ধতির মাধ্যমে সেই জল যথাযথভাবে ব্যবহার করে জেলাগুলিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো হয়। পশুপালন ও অন্যান্য কৃষিভিত্তিক শিল্পের কাজে ব্যবহার করা যায়। এই উদ্দেশ্যে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় এবং সুন্দরবনের লবণাক্ত জমিতে এই প্রকল্প প্রচারের ও রূপায়ণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

জল ধরো জল ভরো

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক এবং কৃষিও মূলত বৃষ্টিনির্ভর। জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের **জল ধরো জল ভরো** প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল রাজ্যে বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে চাষের কাজে ব্যবহার করা। ভূগর্ভস্থ এবং ভূপৃষ্ঠের জলের পরিমাণ বাড়াতে ২০১১-১২ সালে এই প্রকল্পের সূচনা করা হয় এ রাজ্যে। একদিকে বৃষ্টির জল ধরে রাখা এবং অন্যদিকে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে বয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া জলকে আটকে রাখা— এই দুই পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকল্পে সাফল্য পেয়েছে এই দপ্তর। এইভাবে জল ধরে রেখে, সারা বছর এমনকি খরা মরশুমেও কৃষিজমিতে জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করা যায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে।

এই প্রকল্পের আর একটি লক্ষ্য হল বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং সেচের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে জলের ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই নিয়ে জন-সচেতনতামূলক প্রচার কার্য চলছে। জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, সেচের জলের যথাযথ ব্যবহার এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে জলের গুণমান বজায় রাখা—সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তাগুলি পৌঁছে দেওয়াই প্রচারের উদ্দেশ্য।

এই প্রকল্পে ২ লক্ষাধিক জলাশয়কে সংস্কার করা এবং নতুন করে খননের কাজ করা হয়। ছোটো ছোটো সেচ বাঁধ নির্মাণ ছাড়াও ছোটো-বড়ো নানা আকারের পুকুর, দিঘি, নয়ানজুলি এবং অন্যান্য জলাধারের পুনঃখনন ও সংস্কার কার্য চলছে। এতে জলাশয়গুলির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, এইসব জলাশয়ে মাছ চাষেরও কাজ পুরো মাত্রায় চলছে। ফলে রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মৎস্যচাষের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের জীবিকার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সহায়তায় বাড়ির ছাদ থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে কৃত্রিমভাবে রাজ্যে সেচের

ক্ষমতা বাড়ানোর কাজ চলছে। তৈরি হচ্ছে চেক ড্যাম, জল সংক্ষণের জন্য কৃত্রিম জলাধার। এককথায়, এটি একটি বহুমুখী প্রকল্প। শুখা মরশুমে সেচের সুযোগবৃদ্ধি, দরিদ্র মৎসজীবীদের এই জলাধারগুলিতে মাছ চাষের মাধ্যমে আয়ের নতুন সুযোগ করে দেওয়া, বছরভর স্থানীয় মানুষদের ঘরের কাজকর্মের পাশাপাশি পশুপালনের জল পাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সেচবন্ধু

'সেচবন্ধু' একটি কৃষক-বন্ধু প্রকল্প যা ২০১৫–১৬ আর্থিক বছরে শুরু হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন সেচ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, অন্যদিকে খাদ্যের জোগান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন আসার কথা। দরিদ্র কৃষকেরাই এই প্রকল্পের সুযোগ পান। স্থানীয় গ্রাহককে পরিষেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হয়।

মাটির সৃষ্টি

১৩ মে, ২০২০, বুধবার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন এক নতুন প্রকল্পের। গ্রাম বাংলার গরিব মানুষকে আর্থিক সঞ্জীবনী দিতে এই ঘোষণা। নতুন এই প্রকল্পের নাম 'মাটির সৃষ্টি'।

এই প্রকল্পের সূচনায় নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'দুরন্ত বৈপ্লবিক কর্মসূচি ঘোষণা করছি। জেলা পরিষদের সভাধিপতিদের সঙ্গে বৈঠক করছি। ৫০০০০ একর জমি এতে আসবে। আড়াই লক্ষের বেশি মানুষ এতে উপকৃত হবে। পরিবেশ বান্ধব প্রজেক্ট। নাম 'মাটির সৃষ্টি'। শুধু তাই নয়, তিনি জানান, ইতিমধ্যে ৬৫০০ একর জমিতে প্রাথমিক স্তরে কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমানে অনেক জমি পড়ে রয়েছে। সরকারের ও কৃষকেরও। মাটি খুব রুক্ষ বলে কৃষকরা কিছু করতে পারেন না। আমরা প্ল্যান করেছি, এই মাটির সৃষ্টি প্রকল্পের মাধ্যমে মাছ চাষ, পশু পালনের মতো কাজ চলবে। স্থানীয় চাষিদের দশ-কুড়ি একর ও সরকারি জমি নিয়ে মাইক্রো প্ল্যান তৈরি করা হবে, কো অপারেটিভ গড়া হবে, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে কাজে লাগানো হবে। কোনও ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে না। ১০০ দিনের কাজে লাগানো হবে।

(খ) বাসস্থান

গীতাঞ্জলি

আবাসন দপ্তরের **গীতাঞ্জলি** প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেকের সুনিশ্চিত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয় আবাসন দপ্তর। সুস্থ জীবনযাপনের অন্যতম শর্তই হল নিজের একটি বাড়ি। যে কোনও মানুষের কাছে এটি একটি স্বপ্ন। কেউ নিজের চেষ্টায় ও সামর্থ্যে এই স্বপ্নপূরণ করতে পারেন। কেউ বা বংশপরম্পরায় স্বপ্নই দেখে যেতেন এতদিন।

বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনেও এই মৌলিক চাহিদার স্বপ্ন পূরণ হয়ে চলেছে।

এরকমই একটি স্বপ্নপূরণ-এর প্রকল্প—গীতাঞ্জলি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের পাশে রাজ্য সরকার। গ্রামীণ এলাকা তো বটেই, শহরতলির মানুষ—যাঁদের নির্দিষ্ট ঘরবাড়ি নেই, তাঁদেরও মাথার ওপর ছাদ করে দিচ্ছে আবাসন দপ্তর। শুধু নিজের জমিটুকু থাকতে হবে এবং তাতে যেন আইনি জটিলতা না থাকে।

রাজ্য সরকার, এই প্রকল্পে, প্রতিটি আবাস নির্মাণে সমতলের জন্য ১.২ লক্ষ টাকা এবং সুন্দরবন, পার্বত্য অঞ্চল ও দুর্গম এলাকার জন্য ১.৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রথমে ৭০ শতাংশ এবং পরে ৩০ শতাংশ অর্থ সুবিধাপ্রাপকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা পড়ে যায়। গৃহহীন অথচ জমি আছে এমন ব্যক্তি যাঁর মাসিক আয় ৬০০০ টাকা বা তার কম তিনি যোগাযোগ করতে পারেন। এককথায়, রাজ্যের প্রত্যেক দরিদ্র মানুষ, বিশেষ করে বন্যা বা নদী ভাঙনে যাঁদের ছাদ ভেসে গিয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে।

বাংলার বাড়ি

নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরের **বাংলার বাড়ি** প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল শহর অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের পুনর্বাসনের জন্য নিজস্ব নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলের দিকে প্রতিনিয়তই মানুষের চলে আসার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিতে মানুষের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। অথচ জমির অভাব। ঠাঁই মেলার সমস্যা। কোনওরকমে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় দিনগুজরান করে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন শহরের দরিদ্র মানুষেরা। জমির অপ্রতুলতার কথা ভেবে এই সমস্যা সমাধানে বহুতল যৌথআবাস তৈরির প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখানে নিজস্ব ফ্ল্যাটে তাঁদের আশ্রয় হবে। পূর্ণ হবে জীবনের মানোন্নয়নের অন্যতম মূল চাহিদা। সুস্থ ও স্বাস্থ্যকরভাবে বাঁচার পরিবেশ প্রদান করে 'সুনাগরিক' হিসেবে সকলে যাতে জীবনযাপন করতে পারে সেই প্রচেষ্টায় অন্যতম পদক্ষেপ এই প্রকল্প। জি+৩ এই আবাসনগুলিতে ২৮৫ বর্গফুট কার্পেট এরিয়ার ফ্ল্যাট দেওয়া হচ্ছে। ১৬টি করে ফ্ল্যাট থাকবে। প্রতিটি ফ্ল্যাটের মূল্য ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। উপভোক্তাকে এই বাবদ বহন করতে হচ্ছে ২৫,০০০ টাকা মাত্র।

যে পরিবারের কর্ত্রী মহিলা অথবা অন্যভাবে সক্ষম (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তি এবং যাঁরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও মাসে ১০ হাজার টাকার মধ্যে আয়, তাঁরা এই নতুন প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক ভাগহারে এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। স্থানীয় পৌরসভায় যোগাযোগ করতে হয়।

নিজ গৃহ নিজ ভূমি

ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুর্নবাসন দপ্তরের প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল রাজ্যের ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের স্থায়ী আশ্রয় এবং আশ্রয়কে কেন্দ্র করে জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন। এটি একধরনের পুনর্বাসন প্রকল্প। সরকারের খাস জমি ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে ৫ শতক করে চাষ ও বাসের জন্য দান করা হচ্ছে। ওই জমিতে অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাড়ি তৈরি, রাস্তা তৈরি, জল-আলো-নিকাশির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাড়ি সংলগ্ন জমিতে চাষবাস, প্রাণীপালন, কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প, সংলগ্ন অঞ্চলে পুকুর কেটে মাছ চাষ করানো, স্থানীয়ভাবে সুলভ কাঁচামাল ব্যবহার করে নানা পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ ও বিক্রির ব্যবস্থা—এইসব নানা কাজের মধ্যে দিয়ে এই **'ভূমি-দান'** প্রকল্প একটি বহুমুখী প্রকল্প হিসেবে সার্থক হয়ে উঠছে।

২০১১-র ১৮ অক্টোবর এই প্রকল্পটি চালু করা হয়। বহুসংখ্যক মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে তাঁদের জীবনযাপনের মান উন্নত করে চলেছেন। কৃষি-কাজ, প্রাণীপালন, মৎস্য চাষ, হস্ত ও কুটিরশিল্প প্রভৃতি চিরাচরিত পেশার সঙ্গে আবহমান কাল ধরে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও আজও যাঁরা একটুকরো জমির মালিক হতে পারেননি এবং বসতজমি কেনার ক্ষমতাও নেই তাঁরাই এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পাবেন। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রান্তিক মানুষজনও এই সুবিধা পাচ্ছেন।

চা-সুন্দরী

রাজ্যের ৩৭০টি চা-বাগানে প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক স্থায়ীভাবে কর্মরত আছেন যাদের মধ্যে ৫০ শতাংশই মহিলা ও সিংহভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার বহুদিন ধরেই সারা বছর ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া ছাড়াও নিখরচায় বিদ্যুৎ, চিকিৎসার ব্যবস্থা, মিড-ডে মিল ও আরও বিভিন্ন সুবিধার ব্যবস্থা করেছে।

চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের অনেকেরই টাকার অভাবে নিজের কোনো বাসস্থান নেই। তাই চা-বাগানের গৃহহীন শ্রমিকদের আবাসন দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'চা-সুন্দরী' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে আগামী ৩ বছরে রাজ্য সরকার নিজের অর্থে চা-বাগানে স্থায়ীভাবে কর্মরত গৃহহীনদের জন্য এই আবাসনের ব্যবস্থা করবে। এইজন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয় ২০১৯-২০-র রাজ্য বাজেটে।

আলোশ্রী

সৌর বিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহার ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস দপ্তর **আলোশ্রী** প্রকল্প চালু করেছে। এই সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ এসইডিসিএল, পশ্চিমবঙ্গ এসইটিসিএল এবং অন্যান্য সরকারি বাড়ি ও অফিসে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১.৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিড কানেকটেড রুফ টপ সোলার পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট (জিআরটিএসপিভি) তৈরি হয়েছে।

সবার ঘরে আলো

আধুনিক জীবনযাপনে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে রাজ্যের বিদ্যুৎবিহীন অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস দপ্তরের **সবার ঘরে আলো** প্রকল্পের সূচনা করা হয়।

প্রধানত, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রান্তিক গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোজনের ফলে রাজ্যের উন্নয়নে অন্যান্য প্রকল্পগুলির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সুবিধা সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হলে বিদ্যুৎ পরিষেবার প্রসার অপরিহার্য। সকলেই যাতে উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প। আয়সৃজনের জন্যও এই প্রকল্পের বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা অনস্বীকার্য।

'সবার ঘরে আলো' প্রকল্পের অধীনে ১৬.৪০ লক্ষ গৃহে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। গ্রামীণ অঞ্চলের প্রত্যেক গৃহস্থই এই প্রকল্পের সুযোগ পেতে পারেন। স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হয়।

হাসির আলো

গত ৮ বছরে রাজ্যে ৯৯.৯ শতাংশ বৈদ্যুতিকরণের মাধ্যমে উপভোক্তাকে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, গরিব মানুষদের কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু এদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত গরিব, তাদের কম দাম সত্ত্বেও বিদ্যুতের খরচ দিতে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়।

এইরকম গরিব মানুষের সহায়তার জন্য 'হাসির আলো' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়। এই প্রকল্পে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের অত্যন্ত গরিব যাঁরা ত্রৈমাসিকে ৭৫ ইউনিট অবধি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন (Life Line Consumer) তাঁদের সম্পূর্ণ বিনামুল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। রাজ্যের প্রায় ৩৫ লক্ষ গরিব পরিবার এর মাধ্যমে উপকৃত হবে। এইজন্য ২০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত হয় ২০১৯-২০-র অর্থবর্ষের বাজেটে।

সবুজশ্রী

বন দপ্তরের **সবুজশ্রী** প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে জন্মগ্রহণের পরপরই একটি মূল্যবান গাছের চারা দেওয়া হচ্ছে।

ওই চারাটি শিশুর নামে লাগাতে হবে এবং শিশুর সঙ্গে সঙ্গে চারাটি বড়ো হবে। শিশুর পরিবার চারাটিকে ও শিশুকে সযত্নে লালনপালন করবে। শিশু বড়ো হলে শিশুর প্রয়োজনে ওই চারা থেকে বেড়ে ওঠা বৃক্ষটিকে আর্থিক কারণে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। এর ফলে শিশুটির ভবিষ্যতের আর্থিক সুরাহার পাশাপাশি গাছটি 'জীবজগৎ'-কেও এতগুলো বছর ধরে অনেক কিছুই দেবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৬-র ১৯ ডিসেম্বর এই প্রকল্পের সূচনা করেন। প্রকল্পের সুবিধাভোগী প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যের প্রতিটি নবজাতক এবং পরোক্ষভাবে প্রতিটি রাজ্যবাসী। এটি একটি বহুমুখী পরিকল্পনা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে 'সবুজ বাংলা' গড়ে তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে প্রকৃতি ও মানবসন্তান-এর মধ্যে যে অচ্ছেদ্য

সম্পর্ক ও অনুভূতি গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে তা অভিনব। সুযোগ পাবে রাজ্যের নবজাতকেরা। প্রতিটি শিশু জন্মানোর পর বনদপ্তর থেকে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই চারা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

মিশন নির্মল বাংলা

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরের **মিশন নির্মল বাংলা** প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাকে মুক্ত শৌচবিহীন হিসাবে ঘোষণা করা। দেশের মধ্যে প্রথম এই রাজ্যেই 'নদিয়া' জেলা এই শিরোপা পায়। যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের ফলে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য নানা ভাবে বিঘ্নিত হয়। বিভিন্নভাবে জনসচেতনতা শিবির, আলোচনাচক্র ও প্রচারের ফলে এই রাজ্যের একের পর এক জেলাকে 'মুক্ত শৌচবিহীন' ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা, কোচবিহার, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও হুগলি জেলা এই স্বীকৃতি অর্জন করেছে। মালদা ও হাওড়া জেলার পর দক্ষিণ দিনাজপুর, বীরভূম, ও মুর্শিদাবাদ জেলাও এই স্বীকৃতির অপেক্ষায়। গ্রামাঞ্চলে বা শহরাঞ্চলে বসবাসকারী যাঁদের বাড়িতে শৌচালয় নেই তাঁরা শৌচালয় নির্মাণে টাকা পান। পঞ্চায়েত অথবা পৌরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

(গ) স্বনির্ভরতা ও কর্মসংস্থান

আনন্দধারা

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আনন্দধারা প্রকল্পের উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য পরিবারের মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে পরিবারের দারিদ্র্য হ্রাস করা। এটি মূলত দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য জীবিকাভিত্তিক প্রকল্প। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৩০ শতাংশ ভরতুকি দিয়ে উৎপাদন এবং অন্যান্য কাজে উৎসাহিত ও সক্রিয় করে তোলার জন্য এই প্রকল্প।

নারীর আর্থিক স্বাবলম্বনের ক্ষেত্রটিকে মজবুত করে গড়ে তুলতে পারলে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে। দেশ ও জনসাধারণের কল্যাণের জন্য গ্রামীণ মহিলাদের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

২০১২-র ১৭মে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যে আনন্দধারা প্রকল্পের সূচনা করেন। দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের অন্তত একজন মহিলাও যদি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারেন, তাহলে সেই পরিবারটি নানা সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। এই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই আনন্দধারা প্রকল্প।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করে লাভজনক স্বনিযুক্তি এবং দক্ষতার ভিত্তিতে মজুরি প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের জীবিকার মজবুত ভিত্তি এবং জীবনধারায় প্রশংনীয় উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাত করার ব্যাপারেও সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহায়ক প্রকল্প

স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি দপ্তরের **পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহায়ক প্রকল্প**-এর মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণের সুদে ভরতুকি দিয়ে

ঋণের বোঝা কমানো হয়। স্বনির্ভর দলগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক, আঞ্চলিক গ্রামীণ এবং সমবায় ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় বার্ষিক ১১ শতাংশ হারে। সরকার এই সুদের ৯ শতাংশ ভরতুকি হিসেবে দেয়। বাকি ২ শতাংশ স্বনির্ভর দলগুলিকে দিতে হয়। ঋণ-ভরতুকির সুবিধাপ্রাপ্ত স্বনির্ভর দলগুলিকে ঋণদানকারী ব্যাংকগুলি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এই ভরতুকি দাবি করতে পারে পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার কর্পোরেশন লিমিটেডের কাছে। এই দাবি সঠিক বিবেচিত হলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অ্যাকাউন্টে ওই ভরতুকির টাকা সরাসরি জমা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প

স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি দপ্তরের **স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (SVSKY)-এর** উদ্দেশ্য হল রাজ্য জুড়ে সফল উদ্যোগী গড়ে তোলা। শহর ও গ্রাম—দু জায়গাতেই বেকার যুবক-যুবতীদের স্ব-নিযুক্তির উদ্দেশ্যে এটি একটি পথিকৃৎ প্রকল্প। প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেড (WBSCL)-এর মাধ্যমে। যাঁরা নিজের উদ্যোগে কোনও ব্যবসা বা কর্মসংস্থানের কাজ করবেন এবং একই অঞ্চলের ৫ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে দল তৈরি করে কোনও আর্থিক উদ্যোগ শুরু করবেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের সরকারি ভরতুকি দেওয়া হয়। ছোটো ছোটো উৎপাদন ক্ষেত্র, নির্মাণশিল্প, ব্যবসা, পরিষেবা, কৃষি-ভিত্তিক শিল্প, ফুলচাষ, উদ্যানপালন, প্রাণীপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ের ৩০ শতাংশ ভরতুকি বাবদ পাওয়া যায় অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং দলগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। কমপক্ষে ৫ জনের দল হতে হবে। একটি পরিবারের শুধু একজন সদস্যই দলে থাকবেন।

ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে এর নাম 'আত্মমর্যাদা' এবং প্রকল্প ব্যয় ১০ লাখ টাকা। দলগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে এর নাম 'আত্মসম্মান' এবং প্রকল্প ব্যয় ২৫ লাখ টাকা। উদ্যোক্তা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫ শতাংশ ব্যয় বহন করবেন।

কেবলমাত্র মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে এই সরকারি ঋণ দেওয়া হবে। যাঁদের পারিবারিক মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে নয় তাঁরাই সুবিধা পাবে। শিল্প, বাণিজ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত ইউনিট নতুন করে তৈরি করতে উদ্যোগীরা এই সুযোগ পান।

স্বামী বিবেকানন্দ-এর নামে এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় ২০১২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। তাদের ভরতুকি দেওয়ার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হচ্ছে, তাই আঞ্চলিক ক্ষেত্রে কাঁচামাল প্রাপ্তির ভিত্তিতে নানা ধরনের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের কথা ভাবা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে যেসব কাঁচামাল পাওয়া সহজ, সেগুলিকে ভিত্তি করে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় এবং নতুন জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এমন অনেক কাঁচামাল বাংলার গ্রামাঞ্চলে সুলভ, যেগুলির ব্যবহার অজানা থাকায় কাজে লাগানো যায়নি এতদিন। বর্তমানে যথাযথভাবে সেগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি হচ্ছে, রাজ্যের বাইরেও সেগুলির চাহিদা থাকছে। ফলে আয় হচ্ছে সহজে। তাছাড়া বাংলার চিরাচরিত শিল্পকর্ম তো আছেই। সাম্প্রতিক অতিমারির কারণে এই কাজ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গতিধারা

পরিবহণ দপ্তরের প্রকল্প **গতিধারা।** কর্মহীন এবং এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নথিভুক্ত যুবক-যুবতীদের স্বনিযুক্তির এই প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে, পরিবহণ ক্ষেত্রে যাঁরা স্বাবলম্বী হতে চান, তাঁদের কাছে আজ দারুণ সুযোগ। বাণিজ্যিক গাড়ি কেনার অর্থের বেশ কিছুটা জোগান দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় গাড়ি কিনলে পরিবহণ দপ্তরের সহায়তায় পারমিট পেতেও অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য, রাজ্যের গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় পরিবহণ দপ্তরের 'গতিধারা' প্রকল্প প্রসারিত করে কর্মহীন যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলা। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ কাঠামো উন্নয়ন নিগম, এই প্রকল্পের কার্যকরী এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। শারীরিকভাবে পিছিয়ে থাকা যুবক-যুবতীরাও এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

যে কোনও বাণিজ্যিক গাড়ি কিনলেই রাজ্য সরকার গাড়ির মোট দামের ৩০ শতাংশ অথবা সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা অনুদান বা ভরতুকি হিসেবে দেবে এবং এই অর্থ ফেরত দিতে হবে না। ওই উদ্যোগীকে নিজেকে কিছু অর্থের জোগান দিতে হবে। সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এবং সমবায় ব্যাংক ছাড়াও প্রকল্পের তালিকাভুক্ত ১৩টি নন-ব্যাংকিং ফিনান্স কর্পোরেশন (NBFC) থেকে গতিধারা প্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে। বর্তমানে 'গতিধারা' প্রকল্প রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় এবং কার্যকরী প্রকল্প। এর লোগো কর্মহীন যুবক/যুবতীদের মধ্যে এই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার জন্য আরও বেশি উদ্দীপনা জোগাচ্ছে।

মুক্তিধারা

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের **মুক্তিধারা** প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, উন্নয়নের ডানায় ভর করে বাঁচার স্বপ্ন

দেখা, দলগতভাবে দারিদ্র্যের মোকাবিলা করা এবং স্থায়ী উন্নয়নের পথে হাঁটা—এইভাবেই 'মুক্তিধারা' বাংলার প্রান্তিক জীবনে পরিবর্তন আনছে।

রাজ্য সরকার এবং নাবার্ডের আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণে **'মুক্তিধারা'** পুরুলিয়াতে শুরু হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রকল্পটি রূপায়ণ করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে বহুমুখী পরিকল্পনায় উন্নয়নের কাজ চলছে। গ্রামবাংলার চিরাচরিত পেশাগুলিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষিত করে তাঁদের জীবন-জীবিকার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের চেষ্টা চলছে।

২০১৩-র ৭ মার্চ স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি দপ্তরের মাধ্যমে 'মুক্তিধারা' প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে পুরুলিয়ায় শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বলরামপুর এবং পুরুলিয়া-১-এর ১৩৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের এই প্রকল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাজ্যের নানা জেলায় 'পুরুলিয়া মডেল' চালু করা হয়েছে। পুরুলিয়াতে এই প্রকল্প সফল হওয়ায় প্রথমে পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রকল্পটি চালু হয় এবং বর্তমানে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪-পরগনা, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানেও 'মুক্তিধারা' চালু হতে চলেছে।

রাজ্যের যে জেলাগুলিতে এই প্রকল্প চলছে সেইসব জেলার দরিদ্র মানুষজন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পূর্বে গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য যাঁরা কোনও সরকারি প্রশিক্ষণ পাননি, তাঁরাও এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারেন।

মুক্তির আলো

নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের **মুক্তির আলো** প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে ও সম্পূর্ণ আর্থিক অনুদানে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যৌনকর্মীদের এবং বিভিন্ন জায়গায় পাচার হয়ে যাওয়া নারী ও বালিকাদের পুনরুদ্ধারের পর কাউন্সেলিং এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। **মুক্তির আলো** প্রকল্পে ব্লক প্রিন্টিং ও স্পাইস গ্রাইন্ডিং-এর উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং 'ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজমেন্ট' ও 'টায়ার টিউবের পুনর্ব্যবহার'-এর উপর প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

পাচারের শিকার হওয়া মহিলা ও বালিকারা, যৌনকর্মী এবং তাঁদের কন্যাসন্তানগণ প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন

যৌন এলাকায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণের কাজ চলছে।

স্বাবলম্বন স্পেশাল

নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের **স্বাবলম্বন স্পেশাল** প্রকল্পের মাধ্যমে পেশাদার যৌনকর্মীদের এবং তাদের অ-সুরক্ষিত কন্যাসন্তানদের সমাজে সুস্থ ও সম্মানযোগ্য জীবনযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিকল্প পেশায় নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে এই প্রথম সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন তাদের থাকা-খাওয়া, কাউন্সেলিং-এর সঙ্গে মাসিক ভাতারও বন্দোবস্ত করেছে সরকার। প্রশিক্ষণ শেষে ইচ্ছুক শিক্ষানবিশদের স্বাবলম্বনের জন্য এই প্রকল্প থেকে এককালীন মূলধনও দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকল্পের নামকরণ ও শুভ সূচনা করেন গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

উৎকর্ষ বাংলা

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬-তে **'উৎকর্ষ বাংলা'** নামে এক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প শুরু করেছে। কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের এই প্রকল্পের আওতায় সমস্ত রাজ্যে ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষে ৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন আইটিআই, পলিটেকনিক, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ও স্বল্পমেয়াদি দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা। এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে টেলারিং, অটোমোবাইল, ওয়েলডিং, ফিটিং, ইলেকট্রিশিয়ান, আইটি, কন্সট্রাকশন, রূপচর্চা, ফিজিওথেরাপি, রিটেল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে। দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্রগুলিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিটি সফল ছাত্রছাত্রীকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের আওতায় সফল ছাত্রছাত্রীদের অনেকক্ষেত্রেই প্লেসমেন্টের সুযোগ করে দেওয়া হয়।

বাংলাশ্রী

এই সরকার ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পকে (MSME) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, কারণ এরাই সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

এই ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে, আরও জোর দেওয়ার জন্য ১লা এপ্রিল, ২০২০ থেকে 'বাংলাশ্রী' নামে একটি নতুন উৎসাহ প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব করা হয়।

যেসব MSME ১লা এপ্রিল, ২০১৯ থেকে স্থাপিত হয়েছে তারাও এই নতুন উৎসাহ প্রকল্পে আসার সুযোগ পাবে। আশা করা যায়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে নতুন ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কর্মসাথী

রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে 'কর্মসাথী প্রকল্প' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা হয়। এই প্রকল্পে আগামী ৩ বছরে, প্রতি বছর ১ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের নিয়মিত আয়ের সংস্থান করা হবে। এর জন্য ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লগ্নির নতুন প্রকল্পে, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। রাজ্যের অধীনস্থ সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে এই ঋণ দেওয়া হবে। আশা করা যায়, এই প্রকল্পের সহায়তায় বেকার যুবক-যুবতীরা ছোটো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা খুচরো ব্যবসা শুরু করে নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারবে। এইজন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়।

(ঘ) স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

বিনাপয়সায় সামাজিক সুরক্ষা যোজনা

বিনা পয়সায় সামাজিক সুরক্ষা-র মাধ্যমে রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকদের বার্ধক্যজনিত দুর্দশা, কঠোর জীবন সংগ্রাম, শারীরিক অক্ষমতা ও অসমর্থতা, সন্তান প্রতিপালনে অসুবিধা, রোগ নিরাময় এবং আরোগ্যলাভের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা— এইসব সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি তাঁদের আয় সুনিশ্চিত করা হয়।

সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বা কর্মীকে সমান সুবিধা দিতে এবং সুবিধা পাওয়ার পদ্ধতিকে সহজতর করতে পূর্বে প্রচলিত পাঁচটি প্রকল্প বা স্কিমকে একত্রিত করে 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা—২০১৭' (এসএসওয়াই ২০১৭) নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বা যোজনা চালু করা হয়। এই পাঁচটির মধ্যে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি পরিকল্প, পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প এবং পশ্চিমবঙ্গ বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে। নির্মাণ ও পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য চালু থাকা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প দুটি সংশোধন করে নতুন যোজনায় প্রাপ্ত সুবিধাগুলি পুরোনো প্রকল্পগুলি থেকে বাতিল করা হয়েছে। অন্যান্য সুবিধাগুলি চলতে থাকে।

এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রগুলি হল— ● ভবিষ্যনিধি ● স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ● মৃত্যু ও শারীরিক অসমর্থতা ● শিক্ষা ● প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশ।

স্বাস্থ্যসাথী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল স্বচ্ছতা ও আধুনিকতার পাশাপাশি অত্যাধুনিক ই-প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নতমানের আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রত্যেক প্রান্তিক মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়া। রাজ্যের কয়েক লাখ আইসিডিএস কর্মী, আশা কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, হোমগার্ড, গ্রিন পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকল সদস্য, অর্থ

দপ্তরের অনুমতিক্রমে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মুখে শুরুতে ছিল হাসির ঝিলিক। কিন্তু করোনা আবহে সকলের জন্য স্বাস্থ্যসাথীর ব্যবস্থা হয়েছে।

সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি কেয়ারের জন্য বেসিক হেলথকভার প্রতি পরিবারে বছরে ৫ লক্ষ টাকা। সম্পূর্ণ কাগজবিহীন, স্মার্ট কার্ড ভিত্তিক এবং ক্যাশলেস। স্বামী/স্ত্রী উভয়েরই পিতামাতা এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত। রয়েছে 24X7 টোলফ্রি কল সেন্টার (18003455384)। সেইসঙ্গে সমস্ত হাসপাতালের তালিকা এবং যাবতীয় তথ্য জানতে চালু হয়েছে, সুবিধাভোগীদের সহায়তার জন্য, অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক স্বাস্থ্যসাথী মোবাইল অ্যাপ। স্মার্টকার্ডে প্রত্যেক সদস্যের বিবরণ, ছবি, বায়োমেট্রিক তথ্য, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি সবকিছুই থাকে। বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালের ও প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে এই কার্ডের মাধ্যমে পরিষেবা পাওয়া যাবে।

মাভৈঃ

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাভৈঃ (ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্‌থ স্কিম ফর দ্য জার্নালিস্ট-২০১৬) প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড-প্রাপ্ত বিভিন্ন মাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা চালু করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানিত। এই মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বদা সজাগ ও শ্রদ্ধাশীল। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন এই পেশাকে ক্রমশ চ্যালেঞ্জবহুল করে তুলেছে। এই পেশার কর্মপরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে ও কর্ম পদ্ধতিতেও হয়ে চলেছে ব্যাপক পরিবর্তন। কর্ম বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও সংবাদমাধ্যম হয়ে উঠেছে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। পশ্চিমবঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড–প্রাপকদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকে রাজ্যে সাংবাদিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ সুবিধা দিতে মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছায় চালু হয়েছে এই স্বাস্থ্য বিমা। রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতো সরকার স্বীকৃত এবং তালিকাভুক্ত, রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিক এবং চিত্র-সাংবাদিকদের জন্য এই স্বাস্থ্য বিমা চালু আছে। এই বিমার আওতায় নির্দিষ্ট সাংবাদিক এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরা প্রতিটি সরকারি এবং তালিকাভুক্ত নির্দিষ্ট কিছু বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পারবেন।

পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য বলতে স্ত্রী (যিনি নিজে মেডিক্যাল অ্যালাওয়েন্স পান না), বাবা-মা যাঁদের মাসিক আয় ৫ হাজার টাকার কম, ছেলেমেয়ে, অবিবাহিত/বিধবা/ডিভোর্সি বোন এবং নাবালক ভাইবোন এই স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আসবেন।

জেলা হোক বা কলকাতা, সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতো এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদন করা যায়।

শিশুসাথী

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই রাজ্যের শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে চিন্তাশীল। এরই ফলশ্রুতিতে কমেছে শিশুমৃত্যু হার। রাজ্যের প্রতিটি শিশুর সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য তিনি একাধিক উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগেই অন্যতম সংযোজন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের **শিশুসাথী** প্রকল্প। এই প্রকল্পের নামও দিয়েছেন তিনি নিজে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে পথ চলতে শুরু করেছে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের এই প্রকল্প।

জন্মের পর কি শিশুর হার্টের সমস্যা ধরা পড়েছে? হার্টে ফুটো, কোনও ভালভ ঠিকমতো তৈরি না হওয়া, হার্টে রক্ত চলাচলে সমস্যা ইত্যাদি যে কোনও রোগ অর্থাৎ চিকিৎসক কি কনজেনিটাল কার্ডিয়াক ডিফেক্ট (Congenital Cardiac Defect) জাতীয় কিছু বলেছেন? একদম চিন্তা না করে চলে আসা যাবে কলকাতার বর্তমানে ৪টি সরকারি এবং ৬টি বেসরকারি হাসপাতালের যে কোনওটিতে। তবে সেটি অবশ্যই জেলার বা ব্লকস্তরে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের মাধ্যমে, সরাসরি নয়।

বর্তমানে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত ওই শিশুর হার্টের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। শুধু তাই নয়, শিশু-সহ বাড়ির একজনের থাকা, সমস্ত ধরনের জটিল অস্ত্রোপচারের সব দায়িত্বই রাজ্য সরকারের। হার্টের বিভিন্ন জটিল সমস্যার চিকিৎসা বিনামূল্যে করিয়ে বাবা-মা, শিশুকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারছেন।

সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএম, কলকাতা মেডিক্যাল, এন আর এস এবং আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাওয়া যায়।

সমাজসাথী

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের **সমাজসাথী** প্রকল্পের উদ্দেশ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য/সদস্যাদের ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমার আওতায় নিরাপত্তা দেওয়া (১৮-৬০ বছর বয়স পর্যন্ত) দুর্ঘটনার সময় উদ্ভুত পরিস্থিতিতে আচমকা যে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়, তার মোকাবিলা করতেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য ও তাঁর পরিবারের পাশে সরকারের দাঁড়ানো।

এই প্রকল্পে প্রতিটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য বা সদস্যা বিনামূল্যে বছরে সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমা পরিষেবা পাবেন। প্রকল্পের আওতায় দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসার খরচ, হাসপাতালে ভর্তির খরচ ছাড়াও চিকিৎসার সময় আরও কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। কাজে অনুপস্থিত থাকার দরুণ দৈনিক পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হন সেই ব্যক্তি। এর ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয় সমাজসাথী প্রকল্পে। এছাড়া বিমা সংস্থা সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী ব্যক্তিকে নানাভাবে সাহায্য করবে—তথ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, নাম নথিভুক্ত করানো, স্মার্ট কার্ড সরবরাহ করা ইত্যাদি। বিমা প্রকল্পটি রাজ্যের সবক'টি জেলাতেই কাজ করবে।

২০১৭ সাল থেকে এই প্রকল্পের সুযোগসুবিধা আরও কিছু বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি হল—

ক) সুবিধাভোগীর মৃত্যুতে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

খ) দুর্ঘটনায় স্থায়ী অক্ষমতার শিকার হলেও তিনি ২ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবেন।

গ) দুর্ঘটনার ফলে আংশিক অক্ষমতা দেখা দিলে, অক্ষমতার মাত্রা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

ঘ) বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে তাঁর ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষার খরচ হিসেবে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে।

ঙ) দুর্ঘটনার পরে চিকিৎসার জন্য বিমাকৃত ব্যক্তি পাবেন ৬০ হাজার টাকা।

চ) দুর্ঘটনাজনিত কারণে ডে কেয়ার বিভাগে চিকিৎসায় ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ছ) হাসপাতালে ভর্তিকালীন অবস্থায় দৈনিক ১০০ টাকা করে (সর্বাধিক ৩০ দিনের) সাহায্য পাওয়া যাবে।

জ) দুর্ঘটনায় বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য ২৫০০ টাকা অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হবে তাঁর পরিবারকে।

ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে আঘাত করা, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দুর্ঘটনা, অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে দুর্ঘটনা ঘটলে এই বিমার আওতায় কোনও সুবিধা পাওয়া যাবে না।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কোনও সদস্য দুর্ঘটনায় আহত হলে তাঁকে নথিভুক্ত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কার্ড যাচাই করে প্যাকেজ রেট অনুযায়ী চিকিৎসার খরচ কার্ড থেকে কেটে নেয়। চিকিৎসার খরচ কার্ডের প্রাপ্য টাকার বেশি হলে তা উপভোক্তা বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিতে হয়। কার্ড হারিয়ে গেলে ৩০ টাকা বিমা সংস্থার জেলা কার্যালয়ে জমা দিলে মেলে নতুন কার্ড। প্রয়োজনে যোগাযোগ করা যায় স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের অধীন স্বরোজগার নিগমের সঙ্গে।

সমব্যথী

পরিবারের অতি আপনজন, নিকটাত্মীয় কিংবা পাড়ায় দীর্ঘদিনের পরিচিত প্রতিবেশীর মৃত্যু ঘটেছে। শোকাতুর পরিবার। পাড়ায়, গ্রামে, মহল্লায় শোকের ছায়া। একই সঙ্গে আরও একটি চিন্তা পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম বা কবর দেওয়ার খরচ কী করে জোগাড় হবে। পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার।

পুরসভা ও পুরনিগম এলাকায় নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তর এবং ব্লক এলাকায় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সমব্যথী প্রকল্পের দ্বারা দুস্থ পরিবারের কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, মৃতদেহের সৎকার, কবরস্থ বা অন্যান্য প্রচলিত রীতিনীতি পালন করার জন্য মৃতের খুব কাছের কোনও আত্মীয়কে এককালীন ২ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে।

অর্থাৎ, দুস্থ মানুষের মৃত্যুতেও সমব্যথী রাজ্য সরকার।

মৃতের পরিবারকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং আর্থিকভাবে দুর্বল বা দুস্থ হতে হবে। মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্য অর্থাৎ দাহ বা কবরের কাজ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে করতে হবে। মৃতের পরিবারের সদস্য বা নিকট প্রতিবেশীকে মৃত্যুর প্রমাণের সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হয়।

পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস আর পৌর এলাকায় পৌরসভার অফিসের মাধ্যমে এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

শ্মশান/কবরস্থানে পরিষ্কার সাদা কাগজে মৃত্যুর প্রমাণপত্র-সহ আবেদন করলে এই অনুদান নগদে পাওয়া যাচ্ছে। নিকটাত্মীয় না থাকলে নিকট প্রতিবেশীও আবেদন করতে পারে।

(ঙ) শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষাশ্রী

অতি দরিদ্র প্রতিটি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। একদিকে খাদ্যের ব্যবস্থা, অন্যদিকে পড়াশোনা। পিছিয়ে-থাকা-পরিবারের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর এবং আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের **শিক্ষাশ্রী** প্রকল্পে। ফলে শিক্ষাশ্রী, আজ রাজ্যের প্রতিটি তপশিলি জাতি ও তপশিলি আদিবাসী পরিবারের কাছে মুক্তির আলো এনে দিয়েছে। সরকারের অর্থে নিজের ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে দাঁড়াবে, সমাজের মূল স্রোতে মিশবে—একজন তপশিলি জাতি বা তপশিলি আদিবাসী বাবা-মায়ের কাছে এটা অনেক বড়ো পাওয়া। আর তাঁদের এই ইচ্ছে পূরণ করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। তপশিলি জাতির ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৭৫০ টাকা হারে ও অষ্টম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৮০০ টাকা হারে এবং তপশিলি আদিবাসীর ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৮০০ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

পরিবারের সারা বছরের আয় ২.৫ লক্ষ টাকা বা তার কম হতে হবে। ছেলে বা মেয়েকে তপশিলি জাতি বা তপশিলি আদিবাসী হতে হবে এবং কোনও সরকারস্বীকৃত স্কুলে পড়াশোনা করতে হবে। আবেদন করতে হবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে। টাকা পাওয়ার জন্য ব্যাংকে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। ওই অ্যাকাউন্ট খোলবার ব্যবস্থাও রাজ্য সরকার করে দিয়েছে।

সাংসদ, বিধায়ক, পুরপিতা, পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদ সদস্য, সভাপতি অথবা সরকারি আধিকারিককে দিয়ে বার্ষিক আয়ের প্রমাণপত্র-সহ আবেদনপত্র বিদ্যালয়ে জমা করতে হবে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রগুলি খতিয়ে দেখে ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক তথ্য একসঙ্গে নিয়ে তা ব্লক/মহকুমা শাসকের অফিসের মাধ্যমে জেলায় প্রকল্প আধিকারিকের কাছে পাঠাবেন অর্থ বরাদ্দ করার জন্য। শিক্ষাশ্রীর অর্থ সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়।

ঐক্যশ্রী

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা যাতে যথাযথভাবে শিক্ষার সুযোগ পায় এবং তাদের সামনে আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার নতুন নতুন পথ খুলে যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার জন্য বদ্ধ পরিকর। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ থেকেই তাদের পাশে দাঁড়াতে শুরু হয়েছে নতুন প্রকল্প ঐক্যশ্রী। তিন ধরনের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে।

(১) প্রথম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য, (২) একাদশ থেকে পিএইচডি স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং, (৩) বৃত্তিমূলক ও চাকরিমুখী শিক্ষার জন্য মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ।

এর মাধ্যমে একেবারে শিশুশিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা স্তরে এবং শেষে সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েদের উপার্জনমুখী করে তোলার প্রয়াস রয়েছে রাজ্য সরকারের।

আবেদনকারীদের পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে এবং রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ওই রাজ্যের কোনও প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে হবে। পরিবারের বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকার কম হওয়া চাই।

মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপের জন্য পরিবারের বার্ষিক আয় ২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে। আবেদনকারীদের এই রাজ্যের বাসিন্দা হতে হবে। তবে তারা এই রাজ্যের বাইরের কোনও তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করলেও এই স্কলারশিপ পেতে পারবেন।

ছাত্রছাত্রীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি বৃত্তির টাকা পৌঁছে যাবে।

কন্যাশ্রী

কন্যাশ্রী একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প। নারীশিক্ষার উন্নয়নে নতুন দিশা কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা হয় মূলত কন্যা সন্তানদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং উচ্চশিক্ষায় ধরে রাখাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়নে অনেকগুলি যুগান্তকারী প্রকল্প চালু করেছেন। তাঁর স্বপ্নের প্রকল্পগুলির মধ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পটি অন্যতম। এই প্রকল্পের নামকরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। লোগোটিও তিনিই ডিজাইন করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের এই প্রকল্প চালু হয় ২০১৩ সালের ১ অক্টোবর তারিখে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র কন্যাশিশুদের শিক্ষায় উৎসাহিত করা হয়। 'কন্যাশ্রী' ভাতাপ্রাপ্ত ছাত্রীরা একটি নিজস্ব পরিচয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-এ টাকা সরাসরি জমা হয়।

১৮ বছর পর্যন্ত মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক গঠন চলতে থাকে। ভবিষ্যতে যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে তাই তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে এই সময়ই উপযুক্ত। 'কন্যাশ্রী'-র মেয়েদের নানা প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের তৈরি পণ্য বিক্রিরও ব্যবস্থা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্রীড়া ও আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা জুড়ে। 'কন্যাশ্রী ফুটবল প্রতিযোগিতা'-ও আয়োজিত হচ্ছে। তাদের

স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার এবং জীবনের সমস্যাগুলোকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য কন্যাশ্রী ক্লাব, কন্যাশ্রী সংঘ ও কন্যাশ্রী যোদ্ধা গড়ে তোলা হচ্ছে।

এই প্রকল্প কন্যাশিশুর জীবনকে আলাদা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে তাদের। কন্যাশ্রী-র মেয়েরাই গ্রামে গ্রামে সঠিক বয়সে বিয়ে দেওয়ার কথা বলতে, স্কুল-ছুট মেয়েদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে, মেয়েদের পড়াশোনা করানোর সুফল অভিভাবকদের বোঝাতে এবং আলাপ-আলোচনা ও নাটকের মাধ্যমে জনমত তৈরি করতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে।

এর ফলে নারী শিক্ষার হার ও সঠিক বয়সে বিয়ের হার দুটিই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কমছে লিঙ্গ-বৈষম্যও। নারীরা স্ব-নির্ভরতার পথে এগোচ্ছে। সার্বিক উন্নয়নে এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ কন্যাশ্রী প্রকল্পকে বিশ্বসেরা প্রকল্পের শিরোপা দিয়েছে ইতিমধ্যেই। বিশ্বের ৫৫২টি প্রকল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রকল্প হিসেবে রাষ্ট্রপুঞ্জের '২০১৭ জন পরিষেবা পুরস্কার' অর্জন করেছে এই প্রকল্প। ২৩ জুন, ২০১৭ তারিখে রাষ্ট্রপুঞ্জের জন পরিষেবা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডস–এর হেগ শহরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

সরকার স্বীকৃত নিয়মিত বা সমতুল মুক্ত বিদ্যালয়ে বা সমতুল বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠরতা কেবলমাত্র অবিবাহিতা মেয়েরাই আবেদন করতে পারবে। বার্ষিক ভাতার জন্য K-1 ফর্মে এবং এককালীন অনুদানের জন্য K-2 ফর্মে আবেদন করতে হবে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরতা মেয়েদের জন্য K3 শুরু হয়েছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে কন্যাশ্রী প্রকল্পের K_3-র কাজ পরে শুরু হয়। কন্যাশ্রী প্রকল্পের বৃত্তিপ্রাপকেরা বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে/কমার্সে পড়াশোনার জন্য মাসে যথাক্রমে ২৫০০ ও ২০০০ টাকা করে অনুদান পায়।

আবেদনকারীর পারিবারিক বার্ষিক আয়ের নির্দিষ্ট সীমা তুলে দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারীকে যে কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে এই প্রকল্পের জন্য একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। বার্ষিক ১,০০০ টাকা হারে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বয়স হতে হবে ১৩ থেকে ১৮ বছর। এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হচ্ছে বিদ্যালয়, কলেজ বা বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠরতা অবিবাহিতা মেয়েদের, আবেদন করার সময় যাঁদের বয়স ১৮ বছরের বেশি এবং ১৯ বছরের কম। K-3-র জন্য এই বয়ঃসীমা প্রযোজ্য নয়।

বিদ্যালয় বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

সবুজসাথী

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের **সবুজসাথী** ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল বিতরণের একটি প্রকল্প। ২০১৫–১৬ অর্থবর্ষের বাজেট বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, রাজ্যের সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হয়। এই প্রকল্পই এখন 'সবুজসাথী' নামে পরিচিত। নামকরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং।

ছাত্রছাত্রীরা যেন ভবিষ্যতে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা অর্জন করতে পারে সেই উচ্চাশা নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বপ্নের প্রকল্প। প্রকল্পের লোগোটিও তিনিই এঁকেছেন। সাইকেলের সামনের ঝুড়ির সঙ্গে লোগোটি সংযুক্ত করা হয়েছে। ২০১৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম মেদিনীপুরের এক অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাইকেল বিতরণ শুরু করেন।

ছাত্রছাত্রীদের, প্রধানত ছাত্রীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুল-ছুট (Drop outs)-এর হার কমানোই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর এই প্রকল্প রূপায়ণের মূল দপ্তর। এই দপ্তরের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন দপ্তরের বরিষ্ঠ সচিব ও আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটি এই প্রকল্পের সাইকেল সংগ্রহ এবং বিতরণের বিষয়টি নজরদারি এবং পরিচালনা করে।

জেলাস্তরে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নোডাল আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এসডিও, বিডিও এবং পৌরসভার এক্সিকিউটিভ আধিকারিকেরা নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক এই প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল— বিশাল সংখ্যক সাইকেল সংগ্রহ করা। এই উদ্দেশ্যে আন্তর্বিভাগীয় টেন্ডার কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রকল্প রূপায়ণের কাজ ই-গভর্ন্যান্স-এর মাধ্যমে হচ্ছে। এই প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে সুচারুভাবে তথ্য জানার জন্য এবং এই বিশাল প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দিতে NIC-র সহযোগিতায় একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে— http://www.wbsaboojsathi.gov.in রাজ্যের সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী। বিদ্যালয়ের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

সবলা

কিশোরীদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জীবনশৈলী ও কর্মসংস্থানগত উন্নতি ঘটিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা হচ্ছে নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের **সবলা** প্রকল্পের মাধ্যমে। পরিপূরক পুষ্টির ব্যবস্থা করা হচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি খাবার অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের মাধ্যমে কিশোরীদের সরবরাহ করে। এইভাবে অপুষ্টি দূর করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কৈশোর-জনিত প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য, পরিবার ও শিশুর সুরক্ষা এবং যত্নের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে কিশোরীদের মধ্যে। রাজ্যের ৭টি জেলায় 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় তৈরি করে এই প্রকল্প চলছে।

গৃহকর্মে ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়-বহির্ভূত কিশোরীদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করার কাজ চলছে এই প্রকল্পে। তাদের 'কিশোরী কার্ড' নামে একটি কার্ড দেওয়া হচ্ছে যেখানে তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকবে।

(চ) আর্থিক সহায়তা

যুবশ্রী

শ্রম দপ্তরের **'যুবশ্রী'** প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের শ্রম দপ্তরের অধীন এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক-এ নথিবদ্ধ অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী যুবক-যুবতীরা মাসে ১৫০০ টাকা হারে ভাতা পান।

২০১৩ সালের ৩ অক্টোবর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুবশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেন।

নথিভুক্ত যুবক-যুবতীরা যাতে নানা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে পারেন বা তাঁদের শিক্ষা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীন ভাতা-প্রাপকদের প্রতি ৬ মাস অন্তর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য এবং তিনি এখনও প্রকল্পের সমস্ত যোগ্যতাবলির অধিকারী কিনা সেই সংক্রান্ত একটি স্ব-ঘোষণা জমা করতে হয়। এই প্রকল্পের সহায়তা নিয়ে যাঁরা চাকরি পাবেন বা স্বনির্ভর হবেন তাঁরা আর এই আর্থিক সহায়তা পাবেন না। পরিবর্তে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা পর্যায়ক্রমিকভাবে এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

'চাকরিপ্রার্থী' হিসেবে রাজ্যের শ্রম দপ্তরের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক-এ নাম নথিভুক্ত করানো এই রাজ্যে বসবাসকারী বেকার যুবক-যুবতীরা এই সুযোগ পাবেন। ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে হবে। এর বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতাও থাকতে পারে। যে বছর প্রার্থী এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন সেই বছরের ১ এপ্রিল তাঁর বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের (স্পনসর্ড) কোনও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের অধীন কোনও আর্থিক সহায়তা বা ঋণ গ্রহণ করেননি এমন যুবক-যুবতীরাই আবেদন করতে পারবেন। পরিবারে মাত্র একজন সদস্যই এই প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তার সুবিধা পেতে পারেন।

মানবিক

নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের **মানবিক** প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবন্ধী বা বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ যাঁদের প্রতিবন্ধকতা ৫০% অথবা অধিক, তাঁদের এই পেনশন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা। মানবিক প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তা প্রতি মাসে ১,০০০(এক হাজার) টাকা করে ভাতা পাবেন।

প্রতিবন্ধী বা বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ এই পেনশন প্রকল্পের আওতায় আসবেন যদি নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করেন—

(১) আবেদনকারীর প্রতিবন্ধকতা ৫০% বা তার অধিক হতে হবে।

(২) আবেদনকারীর পারিবারিক আয় বার্ষিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার কম হতে হবে।

(৩) আবেদনকারীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং কমপক্ষে দশ বছর পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করতে হবে (পেনশনের আবেদনের তারিখ ভিত্তি ধরে)

(৪) আবেদনকারীর বয়স দশ বছরের কম হলে বসবাসের সময় নির্ধারিত হবে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ এবং আবেদনের তারিখের ব্যবধান সময়ানুযায়ী।

(৫) আবেদনকারী রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকার অথবা অন্য কোনও সূত্র থেকে

বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, কৃষি ভাতা, পারিবারিক পেনশন প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তা পেলে, মানবিক প্রকল্পের আওতায় ভাতা পাবেন না।

রূপশ্রী

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী যে সব দরিদ্র পরিবার বিবাহযোগ্যা কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক খরচ বহন করতে পারে না অথবা অসুবিধার সম্মুখীন হয়, সেই সব দুঃস্থ পরিবারকে নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের **রূপশ্রী** প্রকল্পের মাধ্যমে এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুদান রূপে দেওয়া হয়।

এই প্রকল্প সারা রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ১ এপ্রিল, ২০১৮ থেকে শুরু হয়েছে। এই তারিখে অথবা তার পরে অনুষ্ঠিত সব বিবাহের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প প্রযোজ্য।
আবেদনকারীর বয়স অন্তত ১৮ বছর হতে হবে।
আবেদনকারীকে অবিবাহিত হতে হবে এবং একমাত্র প্রথম বিবাহের জন্য এই সুবিধা পাওয়া যায়।
এই রাজ্যেই জন্ম হয়েছে এমন হতে হবে অথবা মাতা-পিতা বিগত ৫ বছর যাবৎ এই রাজ্যে স্থায়ী বসবাসকারী এমন হতে হয়।
পরিবারের বার্ষিক আয় অনধিক ১,৫০,০০০/- টাকা হতে হয়।
পাত্রের বয়স অন্তত ২১ বছর হতে হয়।

যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে শুধুমাত্র আবেদনকারীর নামে সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকতে হয়।

আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে উপযুক্ত প্রমাণপত্র-সহ স্থানীয় বিডিও অফিসে বা মিউনিসিপ্যালিটিতে জমা দিতে হয়। মেয়ের অবিবাহিত থাকার প্রমাণপত্র বা স্ব-ঘোষণাপত্র অভিভাবক বা পরিবারের বার্ষিক আয়, বয়সের প্রমাণপত্র, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট ইত্যাদি প্রমাণপত্র জমা করতে হয়।

লোকপ্রসার

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্দেশ্য হল **লোকপ্রসার** প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বর্ণময় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন লোক-আঙ্গিকের বা ধারার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন, বিকাশ এবং সমৃদ্ধির পাশাপাশি লোকশিল্পীদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানো, তাঁদের যথাযথ মর্যাদাদান এবং আর্থিক সহায়তা করা। এ ছাড়া, লোকসংস্কৃতির শক্তিশালী মাধ্যমটিকে জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রচারে ব্যবহার করাও এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বিভিন্ন ধারার শিল্প ও শিল্পীকে সম্মান ও মর্যাদাদানের মধ্য দিয়ে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ঘটানো হয়েছে মূলধারার সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে লোকশিল্পীদের শিল্পী-পরিচয়পত্র প্রদান করা, শিল্পীদের বহাল ভাতার ব্যবস্থা করা ও উন্নয়নমূলক সরকারি প্রকল্পের প্রচারের কাজে লাগানো হচ্ছে। দুস্থ ও বয়স্ক লোকশিল্পীদের মাসিক পেনশনেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৬০ বছরের বেশি বয়সের লোকশিল্পীরা প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন। ৬০ বছরের কম বয়সের লোকশিল্পীরা সরকারের নানা প্রচারের কাজে অংশ নিচ্ছেন এবং সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁদের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পাচ্ছেন। মাসে ১০০০ টাকা করে বহাল ভাতা পাচ্ছেন তাঁরা। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী, খাদ্যসাথী, সবুজশ্রী, সবুজসাথী, সমব্যথী ইত্যাদি প্রকল্পগুলির প্রচারে বিশ্বখ্যাত লোকশিল্পীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করছেন এবং সরকারি প্রচারে অংশ নিয়ে তাঁরা অনুষ্ঠান-পিছু ১ হাজার টাকা সম্মানদক্ষিণা পাচ্ছেন।

পেনশন ও বহাল ভাতার টাকা শিল্পীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা পড়ে যায়। সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোকে সফল করে তুলতে লোকশিল্পীরা তাঁদের আকর্ষণীয়, বর্ণময়, সহজবোধ্য আঙ্গিক ব্যবহার করছেন। সাধারণ মানুষের কাছে এইভাবে তাঁরা প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের তথ্য ছড়িয়ে দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই লোকপ্রসার প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও ঐতিহ্যের বিকাশের কাজকে অপ্রতিহত করে তুলেছেন। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই আজ নিজেদের হারানো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব 'বোর্ড' গঠনের মাধ্যমে এই কাজ আরও গতি পাচ্ছে। লুপ্তপ্রায় লোক-সংস্কৃতির নানা ধারা পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পদের গুণমান ও পরিমাণ—দুটোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারাকে বাঁচিয়ে রাখা ও উন্নত করার প্রয়াস নিচ্ছেন। তাঁদের কাছেও শিল্পীর পরিচয়পত্র এবং বহাল ভাতা দুটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

বন্ধু

বাংলার তপশিলি জাতির বয়স্ক মানুষদের কল্যাণের জন্য 'বন্ধু' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়।

এই প্রকল্পে ৬০ বছরের বেশি বয়সের তপশিলি জাতির মানুষ, যাঁরা অন্য কোনও পেনশন পান না, এরকম ১০০ শতাংশ মানুষকেই প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে। এর ফলে, আনুমানিক ২১ লক্ষ তপশিলি জাতির মানুষ উপকৃত হবেন।

জয় জহার

রাজ্যের আদিবাসী সমাজের বয়স্ক মানুষদের কল্যাণে 'জয় জহার' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়, যেখানে ৬০ বছরের বেশি বয়সের আদিবাসী ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ১০০ শতাংশ মানুষ, যারা অন্য কোনও পেনশন পান না, তাদের প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে।

এই পরিকল্পনার মাধ্যমে আনুমানিক ৪ লক্ষ আদিবাসী ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ উপকৃত হবেন। এইজন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদের প্রস্তাব করা হয়।

স্নেহের পরশ এককালীন আর্থিক সহায়তা ও প্রচেষ্টা

'স্নেহের পরশ' নামে একটি প্রকল্পের ঘোষণা করেন তিনি। সেই প্রকল্পের আওতায় ভিনরাজ্যে আটকে থাকা বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করে রাজ্য। এককালীন ১,০০০ টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়।

যাঁরা সামাজিক সুরক্ষা যোজনার সুযোগ-সুবিধা বা সামাজিক পেনশন পান না, সেই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য প্রচেষ্টা প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। এর মাধ্যমে মাথাপিছু এককালীন এক হাজার টাকা পাবেন ওইসব শ্রমিক।

সমর্থন

২০১৬ সালের নভেম্বরে নোটবন্দিকরণের ফলে কাজ হারিয়ে রাজ্যে ফিরে আসা শ্রমিকদের সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রম দপ্তরের সমর্থন প্রকল্প চালু করা হয়।

কাজ হারানো এইসব শ্রমিকদের এই প্রকল্পে এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। এই টাকা নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে তাঁরা যাতে আবার নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারেন সেই লক্ষ্যেই এই প্রকল্প। রাজ্যের বেকার সমস্যার উপর 'নোটবন্দি'-র ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত বোঝার মোকাবিলায় সময়োপযোগী এই প্রকল্প অতি দ্রুততার সঙ্গে চালু করা হয়।

প্রাথমিকভাবে কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান (পূর্বতন), নদিয়া, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর এই দশটি জেলায় সমর্থন প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত ১০টি জেলার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা ব্লক অফিসে যোগাযোগ করা হয়।

সাংবাদিকদের অবসরকালীন ভাতা

সাংবাদিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাকুরিক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের পর আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পড়েন। বয়স্ক সাংবাদিকদের এই অর্থনৈতিক সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করাই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের **সাংবাদিকদের অবসরকালীন ভাতা** (ওয়েস্ট বেঙ্গল পেনশন স্কিম ফর জার্নালিস্টস, ২০১৮)প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে এই পেনশন প্রকল্পের সূচনা করেন। দুস্থ, বয়স্ক সাংবাদিকরা জীবিতাবস্থায় এর মাধ্যমে মাসিক ২৫০০ টাকা করে পেনশন পান।

যে সব সাংবাদিকের ষাট বছর বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে এবং যাঁদের চাকরি থেকে অবসরের পর মাসিক রোজগার দশ হাজার টাকার কম এবং দশ বছরের বেশি সময় ধরে যাঁদের প্রেসকার্ড আছে, তাঁরাই এই পেনশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

বিগত দশ বছরে রাজ্য সরকারের নানা কর্মকাণ্ড জনগণের মধ্যে একটি আস্থার বাতাবরণ তৈরি করেছে। তার ফলেই আস্থার জয়ে তৃতীয়বার সরকার গঠন।

(ছ) ক্রীড়া

খেলাশ্রী

যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের **খেলাশ্রী** প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল রাজ্যে খেলাধূলার মানোন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিটি স্তরে ও প্রান্তিক অঞ্চলেও খেলাধূলার বিকাশ ঘটানো। এটি একটি বহুমুখী প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় ক্রীড়া উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলিকে একত্রে নিয়ে আসা হচ্ছে।

মূলত পাঁচটি কর্মসূচিকে এই প্রকল্পে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নবীন ক্রীড়া-প্রতিভার বিকাশের জন্য রাজ্য জুড়ে উন্নতমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াসের কাজকে আরও গতিশীল করার জন্য ক্রীড়া-সংশ্লিষ্ট ক্লাবকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। এছাড়া রাজ্যস্তরের বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনকে আর্থিক সহায়তা, বাংলার বিখ্যাত ও সফল ক্রীড়াব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া-প্রতিভাকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা, বিভিন্ন স্তরে ফুটবল বিতরণের মাধ্যমে বাংলার জনপ্রিয় খেলা ফুটবল-এর চর্চাকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন ক্রীড়ার ক্ষেত্রে স্থায়ী প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিকে বছরে টাকা প্রদান করা হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়নে খেলাধূলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়ে বর্তমান সরকার রাজ্যে ক্রীড়া-উন্নয়নে প্রথম থেকেই উদ্যোগ নিয়েছে। বড়ো বড়ো ক্লাবের পাশাপাশি মাঝারি ও ছোটো ক্লাবেও খেলাধূলা এবং শরীরচর্চার পরিবেশ ও উন্নত-আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা, ক্রীড়া শিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেছে। ২০১১-১২ আর্থিক বছর থেকে চালু হওয়া এক কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন, খেলাধূলার প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জাম ক্রয় বা কক্ষ নির্মাণ-সহ নানা কাজের জন্য প্রথম বছর ২ লক্ষ টাকা এবং পরের ৩ বছর ১ লক্ষ টাকা হারে আর্থিক অনুদান প্রদান করছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে এই কর্মসূচি খেলাশ্রী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

সম্প্রতি ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিকে বছরে ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার ক্ষেত্রে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলেও আগ্রহী ছেলেমেয়েদের কাছে প্রশিক্ষণের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অতীত ও বর্তমানের বিখ্যাত ও সফল ক্রীড়াবিদদের সম্মাননা জ্ঞাপন এবং পুরস্কৃত করা হয়। উদীয়মান ক্রীড়া-প্রতিভাকে খেল সম্মান পুরস্কার, বিগত বছরের ক্রীড়াসাফল্যের জন্য বাংলার গৌরব সম্মান, সারা জীবনের কৃতিত্বের জন্য জীবনকৃতি সম্মান (লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট) এবং সফল প্রশিক্ষণের জন্য ক্রীড়াগুরু সম্মান দেওয়া হয়। এছাড়াও বিশেষ কৃতিত্বের জন্যও সম্মানিত করা হয় ক্রীড়াবিদদের। জেলা, মহকুমা ও ব্লকস্তরে শিবির করে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ক্লাব ও সংগঠনকে ফুটবল বিতরণ করা হয়।

ফটোফিচার

তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রীর শপথ

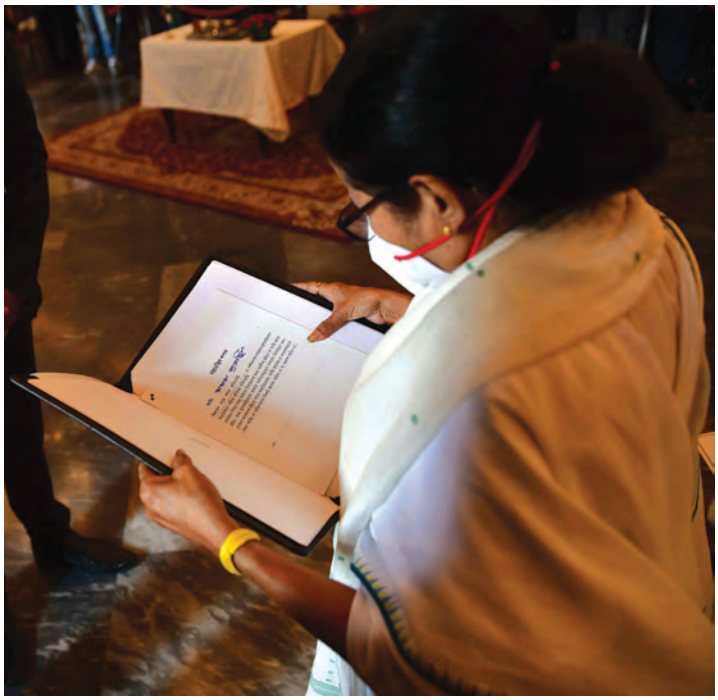

সম্পূর্ণ কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তৃতীয়বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫ মে ২০২১। ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তের সাক্ষী থাকল রাজধানী কলকাতা থেকে বিশ্বের প্রতিটি কোণের মানুষ।

শপথ ও সাক্ষাতের পর মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, *বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করে রাজভবনে তৃতীয়বারের জন্য শপথগ্রহণ করলাম। বাংলার প্রতিটি মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। আগামীদিনেও বাংলার ঐক্য-ভ্রাতৃত্ব, শান্তি-সম্প্রীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। মাতৃভূমির সঙ্গে আমাদের নাড়ির বন্ধন অচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে আবদ্ধ, বাংলার মানুষের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক। তাই সবার আশীর্বাদকে পাথেয় করে বাংলার উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে এবং বাংলার মানুষকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে আমি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করব।*

এদিন শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শপথ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন চলে আসেন নবান্নে। সেখানে 'গার্ড অব অনার' অভিবাদন গ্রহণের পর কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করাই নতুন সরকারের প্রথম কাজ।

গার্ড অব অনার শেষে নবান্নে তৃতীয়বারের জন্য আবার মুখ্যমন্ত্রীর আসনে মমতা ব্যানার্জ্জী।

ছবি- অশোক মজুমদার

রাজ্য মন্ত্রিসভার তালিকা

(১১মে, ২০২১)

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী	
বিভাগ	**নাম**
স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক	মমতা ব্যানার্জী
কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং ই-গভর্নেন্স	মমতা ব্যানার্জী
তথ্য ও সংস্কৃতি	মমতা ব্যানার্জী
ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন	মমতা ব্যানার্জী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	মমতা ব্যানার্জী
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন	মমতা ব্যানার্জী
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন	সুব্রত মুখোপাধ্যায়
রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন	সুব্রত মুখোপাধ্যায়
শিল্প ও বাণিজ্য	পার্থ চট্টোপাধ্যায়
তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স	পার্থ চট্টোপাধ্যায়
পরিষদ বিষয়ক	পার্থ চট্টোপাধ্যায়
অর্থ	অমিত মিত্র
পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ	অমিত মিত্র
উপভোক্তা বিষয়ক	সাধন পাণ্ডে
স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্ব-নিযুক্তি	সাধন পাণ্ডে
বন	জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক
অচিরাচরিত শক্তি উৎস	জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক
সুন্দরবন বিষয়ক	বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা
জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন	মানসরঞ্জন ভূঞ্যা
সেচ ও জলপথ	সৌমেন কুমার মহাপাত্র
আইন	মলয় ঘটক
বিচার	মলয় ঘটক
পূর্ত	মলয় ঘটক
বিদ্যুৎ	অরূপ বিশ্বাস
যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া	অরূপ বিশ্বাস
সংশোধন ও প্রশাসন	উজ্জ্বল বিশ্বাস
সমবায়	অরূপ রায়
খাদ্য ও সরবরাহ	রথীন ঘোষ
পরিবহণ	ফিরহাদ হাকিম
আবাসন	ফিরহাদ হাকিম
ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি এবং বস্ত্র শিল্প	চন্দ্রনাথ সিনহা
কৃষি	শোভনদেব চ্যাটার্জি
বিদ্যালয় শিক্ষা	ব্রাত্য বসু

উচ্চ শিক্ষা	ব্রাত্য বসু
জনস্বাস্থ্য কারিগরি	পুলক রায়
নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ	শশী পাঁজা
সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	মহঃ গোলাম রাব্বানি
কৃষি বিপণন	বিপ্লব মিত্র
বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা	জাভেদ আহমেদ খান
প্রাণী সম্পদ বিকাশ	স্বপন দেবনাথ
জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা	সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী

রাষ্ট্রমন্ত্রী

বিভাগ	নাম
শ্রম (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)	বেচারাম মান্না
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)	সুব্রত সাহা
কারিগরি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)	হুমায়ুন কবীর
মৎস্য (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)	অখিল গিরি
নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)	চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
পরিবেশ (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)	রত্না দে নাগ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)	রত্না দে নাগ
পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)	সন্ধ্যারানী টুডু
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)	বুলুচিক বরাইক
আদিবাসী উন্নয়ন (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)	বুলুচিক বরাইক
অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)	সুজিত বসু
পর্যটন (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)	ইন্দ্রনীল সেন
পরিষদ বিষয়ক	সন্ধ্যারানী টুডু
তথ্য ও সংস্কৃতি	ইন্দ্রনীল সেন
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন	চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
পরিবহণ	দিলীপ মণ্ডল
বিদ্যুৎ	আখিরুজ্জামান
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন	শিউলি সাহা
ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি এবং বস্ত্র শিল্প	শ্রীকান্ত মাহাতো
সেচ ও জলপথ	ইয়াসমিন সাবিনা
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন	ইয়াসমিন সাবিনা
বন	বীরবাহা হাঁসদা
খাদ্য ও সরবরাহ	জ্যোৎস্না মান্ডি
বিদ্যালয় শিক্ষা	পরেশ চন্দ্র অধিকারী
যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া	মনোজ তিওয়ারি

উন্নয়নের অভিমুখ

‘দুয়ারে সরকার’-এর প্রশংসায় অমর্ত্য সেনের প্রতীচী ট্রাস্ট

মুখ্যমন্ত্রীর ‘দুয়ারে সরকার’ ও ‘পাড়ায়-সমাধান’ বিশ্ব দরবারেও প্রশংসা লাভ করেছিল আগেই। এবার প্রশংসা পেল অমর্ত্য সেন-এর প্রতীচী ট্রাস্টের। ‘দুয়ারে সরকার’ এবং ‘পাড়ায় সমাধান’ এই দুটি কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরে পৌঁছে গেল। ইতিমধ্যেই এই কর্মসূচি শুধু ভারত নয় সারা বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহৎ জন পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি হিসাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, ইউনিসেফ এর উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিগণ এক ওয়েবনারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁদের কথাবার্তায় বেরিয়ে আসে এই প্রকল্পগুলির সদর্থক দিকটি। শুধু তাই-ই নয়, এই সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে তৃণমূলস্তরে নিয়ে যাওয়ার সরকারি প্রচেষ্টারও প্রভূত প্রশংসা করেন এইসব সংস্থার মুখপাত্ররা। তাঁরা প্রত্যেকেই এই অভিনব সরকারি কর্মসূচিকে এক অনবদ্য প্রয়াস বলে অভিহিত করেন। অতিমারির অবসানে এঁরা প্রত্যেকেই এই রাজ্যে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন যাতে এইরকম এক কর্মসূচির প্রয়োগ ও তার উপযোগিতাগুলি তাঁরা স্বচক্ষে দেখতে পারেন।

এই বিশাল কর্মসূচির দুটি ভাগ আছে, (১) ‘দুয়ারে সরকার’ এবং ‘পাড়ায় সমাধান’। ‘দুয়ারে সরকার’ মূলত সারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম বাংলার দুয়ারে পৌঁছবার প্রয়াস। এই কাজে তৃণমূল স্তরের পঞ্চায়েত, বিডিও অফিসগুলিকে নিয়ে সরকারের ১২টি মূল সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প রূপায়ণের ফাঁকগুলিকে বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। এবং যারা বিভিন্ন কারণে এই প্রকল্পগুলির সুবিধা এখনও সঠিকভাবে পাননি, তাঁদের দোরগোড়ায় গিয়ে এই সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

দুয়ারে সরকার

১ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্প পাঁচ পর্যায়ের পরে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১-তে শেষ হয়েছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই সরকারি প্রচেষ্টা এক অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে দিয়েছে। রাজ্যের কয়েক কোটি মানুষের কাছে এই প্রকল্প পৌঁছে গেছে যার জন্য এই উদ্যোগকে, বিশ্বের এক অনবদ্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদান প্রচেষ্টা হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। পাঁচ দফা কর্মসূচির পর দেখা গেছে এক রেকর্ড সৃষ্টিকারী কয়েক কোটি লোক এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচির মাধ্যমে ১২টি মূল সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পকে রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে যে সব নাগরিক এইসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, এই প্রকল্পগুলির আওতায় আসতে পারেননি, তাঁদেরকে এই সুরক্ষা বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ‘দুয়ারে সরকার’ এ যে ১২টি মূল প্রকল্প আছে এক নজরে সেগুলির নাম উল্লেখ করা হল।

দুয়ারে সরকারের প্রকল্পগুলির নাম

১) খাদ্যসাথী, ২) স্বাস্থ্যসাথী, ৩) জাতিগত শংসাপত্র, ৪) শিক্ষাশ্রী, ৫) জয় জহর, ৬) তপশিলি বন্ধু, ৭) কন্যাশ্রী, ৮) রূপশ্রী, ৯) ঐক্যশ্রী, ১০) ১০০ দিনের কাজ, ১১) কৃষক বন্ধু, ১২) মানবিক।

দুয়ারে সরকার পরিষেবার জন্য প্রায় ৩৩ হাজার ক্যাম্প বসানো হয়। যেখানে ২ কোটি ৭৫ লাখের বেশি লোক এইসব ক্যাম্প থেকে পরিষেবা নিতে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী পাখির চোখের মতো নজরে রেখেছেন প্রতিটি

পরিষেবা পশ্চিমবঙ্গের শেষ জনপদ অবধি যাতে পৌঁছতে পারে তার প্রতি।

পাড়ায় সমাধান

'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচি যা কিনা সমান্তরালভাবে চলেছে। এটি মূলত গঠিত হয়েছে শহরবাসীকে বিবিধ পরিষেবা দেওয়ার জন্য। শহরাঞ্চলের মানুষকে পুরসভা বা সিভিক বডিগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবারের চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনার মাধ্যমে সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসার, কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের যুক্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন কারিগরি দক্ষতার দিক (technological inputs)—যেমন আইটি সিস্টেম, জিপিএস সিস্টেম ইত্যাদি এগুলোর মাধ্যমে এক সফল এবং দ্রুত সাহায্য প্রদান ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে টাস্ক ফোর্স তৈরি করে এর সময়ভিত্তিক প্রয়োগ ও পরিষেবা প্রদানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে এই প্রকল্পগুলির ব্যয় বৃদ্ধি লক্ষণীয়। ২০০৯-১০ সালে সামাজিক সুরক্ষা খাতে তদানীন্তন সরকার ১১,৮৭৫ কোটি টাকা খরচ করে। বর্তমান সরকার ২০১৯-২০ সালে বাজেটে বরাদ্দ বাড়িয়ে সেটি নিয়ে যায় ৬৩,৮৯৬ কোটিতে। পূর্বতন সরকার থেকে এটি ৪৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর থেকেই এই প্রকল্পের গুরুত্ব কত তা বোঝা যায়।

এই কর্মসূচির পিছনে যে চালিকা শক্তি কাজ করেছে তা হল এই সরকারের মানুষের কাছে পৌঁছাবার এক পর্বতপ্রমাণ অঙ্গীকার। সরকারি প্রকল্প শুধুই কাগজে-কলমে বন্দি থাকবে, তা রূপায়ণ করতে লাগে এক দীর্ঘসূত্রিতা—এই অপবাদ ঘোচাতে পেরেছে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক সুকঠিন প্রশাসন। 'পাড়ায় সমাধান' নামক এক নতুন নীতি প্রচলন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন, এই কাজগুলির সার্থক রূপায়ণই সমাজে প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারবে। সেই ভাবনা থেকেই এই

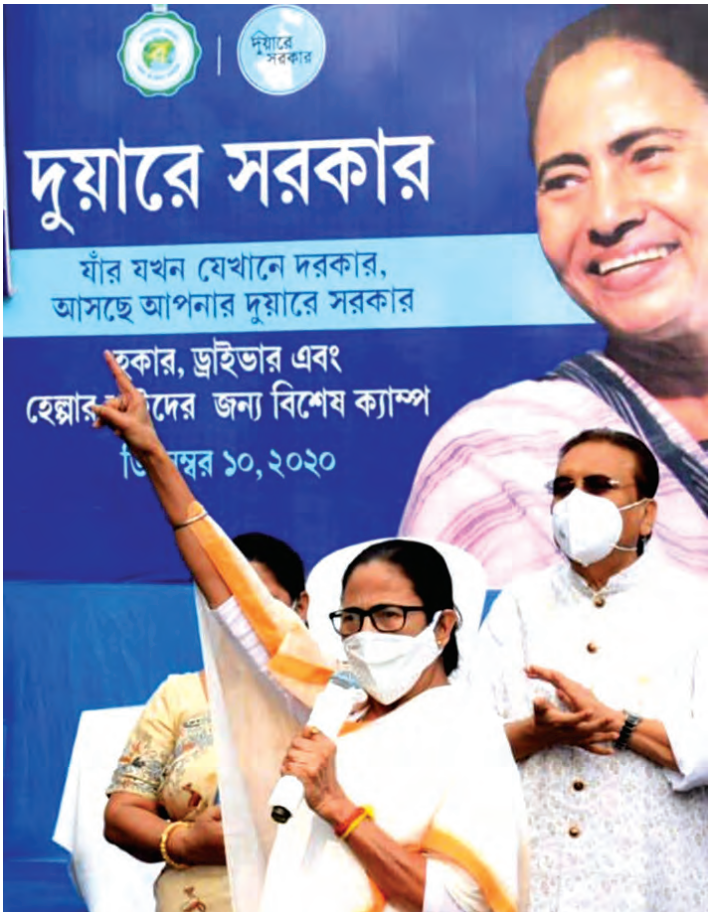

কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ কারণেই এই কর্মসূচিটি এত দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

পাড়ায় সমাধানের প্রকল্পগুলির নাম

১) পরিষ্কার—পরিচ্ছন্নতা, ২) পানীয় জল, ৩) বিদ্যুৎ ও রাস্তার আলো, ৪) রাস্তা, ৫) নিকাশি ব্যবস্থা, ৬) চিকিৎসক

এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ অবতারণা করার প্রয়োজন। ২০১৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় West Bengal Right to Public Services Act 2013 আইনটি প্রচলন করেন। এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকারের সব প্রকল্পই যাতে জনগণ পরিষেবা রূপে পেতে পারে তার রূপায়ণ করা। 'দুয়ারে সরকার' ও 'পাড়ায় সমাধান' এই দুটি কর্মসূচিই ওই দায়বদ্ধতার ফসল।

করোনার তৃতীয় ঢেউ ঠেকাতে
শপথ নিয়েই রাশ ধরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী

২০২০-র এপ্রিল থেকে করোনা ভাইরাসের আগ্রাসন যত বেড়েছে, ততই সতর্কতা বেড়েছে রাজ্যের প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। সামলানো গিয়েছে প্রথম ঢেউ। অতিমারির নিয়মেই এসেছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। নির্বাচনী বিধি থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী চেষ্টা করেছেন, যতটা সম্ভব মানুষকে উন্নত স্বাস্থ্য-পরিকাঠামো এবং সামাজিক সুযোগসুবিধে দেওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, সম্ভবত এরপর আসতে চলেছে তৃতীয় ঢেউ, যা অবশ্যম্ভাবী। তাই রাজভবনে তৃতীয়বার শপথ নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন করোনার সাম্প্রতিক দ্বিতীয় ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার তৃতীয় ঢেউ এবং রাজ্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে। অন্যদিকে, দ্রুত মৃত্যুহার কমিয়ে আনতেও বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই সমস্ত কিছু নিয়েই এবারের প্রতিবেদন।

৪ মে, ২০২১

কোভিড চিকিৎসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ২টি ওষুধ/ইনজেকশন রেমডিসিভির এবং টসিলিজুমার কোনও ব্যক্তিকে বাজার থেকে কিনতে হবে না। সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের সিসিইউ শয্যা ও সেখানে কতজন রোগী ভর্তি রয়েছেন, সেই অনুপাতে কিনতে পারবে বা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নিতে পারবে।

৬ মে, ২০২১

এদিন থেকে রাজ্যে লোকাল ট্রেন বন্ধ, আপাতত ১৫ দিনের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিয়েই প্রথমে রাজ্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সচিব স্তরে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। তিনি জানান, প্রচুর ভিড়-সহ ট্রেন চললে করোনা আরও দ্রুত ছড়াবে। পাশাপাশি সরকারি পরিবহণ এবং মেট্রো ৫০ শতাংশ কম চলবে। ৭ মে থেকে দেশের যে কোন রাজ্য থেকে ট্রেন, বিমান বা বাসে ও রাজ্যে এলেই ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আরটি-পিসিআর টেস্ট করিয়ে নেগেটিভ রিপোর্ট নিয়ে আসতে হবে। কেউ জরুরি কারণে চলে এলেও রাজ্যে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হবে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার কোয়াক ডাক্তারকে কোভিড চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রশাসনিক স্তরে সিদ্ধান্ত হয়েছে—

- ব্যাংক খোলা থাকবে সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টো পর্যন্ত
- বাজার সকাল ৭টা থেকে ১০টা এবং বিকেল ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকবে
- সোনারূপোর দোকান বেলা ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত খোলা
- সামাজিক, শিক্ষামূলক, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান করা যাবে না
- বিয়ে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে সর্বোচ্চ ৫০ জনের উপস্থিতিতে করা যাবে।

চিকিৎসা পরিষেবা বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য—রাজ্যে কোভিড শয্যা ২৭ হাজার। এই সংখ্যা ৩ হাজার বাড়বে। সঙ্গে আই সি ইউ শয্যা, ৩৫০০ থেকেও বাড়ানো হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক সময় কেউ মারা গেলে মৃতদেহ এতদিন কোভিড টেস্টের জন্য ফেলে রাখা হচ্ছিল। এখন থেকে র‍্যাপিড টেস্ট করলেই দ্রুত রিপোর্ট জমা পড়বে এবং সৎকারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে সাংবাদিক, পরিবহণ কর্মী এবং হকারদের দ্রুত ভ্যাকসিন দেওয়ার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যাঁদের প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাঁদের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বাজার জীবাণুমুক্ত করার জন্য বণিকসভাগুলিকেও এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, কোভিড চিকিৎসার জন্য প্রচুর বেসরকারি হাসপাতাল নেওয়া হয়েছে। শুধু ওষুধ কিনতেই বহু কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরকারি তহবিলেও অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, মূলত ৪টি বিষয় উল্লেখ করে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। প্রথমত, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১৮ বছরের বেশি বয়স্কদের টিকাকরণ, কারণ চাহিদামত টিকা মিলছে না। দ্বিতীয়ত, রেমডিসিভির এবং টোসিলিজুমারের মতো অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের জোগান বাড়ানো। তৃতীয়ত, যে হারে দ্রুত অক্সিজেনের প্রয়োজন বেড়ে চলেছে, ঘাটতি মেটাতে দৈনিক ৫০০ মেট্রিকটন অক্সিজেন সরবরাহ

প্রয়োজন। চতুর্থত, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় অক্সিজেন সিলিন্ডারের ঘাটতি। সম্প্রতি ৭০ ইউনিট পি এস ও বাংলার জন্য বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু এগুলি প্রতিস্থাপনের সময় লাগবে। দ্রুত পদ্ধতিগত জটিলতা কাটিয়ে তোলার বিষয়টি দেখতে হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তর এদিন নির্দেশিকায় জানায়, এখন থেকে প্রতিটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র/প্রাইমারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 'আইসোলেশন বেড' রাখতে হবে। কোভিড সন্দেহ হলে, না ফিরিয়ে, সেখানে ভর্তি রেখে চিকিৎসা শুরু করে দিতে হবে। প্রয়োজনীয় অক্সিজেন থেরাপি দেওয়ার পরিকাঠামো রাখতে হবে। অন্তত ১-২টি অ্যাম্বুলেন্স, প্রতি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করে রাখতে হবে। একই সঙ্গে এদিন কোভিড ওয়ার্ডে কর্মরত নার্সদের, প্রত্যেক কোভিড রোগীর পুঙ্খানুপুঙ্খ শারীরিক তথ্য চার্টের মাধ্যমে নোট রাখার ওপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

৭ মে, ২০২১

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন থেকে এই রাজ্যে বিশেষ বিমানে কেউ এলে আরটি-পিসিআর নেগেটিভ রিপোর্ট নিয়ে আসতে হবে। সমস্ত হাসপাতাল ও নার্সিং হোমকে ৪০ শতাংশ শয্যা বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জেলা ও মহকুমা স্তরে ১৩৫টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজেই অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসাবে। জুটমিলে প্রতি শিফ্‌টে ৩০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে। এছাড়া ডাক্তারিতে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়া, ইন্টার্ন ও তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়াদের কোভিড মোকাবিলার কাজে লাগানো হবে।

৮ মে, ২০২১

রাজ্যে অক্সিজেন বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ফের চিঠি লিখেছেন বলে এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি জানান, চিঠিতে তিনি লিখেছেন, বিষয়টি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাংলার দৈনিক চাহিদা দাঁড়াবে ৫০০

মেট্রিক টন। সুতরাং চাহিদা অনুসারে বরাদ্দ বাড়লে রাজ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে।

অন্যদিকে, স্বাস্থ্য দপ্তর তালিকা এবং চিকিৎসকের ফোন নম্বর সহ 'কোভিড কো-অর্ডিনেশন টিম' প্রকাশ করল। প্রতি জেলার ক্লিনিক্যাল কো-অর্ডিনেটরদের স্বাস্থ্যভবন-সহ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে চলতে বলা হল। অন্যদিকে প্রোটোকল সুপারভাইজার চিকিৎসকগণ ভিডিওকলে বা ফোনে নিরন্তর যোগাযোগ রাখবেন। একই সঙ্গে অন্য তালিকার বেশ কয়েকজন চিকিৎসককে হাসপাতাল ধরে, সিসিইউ-তে ভর্তি থাকা রোগীদের ওয়ার্ডে দিনে অন্তত ২ বার রাউন্ড দেওয়ার কথা বলা হল।

১০ মে ২০২১

করোনার উপসর্গ থাকলে বা না থাকলে চিকিৎসকরা মনে করলে কোনও ধরনের টেস্ট রিপোর্ট ছাড়া ভর্তি নিতে হবে সেই রোগীকে। প্রয়োজনে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থিতাবস্থায় না এনে কোনও রোগীকে অন্যত্র পাঠানোর কথা বলা যাবে না। একই সঙ্গে এদিন অপর নির্দেশিকায় বলা হল, কোভিডে আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেলে নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত নোডাল অফিসারের, অনুমতিক্রমে, সমস্ত কোভিড নিয়মাবলী মেনে, মৃত ব্যক্তির বাড়ির কাছে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা যাবে। এক্ষেত্রে বাড়ির নিকটতম ব্যক্তি সরাসরি হাসপাতাল থেকেই সেখানে নিয়ে যেতে পারবেন। অনেক সময় রোগীদের একেবারে শেষ পর্যায়ে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর বা পথে তাঁর মৃত্যু হলে দ্রুত র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করে করোনা আক্রান্ত কিনা সে বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, যাতে শেষকৃত্য করতে দেরি না হয়।

১১ মে ২০২১

কোভিড রোগীদের নির্দিষ্ট অক্সিজেন থেরাপি এবং সেই সংক্রান্ত তথ্য কম্পিউটারে নথিভুক্ত রাখা বাধ্যতামূলক করে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই নির্দেশিকায় যেমন অক্সিজেনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হল, তেমনি অন্যদিকে কোভিড রোগীর অক্সিজেন মাত্রা ৯২-৯৬% রাখার কথা বলা হল। এর থেকে বেশি মাত্রায় অক্সিজেন মাত্রা বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। সরকারি হাসপাতালে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার অক্সিজেন মাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহারের বিষয়টি দেখাশোনা করবেন। সেই সঙ্গে প্রতি ওয়ার্ডে একজন ওয়ার্ড নার্সকে নার্সিং অফিসার ইন চার্জ ফর অক্সিজেন ম্যানেজমেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। যে সমস্ত রোগীদের ফুসফুসের ক্রনিক সমস্যা বা হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট বা সিওপিডি সমস্যা রয়েছে, তাঁদের অক্সিজেন মাত্রা ৮৮-৯২% রাখার কথা বলা হল। এছাড়াও প্রত্যেক কোভিড রোগীকে কখন কোন মাত্রায় অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁদের অক্সিজেন মাত্রা কত থাকছে ইত্যাদি তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কম্পিউটারে নথিভুক্ত রাখার জন্য প্রতি ওয়ার্ডের একজন ওয়ার্ড নার্সকে 'নার্সিং অফিসার ইন চার্জ ফর সিপিএম এস পোর্টাল' হিসেবে দায়িত্ব দিতে হবে। হাসপাতালের সুপার প্রতিদিন অক্সিজেন ব্যবহার এবং নথিভুক্ত হওয়া তথ্য পরীক্ষা করে দেখবেন।

এদিন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ভিন্ন নির্দেশিকা জারি করে জানাল, কোভিডের চিকিৎসায় সবক্ষেত্রে প্লাজমা

থেরাপি নয়। এই নির্দেশিকায় বলা হল, কোভিডের উপসর্গ দেখা দেওয়ায় ৩-৭ দিনের মধ্যে প্লাজমা দিতে হবে। ১০ দিনের বেশি হলে প্লাজমা দেওয়া যাবে না। কোভিডে যাঁদের ঝুঁকি বেশি, যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ক্রনিক কিডনির অসুখ, সিওপিডি, করোনারি আর্টারি ডিজিজ, অতিরিক্ত ওজন, ধূমপায়ী, ৬৫ বছরের বেশি বয়স্কদের মৃদু থেকে মাঝারি অসুস্থতা, কম অক্সিজেন মাত্রার রোগীদের ভেন্টিলেশনের প্রয়োজনীয়তা কমাতে প্লাজমা থেরাপি করা যেতে পারে।

১২ মে ২০২১

বিদেশি বা দেশি কোনো সংস্থা এদেশে ভ্যাকসিন প্রস্তুত করতে চাইলে জমি দিতে প্রস্তুত রাজ্য সরকার। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে একথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তাঁর পরামর্শ, দেশে যা টিকা তৈরি হচ্ছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সুতরাং বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতনামা সংস্থাকে চিহ্নিত করে তাদের মাধ্যমেও টিকা তৈরি করা হোক। অন্যদিকে রাজ্যের প্রত্যেকের দ্বিতীয় ডোজ টিকার দায়িত্ব নিল রাজ্য সরকার। কোথায় কবে কোন টিকা তার বিস্তারিত জেলাভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করা হল।

অক্সিজেন সরবরাহ সঠিক রাখা এবং সুনিশ্চিত করতে রাজ্য স্তরে মনিটরিং কমিটি তৈরি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্য দপ্তরের ডা. দেবাশিস হালদার হলেন এই ৫ সদস্যের কমিটির টিম লিডার। অপর ৪ সদস্য হলেন ডা. রাঘবেশ মজুমদার, ডা. অদিতি চৌধুরি, ডা. দেবপ্রিয় সমাদ্দার এবং ডা. প্রবীর কুমার ঘোষ। অক্সিজেন সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, একটুও অক্সিজেন যেন নষ্ট না হয় তা দেখা এবং অক্সিজেন সরবরাহের উপযোগী যন্ত্রপাতি কেনা ইত্যাদি দেখাশোনা করার দায়িত্ব এই কমিটির। এছাড়াও প্রতিটি এলাকার ছোট বড়ো আইসোলেশন কেন্দ্রগুলিতে অক্সিজেন সরবরাহের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে বলা হল। অন্যদিকে করোনাকালে বিপর্যয় এড়াতে হাসপাতালে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য দপ্তর।

১৬ মে ২০২১

করোনা মোকাবিলায় রাজ্যে ১৫ দিন কড়া বিধি নিষেধ বলবৎ হল, ৩০ মে পর্যন্ত। রাজ্য সরকার নির্দেশিকায় জানাল, সমস্ত স্কুল কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জরুরি পরিষেবা ছাড়া সমস্ত অফিস বন্ধ থাকবে। পার্ক,

চিড়িয়াখানা, সুইমিং পুল, জিম, পার্লার শপিং মল বন্ধ, লোকাল ট্রেন, ফেরি, মেট্রো, বাস, আন্তঃরাজ্য ট্রেন বন্ধ। রাত ৯টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত বাড়ি থেকে বেরুনো নিষিদ্ধ। ওষুধ ও চশমার দোকান খোলা থাকলেও দুধ, রুটি বা মাংসের দোকান ৩ ঘণ্টা খোলা, ব্যাংক খোলা থাকবে সকলা ১০ টা থেকে ২ টো। মুদির দোকান সকাল ৭টা থেকে ১০টা এবং মিষ্টির দোকান সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা চা বাগানে ৫০% এবং চটশিল্পে ৩০% কর্মী নিয়ে কাজ। বিয়ে বাড়িতে দূরত্ব মেনে ৫০ জন আমন্ত্রিত। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্যের স্বার্থে এবং প্রাণহানি কমানোর জন্য প্রশাসন এই কড়া বিধিনিষেধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৭ মে ২০২১

কোভিড-১৯ নিয়ে গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৪ সদস্যের ক্লিনিক্যাল রিসার্চ স্টিয়ারিং কমিটি তৈরি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই কমিটিতে রয়েছে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর প্রাক্তন অধ্যাপক ডা. শান্তনু ত্রিপাঠী, এসএসকেএম হাসপাতালের অধ্যাপক অভিজিৎ হাজরা, আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক জ্যোতির্ময় পাল এবং বিসিরায় হাসপাতালের অধ্যক্ষ অধ্যাপক দিলীপ পাল।

২০ মে ২০২১

সুপার স্প্রেডারদের চিহ্নিত করে আগে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। টিকার সরবরাহ কম থাকায় ঠিক হয়েছে, আপাতত দুটি ভাগের মানুষ যাতে টিকা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান, সেটি দেখা হবে। একটি ভাগ হল যাঁরা মূলত স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত এবং দ্বিতীয় ভাগ হল যাঁরা মূলত স্প্রেডার এবং সুপার স্প্রেডার। দ্বিতীয় ভাগে রাখা হয়েছে সরকারি ও আধা-সরকারি কর্মী, বিচার বিভাগীয় কর্মী, জরুরি পরিষেবা বা পণ্যের সঙ্গে যুক্ত কর্মী, রেশন ডিলার, কেরোসিন ডিলার, এলপিজি ডিলার, পেট্রোল পাম্পের কর্মী, সমস্ত ধরনের পরিবহণ কর্মী, সাংবাদিক, আইনজীবী, মুহুরী, যৌনকর্মী, রূপান্তরকামী, হকার, সংবাদপত্র বিক্রেতা, খুচরো ব্যবসায়ী, মুদির দোকানদার, বাজারের মাছ-মাংস-সবজি বিক্রেতা, কোভিড স্বেচ্ছাসেবক এবং হোম ও সংশোধনাগারের কর্মী প্রভৃতি।

স্বাস্থ্য দপ্তর এদিন নির্দেশিকায় জানিয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি থাকা কোভিড রোগীদের চিকিৎসায় আরো উন্নতির জন্য বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। এজন্য প্রত্যেক হাসাপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে নোডাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি নানা কাজে ওই হাসপাতালের সুপারদের সাহায্য করবেন। একই সঙ্গে তিনি 'প্রোটোকল মনিটরিং টিম'-এর সঙ্গে সর্বদা সংযোগ রক্ষা করে চলবেন। রাজ্য সরকার চিহ্নিত প্রতিটি কোভিড হাসপাতালে 'কোভিড পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট কাম আউটকাম রিভিউ কমিটি' তৈরি করতে হবে। এই কমিটির মাথায় থাকবেন প্রতি হাসপাতালের সুপার এবং এই কমিটি সপ্তাহে অন্তত ২ বার বৈঠকে বসে কোভিড রোগীদের যাবতীয় চিকিৎসার বিষয়গুলি পর্যালোচনা করবেন। এই বিষয়ে যা যা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সেগুলি রাজ্যস্তরের প্রশাসকমণ্ডলী এবং চিকিৎসকদের জানাতে হবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, কোভিড নিয়ন্ত্রণে প্রতি হাসপাতালের নিজস্ব কমিটি তৈরির ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে।

২৫ মে ২০২১

কলকাতা পুলিশ হাসপাতালকে সাজিয়ে নতুন ভাবে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হল। সোমবার অর্থাৎ ২৪ মে মুখ্যমন্ত্রী এই আধুনিক কোভিড হাসপাতালের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, মেডিকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে এই হাসপাতালের দায়িত্ব নিয়েছে এবং বন্ধন ব্যাংক সহযোগিতা করছে। কলকাতার ভবানীপুরের এই ৩০০ শয্যার হাসপাতালে পুলিশের চিকিৎসা তো হবেই; শয্যা খালি থাকলে সাধারণ মানুষেরও চিকিৎসা হবে। এখানে এইচডিইউ, আইসিইউ থাকছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা করানো যাবে।

২৮ মে ২০২১

রাজ্যে অতিমারী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কড়া বিধিনিষেধের মেয়াদ আরো ১৫ দিন, অর্থাৎ ১৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হল। নির্মাণ শিল্পে কাজ করার ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে। জুটমিলে শ্রমিক উপস্থিতির হার ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়েছে। তবে অন্যান্য নির্দেশিকা অপরিবর্তিত থাকবে।

১ জুন ২০২১

করোনা সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসায় বিধিনিষেধে কিছুটা শিথিল করল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, বইয়ের দোকান খোলা থাকবে বেলা ১২টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত। খুচরো দোকানও ওই একই সময়ে খোলা থাকবে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ করা যাবে। বাকি বিধিনিষেধ যেমন ছিল, তেমনই থাকবে।

৪ জুন ২০২১

করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাণিজ্যে গতি আনতে কর্মীদের টিকাকরণের ওপর বেশি জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন বণিকসভাগুলির সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, কর্মীদের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেলে বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা যাবে হোটেল, রেস্তোরাঁ। একই সঙ্গে এদিন তিনি বলেন, এখন দুপুর ১১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত দোকান খোলা থাকলেও তা বাড়িয়ে ৪টে পর্যন্ত করার কথা ভাবা হচ্ছে। ১৬ জুন থেকে ২৫ শতাংশ কর্মী নিয়ে শপিং মল খোলা যেতে পারে। টিকার জন্য সুপার স্প্রেডারদের তালিকায় বাড়ির পরিচারিকা, ধানকল ও ময়দাকলের কর্মী, বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম সারাইকর্মীদের যুক্ত করা হল।

১৬ জুন, ২০২১

করোনা আরো নিয়ন্ত্রণে আনতে একদিকে যেমন কঠোর বিধিনিষেধের মেয়াদ বাড়ানো হল। অন্যদিকে কম কর্মী নিয়ে খুলল অফিস। সমস্ত সরকারি-বেসরকারি অফিসে ২৫ শতাংশ কর্মী এবং তাঁদের হাজিরার জন্য গাড়ি দিতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল। তথ্যপ্রযুক্তিতে ৫০ শতাংশ কর্মী। বেসরকারি সংস্থা খোলা থাকবে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে। খুচরো দোকান সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৬টা। ৫০ জনকে নিয়ে শুটিং এবং দর্শক ছাড়া খেলার অনুমতি দেওয়া হল।

রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সরকারি নির্দেশিকা

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare
PH & CD Branch
Swasthya Bhawan
Block – GN, No: 29, Sector V, Salt Lake, Kolkata– 700091

Memo No. HPH/9M-21/2020/part II/125 Dated: 10.05.2021

ORDER

This is in continuation of HPH/9M-21/2020/Pt II/111 dated 28.04.21 on ensuring admission for Covid suspect patients without a report/with a negative test report for Covid-19 needing emergency care.

It is hereby reiterated that this directive is applicable for **all hospitals both Private and Government including designated Covid hospitals**. All such patients needing urgent attention are to be admitted in SARI beds for necessary management. RAT should be done for detection of Covid infection status. No patient can be referred without stabilizing and arranging bed in the hospital referred to.

This is very urgent and due care of such patients must be ensured. Any deviation will be viewed seriously.

10/5/21
Director of Health Services
West Bengal

10/05/2021
Director of Medical Education
West Bengal

Memo No. HPH/9M-21/2020/part II/125/1(4) Dated: 10.05.2021

Copy forwarded for information & necessary action to:-

1. The Director, IPGME&R, STM
2. The Principal / MSVP (All)
3. The CMOH (All)
4. The Superintendent (All Hospitals)

10/5/21
Director of Health Services
West Bengal

10/05/2021
Director of Medical Education
West Bengal

কন্ট্রোল রুমে রাত জাগলেন মুখমন্ত্রী

ঘূর্ণিঝড় যশে বিধ্বস্ত বাংলা

সঙ্গে ভরা কোটাল ও চন্দ্রগ্রহণ

‘দুয়ারে ত্রাণ’ নিয়ে এলাকা পুনর্গঠনে জোর দিল রাজ্য সরকার

বিপদের সতর্কবার্তা মিলে গিয়েছিল। আবহাওয়া দপ্তর যে সতর্কবার্তা দিয়েছিল, সেইমতোই রাজ্যের উপকূলে আছড়ে পড়েছিল প্রবল ঘূর্ণিঝড় যশ। আর এই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় যখন বাংলার উপকূলকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়ে যাচ্ছে, তখন রাজ্য প্রশাসনের কন্ট্রোল রুমে বসে সমস্ত পরিস্থিতির ওপর নিজে নজরদারি চালিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-সহ রাজ্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সচিব-আধিকারিকরা। বলা চলে নবান্নের কন্ট্রোল রুম ছিল যেন ওয়ার-রুম।

প্রশাসনিক তৎপরতায় যেন দেরি না হয়, প্রাণহানি যেন না ঘটে, দ্রুত রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে দিয়ে জনজীবন যেন স্বাভাবিক করা যায়, সেটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইসঙ্গে জল একটু নামতেই ধ্বংসের চেহারা সামনে আসায় তার পর্যালোচনা করতে মুখ্যমন্ত্রী নিজে বেরিয়ে পড়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলা সফরে। নির্দিষ্ট এলাকায় এলাকায় পৌঁছে, মানুষের সঙ্গে কথা বলে, দ্রুত প্রশাসনিক নির্দেশ এবং ত্রাণের টাকা দেওয়া—এটাই ছিল মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আকাশপথে সমস্ত দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক সেরে সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেব প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। কেটেছে ঘূর্ণিঝড়, ভরা কোটাল এবং চন্দ্রগ্রহণ। এবার প্রয়োজন দ্রুত স্বাভাবিক জীবন—ত্রাণ ও পুনর্বাসন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁরা সবাই ত্রাণ পাবেন। যেভাবে 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্প গ্রামে গ্রামে,

পাড়ায় পাড়ায় হয়েছিল, সেভাবেই হবে 'দুয়ারে ত্রাণ'। কেউ যেন বঞ্চিত না হন বা অপব্যবহার না করেন, সেটা অবশ্যই দেখা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। সেজন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লকস্তরে শিবির বসে ৩-১৮ জুন। সেখানে হাতে লিখেই আবেদন জমা করতে পারেন সাধারণ মানুষ। এরপর সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হয় ১৯-৩০ জুন। ফিল্ড সার্ভেও করা হয়। সেইসঙ্গে জানানো হয়, সব ঠিক থাকলে ক্ষতিপূরণের টাকা দ্রুত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবে রাজ্য সরকার। এইভাবে প্রবল ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে একটা সার্বিক নিরাপত্তাবলয়ের মধ্যে মানুষকে ত্রাণ ও পুনর্গঠনের পরিষেবা দিল রাজ্য সরকার।

ঘূর্ণিঝড় যশের পর একদিকে মুখ্যমন্ত্রী যেমন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন, অন্যদিকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিয়ে জোরকদমে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন পর্যালোচনা বৈঠকে। তিনি বলেন, পুনর্গঠনে কোনও ঢিলেমি চলবে না। বাঁধ মেরামতি থেকে সেতু নির্মাণ দ্রুত শেষ করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের পরেই দ্রুত যেভাবে বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে বা উপড়ে যাওয়া গাছের হিসেব থাকছে না—সে বিষয়ে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। নবান্নে সেচ দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকে তিনি ঝড়ে বিপুল সংখ্যক উপড়ে যাওয়া গাছ কোথায় গেল, তা দ্রুত তাঁকে জানাতে বলেন।

মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় মেরিন ড্রাইভ দ্রুত সারানো এবং এলাকার সৌন্দর্যায়নের ওপর জোর দেন। তিনি বলেছিলেন, দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ এখানে হকারদের জন্য নতুন স্টল তৈরি করে দেবে। সমুদ্রের পাড় মেরামতি এবং পাথওয়েগুলি দ্রুত নতুনভাবে তৈরি করে দেওয়া হবে। মন্দারমণির হোটেল কর্তৃপক্ষদের বলা হবে, সমুদ্র থেকে কিছুটা ছেড়ে দিয়ে পরিকাঠামো তৈরি করতে।

নবান্নে কন্ট্রোল রুমে সারা রাত জেগে ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রগতির ওপর নজর রেখেই পরদিন সিদ্ধান্ত—ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই যান হিঙ্গলগঞ্জ। সেখান থেকে সাগর। সেখান থেকে কলাইকুণ্ডা হয়ে দিঘা। প্রতি জায়গা থেকেই রিপোর্ট সংগ্রহ করেন

তিনি। প্রতি জায়গাতেই সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। বিধ্বস্ত এলাকা একেবারে নতুন করে সাজানোর কথা বলেন। পরবর্তীতে নবান্নে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দিঘাতে একটি সেতু নির্মাণের কাজে সেচ দপ্তরের আরও বেশি নজরদারি প্রয়োজন। কোনও কাজে গাফিলতি ও আত্মতুষ্টি বরদাস্ত করা হবে না। ঝড়ে পড়ে যাওয়া বহু গাছ বন, পূর্ত, সেচ দপ্তর, পুরসভা তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু কে কত গাছ নিয়ে যাচ্ছে তার সঠিক হিসেব রাখতে হবে। সেই গাছগুলি ঠিকমতো ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা অর্থসচিব দেখবেন। প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়েই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হবে। তাই একদিকে যেমন কংক্রিটের বাঁধ তৈরি করা হবে, তেমনি প্রাকৃতিক উপায়ে ম্যানগ্রোভ ও ভার্টিভার গাছ লাগিয়ে বাঁধের জমি শক্ত করা হবে। তিনি মানুষকে বারবার আশ্বস্ত করে বলেন, ত্রাণ নিয়ে মানুষের দরজায় এবার সরকার পৌঁছে যাবে। মানুষের পাশে সর্বদা রাজ্য সরকার আছে।

ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলা যেভাবে

প্রস্তুতি পর্ব :

- সাইক্লোনের প্রথম সতর্কবার্তা ১৮ মে।
- ১২টি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের ৩৩টি এজেন্সির সঙ্গে বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক ১৯ মে।
- ২২ মে ফের মুখ্যমন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠক।

তৈরি হল নেটওয়ার্ক, শুরু হল প্রচার

- সরকারিভাবে সেনার সাহায্য চেয়ে রাখল রাজ্য সরকার ২৪ মে।
- বিভিন্ন এজেন্সির লক্ষাধিক আধিকারিক ও কর্মীকে তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হল।
- প্রতি কেন্দ্রে পৌঁছে গেল ত্রাণ সামগ্রী। সেইসঙ্গে পুলিশ প্রশাসন নজরদারি কেন্দ্রগুলিতে রওনা হল।
- বিদ্যুৎ, পানীয় জল, নিকাশি, সেচ, বন, বিপর্যয় মোকাবিলা, পুরসভা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি দপ্তরকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতি দপ্তর নিজেরা বৈঠক সেরে নিল।

- এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সেনা নৌসেনা, উপকূল বাহিনী তাদের লঞ্চ, জাহাজ, স্পিডবোট নিয়ে টহলদারি শুরু করল।
- সংবাদ মাধ্যম এবং মাইকে প্রচার শুরু হল।
- হোটেল, গেস্ট হাউস সম্পূর্ণ ফাঁকা করে দেওয়া হতে থাকল।
- মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা এবং যাঁরা গিয়েছেন তাঁদের দ্রুত ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ শুরু হল।
- বিমান ও ট্রেন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা।
- ১৫ লক্ষ মানুষকে আশ্রয়স্থলে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হল।

বিপর্যয় শুরু ও প্রভাব

- সাইক্লোনের আঘাত, পূর্ণিমার ভরা কোটাল, চন্দ্রগ্রহণ শুরু হল।
- সমুদ্র ও নদীর জলস্তরে প্রবল উচ্ছ্বাস। সর্বত্র প্রবল জলস্তর বৃদ্ধি।
- কয়েক কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, কলকাতা, ঝাড়গ্রাম, হুগলি, হাওড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায়।
- বিপুল প্রভাব সুন্দরবনে। প্রায় সমস্ত নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত বা ভেঙে গেছে। বহু লক্ষ বাড়ি ও জমি ক্ষতিগ্রস্ত। শস্য, সেচ, মাছের ক্ষতি।

পাশে দাঁড়াল সরকার

- প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান ও অর্থের দাবি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী।
- তৈরি হচ্ছে দিঘা মাস্টার প্ল্যান। সঙ্গে সুন্দরবনের নদীবাঁধ এবং ম্যানগ্রোভ অরণ্য রক্ষা ও গাছ লাগানোর ওপর ভীষণ জোর।
- দ্রুত ঘরবাড়ি ও রাস্তা মেরামতের জন্য 'দুয়ারে ত্রাণ' প্রকল্প।

রাজ্যের সঙ্গে যৌথভাবে ক্যানসার প্রতিরোধে সামিল টাটারা

চিকিৎসক ও নার্সদের আবাসন

বিনামূল্যে জমি দেবে রাজ্য

এবার চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য বিনামূল্যে জমি দেবে রাজ্য। সম্প্রতি এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে এমনই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএস, সাংবাদিকদের জমি দিতে পেরেছি। কিন্তু চিকিৎসক-নার্সদের দেওয়ার কথা কেউ চিন্তা করেননি। আমরা ভেবেছি। সেই অনুযায়ী কাজও হবে। ফিরহাদ হাকিম হিডকোর চেয়ারম্যান। তাঁকে বলেছি ১০ একর জমি দিতে। ডাক্তার ও সিস্টারদের আমরা বিনা পয়সায় জমি দেব। তারপর এঁরা নিজের পয়সায় আবাসন তৈরি করে নেবেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও জানিয়েছেন লি রোডে এসএসকেএম-এর পড়ুয়াদের জন্য এগারো তলা হস্টেল তৈরি করা হবে। পাশাপাশি শহরের পাঁচটি কলেজের অধ্যক্ষ, স্বাস্থ্যসচিব এবং সচিব পর্যায়ের অফিসারদের থাকার জন্য হেস্টিংসে সাততলা আবাসন তৈরি করা হবে। এছাড়া পিজি হাসপাতালের ভিতরে একটি বিল্ডিং থেকে অপর বিল্ডিং-এ যাওয়ার জন্য ফুটব্রিজ ও ছোটো রাস্তা তৈরির চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হয়েছে পুরসভাকে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নিজের নজরদারি বাড়াতে ১৫ দিন অন্তর এসএসকেএম হাসপাতালে বসতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো ২৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার

বিকেলে হাসপাতালে আসেন তিনি। নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর ন'তলায় তাঁর জন্য ঘর নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফিরহাদ হাকিম, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম, পিজি-র অধিকর্তা চিকিৎসক মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাখানেক বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠকও করেন তিনি। পরে নীচে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

চিকিৎসকদের অভাব মেটাতে এদিনই মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোয়াক ডাক্তাররা স্বাস্থ্য দপ্তরের দেওয়া গাইডলাইন মেনে এখন থেকে গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার কাজ করতে পারবেন। এছাড়াও, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে নার্স হিসেবে কাজ করছেন, তাঁদের করা হবে প্র্যাকটিশনার সিস্টার। অবশ্যই তাঁদের সিনিয়র চিকিৎসকদের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, জীবনের অনেকটা সময় তাঁরা হাসপাতালে কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের কথা আমাদের ভাবতে হবে। এঁদের মধ্যে অনেকেই ডাক্তারদের সমকক্ষ হয়ে কাজ করেন। এক্স-রে, এমআরআই-সহ সবকিছু তাঁদের করতে হয়। এঁদের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সাংবাদিকদের আরও বলেছেন, টাটারা এসএসকেএম-এর সঙ্গে যৌথভাবে ক্যানসার হাসপাতাল করবে। শিলিগুড়িতেও যৌথভাবে ক্যানসার হাসপাতাল হচ্ছে।

হাসপাতালে এদিনের আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সকলের কথা শুনলাম। ভাল লাগল। যদি আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি, তাহলে চিকিৎসা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হবে।

পিজি হাসপাতালের উল্টোদিকে হরিশ মুখার্জি রোডে তৈরি হচ্ছে ক্যানসার হাসপাতালের ভবন। সেখানে ভূগর্ভস্থ পার্কিং লট তৈরি হবে। সেখানে গাড়ি রাখার পরে চিকিৎসকেরা যাতে সহজে হাসপাতালে চলে আসতে পারেন—তারা জন্যও তৈরি হবে একটি ফুট ওভারব্রিজ।

শিক্ষকদের বদলিতে নতুন পোর্টাল ‘উৎসশ্রী’

স্কুল শিক্ষকদের বদলির প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, নির্ভুল এবং দুর্নীতিমুক্ত করতে শুরু হল অনলাইনে বদলির ব্যবস্থাপনা। পোর্টালের নাম উৎসশ্রী। ৩১ জুলাই, ২০২১ এই পোর্টালের উদ্‌বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সরকার পোষিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের বদলির সমস্ত কাজ শুধুমাত্র এই পোর্টালের মাধ্যমেই করা হবে।

এই পোর্টালের মাধ্যমে বদলি পেয়েছেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জানা গিয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বদলির প্রক্রিয়া অনেকটা সহজ। কিন্তু উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল ভাষার মাধ্যম, পাঠদানের বিষয় ইত্যাদি। ফলে প্রক্রিয়াটি জটিল হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের বদলির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদনকারী শিক্ষক/

শিক্ষাকর্মীকে ন্যূনতম পাঁচ বছর একটি স্কুলে এবং একটি নির্দিষ্ট পদে চাকরি করতে হবে। তবেই তিনি বদলির জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

নিজের স্কুল থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে কোনও স্কুলে তিনি বদলির আবেদন করতে পারবেন না। ২০১৫ সালের এই বদলির বিজ্ঞপ্তিটির কিছু সংশোধন করা হয়েছে এই বছরের ৮ সেপ্টেম্বর।

এছাড়াও শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের সমস্যা, বিশেষ করে উচ্চমাধ্যমিক বিভাগে, যেখানে কোনও একটি বিশেষ বিষয়ে পড়ানোর জন্য একজন মাত্র শিক্ষক রয়েছেন, তাঁর বদলের প্রয়োজন হলে তিনি সেই সুযোগ পান না। উৎসশ্রী পোর্টালেও এই সমস্যার সমাধান অনেকক্ষেত্রে হয়নি। এরপর বিদ্যালয়শিক্ষা বিভাগে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর কমিশনার অব স্কুল এডুকেশন সমস্ত ‘ডি আই’-দের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, সংশোধন হওয়া না পর্যন্ত এই সমস্ত শিক্ষকদের বদলির আবেদন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আশপাশের স্কুলে ওই বিষয় পড়ানোর জন্য শিক্ষকের খোঁজ করা হবে। সেই শিক্ষক আবেদনকারী শিক্ষকের স্কুলে গিয়ে সপ্তাহের মধ্যে কয়েক দিন পড়াবেন যতদিন পর্যন্ত না স্থায়ী শিক্ষক সেই স্কুলে গিয়ে যোগদান করছেন। এই পোর্টালে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, টোল ফ্রী নাম্বার এবং মেল আইডি দেওয়া হয়েছে যোগদান করার জন্য।

বাংলার বাড়ি

দেশের মধ্যে সেরা পশ্চিমবঙ্গ

ফের পশ্চিমবঙ্গের মুকুটে যুক্ত হলো নতুন পালক। ১০০ দিনের কাজ, মিশন নির্মল বাংলার মতো আরো এক প্রকল্পে দেশের মধ্যে সেরা হল বাংলা। বাংলার বাড়ি প্রকল্প কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের জিও ট্যাগিং রেটিংয়ে চলে এল শীর্ষে। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের দেওয়া হিসেবে এই আবাস যোজনায় সাফল্যের হার ৯৭.৪৫ শতাংশ। প্রসঙ্গত এই প্রকল্পের আওতায় শহরাঞ্চলে একটি বাড়ি তৈরিতে খরচ হয় ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। তার মধ্যে যিনি বাড়ি পাচ্ছেন তাঁকে দিতে হয় ২৫ হাজার টাকা। এবার এই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের জন্য লোগো আঁকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে এবার থেকে এই লোগো আঁকা থাকবে।

প্রসঙ্গত, শহরাঞ্চলে বাংলার বাড়ি প্রকল্প এবং গ্রামাঞ্চলে বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পে গরিব মানুষের মাথার উপর ছাদ তৈরির কাজ চলছে।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস

বিশ্ব আদিবাসী দিবস এই রাজ্যেও পালিত হল ১০ আগস্ট। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধামসা বাজিয়ে, শিল্পীদের সঙ্গে সমবেত নৃত্যে অংশ নিয়ে উদ্বোধন করলেন মূল অনুষ্ঠানের। ঝাড়গ্রামে। বিশেষ পোশাক পড়ে ওরা নাচে। মানে আদিবাসী, সাঁওতালি শিল্পীরা। মুখ্যমন্ত্রীও ওপরে সেই চাদর জড়িয়ে নিলেন মঞ্চেই। সঙ্গে ছিলেন বন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী, সদ্যজয়ী ঝাড়গ্রামের ভূমিকন্যা বীরবাহা হাঁসদা। তাঁরই তৎপরতায় মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছা রূপ পেল। আমরা পেলাম নজিরসৃষ্টিকারী একটি মুহূর্ত। রাজ্যের আদিবাসী মানুষেরা আপ্লুত।

এই রাজ্যে আদিবাসী মানুষদের উন্নয়নের ভাবনায় যেসব কার্যকরী পদক্ষেপ করা হয়েছে সেগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে সরকার রাজ্যে সার্বিক উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে এসেছে আদিবাসীদের। ৪০টি আদিবাসী গোষ্ঠীর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিকতা নেহাতই কথার কথা নয়। তৈরি হয়েছে আদিবাসী দপ্তর। আদিবাসীদের সহজে জাতিশংসাপত্র দেওয়ার জন্য অনবরত কাজ চলছে। এটি না থাকলে তারা সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নে পর্ষদ তৈরি হয়েছে। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে প্রতিটি জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যেই বিশেষ সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়নসহ অন্যান্য অসুবিধা দূর করার চেষ্টা চলে। তাদের শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করে রাখতে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'জয় জহার' প্রকল্পের মাধ্যমে ষাটের বেশি বয়সী নারীপুরুষকে মাসে এক হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে পঁচিশ থেকে ষাট বছর বয়সীদের মাসে একহাজার টাকা দেওয়া হবে। এর ফলে, আদিবাসী মানুষদের এক বৃহৎ অংশ আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবেন।

আদিবাসী মানুষেরা মূলত গ্রামাঞ্চলেই থাকেন। কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বিভিন্ন দপ্তরের সহায়তায় তাঁরা এইসব কাজে এগিয়ে যেতে পারছেন। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছে

নতুন প্রজন্ম। লেখাপড়া শিখে অন্য ধরনের পেশায় আগ্রহী যুবকযুবতীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

যদিও, বেশ কয়েকটি আদিবাসী গোষ্ঠী এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। ফলে, এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি সরকারি সহায়তা পেলেও তেমনভাবে জেগে উঠতে সময় লাগছে। রাজ্যের জঙ্গলমহল অঞ্চলে আদিবাসীগোষ্ঠীগুলি শতকের পর শতক ধরে বসবাস করলেও উন্নয়নের কাজ সবে শুরু হয়েছে গত দশ বছর ধরে। পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এদের জীবনযাপনের মান উন্নয়নের কাজ চলছে। ঘর, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, রেশন, স্বাস্থ্যসাথী, শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, কৃষকভাতা, সবুজসাথী, জয় জোহার, শিশু আলয়, একশ দিনের কাজ পিছিয়ে থাকা মানুষদেরও এগিয়ে নিয়ে যাবে আশা রাখি। সরকার ও প্রশাসনের দিক থেকে চেষ্টা চললেও এদের নিজেদের ভেতর থেকে একটু জ্বলে ওঠা দরকার। তবেই বিশ্ব আদিবাসী দিবস সার্থক হয়ে উঠবে।

পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এদের জীবনযাপনের মান উন্নয়নের কাজ চলছে।

জনগণ ও সরকার

মাঝে কেউ ছিল না : মুখ্যমন্ত্রী

'দুয়ারে সরকার' দ্বিতীয় দফায় চালু হল ১৪টি প্রকল্পের পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে। ১৬ আগস্ট, ২০২১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১—একমাসব্যাপী রাজ্যের নানা জেলায় প্রায় সতেরো হাজারেরও বেশি শিবির চালু হয়।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রথমবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে অভূতপূর্ব সাড়া মেলে। খুব উল্লেখযোগ্য তাঁর মন্তব্যের একটি অংশ যেখানে তিনি বলছেন, 'মাঝে কেউ ছিল না'। জনগণ আর সরকার। সেতুবন্ধন তো এখানেই সার্থকতা পায়। সরাসরি শিবিরে আসছে মানুষ, বিনা পয়সায় ফর্ম পাচ্ছে, পূরণ করে জমা দিচ্ছে, পরিষেবা পাচ্ছে। কোনও অসুবিধা নেই, অভিযোগ নেই, ক্ষোভ নেই। প্রথমবারের সার্থকতায় অনুপ্রাণিত সরকার আরও বেশি পরিষেবা দিতে দ্বিতীয় বারেও এই উদ্যোগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিভিন্ন পরিষেবার তালিকাটি একটু চোখ বুলিয়ে নিতে পারা যাবে সংযুক্ত চিত্রের মাধ্যমে (৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

প্রথমবারের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি নাড়িয়ে দিয়েছিল রাজ্যবাসীকে। বিশেষ করে, এই অতিমারীর সময় 'স্বাস্থ্যসাথী'-র সুবিধা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা এত সময়োপযোগী ছিল, এত বাস্তবসম্মত ও আন্তরিক ছিল, যা রাজ্যবাসীকে আপ্লুত করেছিল।

সাধারণ সময়েও, আমরা জানি, আমাদের বড়ো শত্রু হল রোগ। সবসময় আমরা রোগের জন্য ভয়ে থাকি। কারণ 'রোগ' আমাদের খুব সহজে মৃত্যুর কাছে পৌঁছে দেয়। 'মৃত্যু' মানেই হারিয়ে যাওয়া। চিরকালের জন্য চলে যাওয়া। প্রিয় বিয়োগের দুঃখ কোনও দিনও যায় না। হৃদয় ভারী করে রাখে।

শুধু কি তাই? রোগ যন্ত্রণায় কাতর ঘরের মানুষ বা প্রতিবেশী মানুষটির জন্য উদ্বেগ কম হয় না। যদি একটু উপশম করা যায়, ঠিকঠাক রোগটির কারণ চিহ্নিত করা যায়, সঠিক সময়ে সঠিকভাবে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা যায়, আর এইসব মিলিয়ে সুস্থ করে তোলা যায় মানুষটিকে, তবেই না কিছুটা স্বস্তি মেলে।

সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার কিছু সুবিধা সকলেই নিতে পারে। কিন্তু আর্থিক সক্ষমতা দরকার এর জন্য। সরকারি ক্ষেত্রে নিখরচায় কিছু সুবিধা পাওয়া যেত। বর্তমান সরকার, সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে ধীরে ধীরে। একসময় হাসপাতালে 'ফ্রি বেড'-এ রোগী ভর্তি হলে চিকিৎসার ও খাওয়া দাওয়ার জন্য পয়সা লাগতো না। এই সরকার সব বেডকেই 'ফ্রি বেড' করে দিল। পাশাপাশি, বিনা পয়সায় সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করল। চালু হল ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, ন্যায্য মূল্যের ডায়গনস্টিক সেন্টার। হাসপাতালের রোগীর জন্য বিনা পয়সায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাবতীয় সুযোগ। চালু হয়েছিল নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য 'স্বাস্থ্যসাথী'-র সুবিধা। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের জন্য 'স্বাস্থ্যবীমা' চালু হওয়ার বিষয়টি। এক্ষেত্রে, বড়ো বড়ো নার্সিংহোমে সরকারি ছাপোষা মানুষদের প্রবেশাধিকার যেন প্রায় ছিলই না। অবশ্যই আর্থিক কারণে। তাছাড়া, ওইসব প্রতিষ্ঠানের হিসেব-নিকেশ সাধারণ মানুষ ঠিক বুঝতে পারতো না। বিপুল বোঝা চেপে যেত রোগীর পরিবারের ওপর। বর্তমান সরকার, এইসব সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এল আন্তরিকভাবে। তৈরি হল রেগুলেটরি কমিশন। রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এ এক অভিনব উদ্যোগ সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই কোনও, যে সরকার এই বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে নিজের মুঠিতে রাখতে কতটা দৃঢ়বদ্ধ। আমরা তার প্রমাণ পেলাম। যখন সরকারি কর্তৃপক্ষ বেসরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারবার আলোচনায় বসল এবং সেই আলোচনা সভা সাধারণ মানুষ চাক্ষুষ করল মিডিয়ার পর্দায়।

স্বাস্থ্য পরিষেবার একটি ব্যবসায়িক দিক আছে, সে কথা ভুললে চলবে না। উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটছে। দামি যন্ত্রপাতি ও উচ্চশিক্ষিত, প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন পড়ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মানুষকে অনেকটাই সুস্থ করে তোলে। এগুলো আজ অনস্বীকার্য। বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় ঝা-চকচকে যা কিছু দেখি এবং তার সুযোগ পেতে আগ্রহী হই, এর পিছনে বিপুল বিনিয়োগের একটি গল্প আছে, সেটি মনে রাখা দরকার এবং শ্রদ্ধাপূর্ণভাবেই মনে রাখা দরকার। মনে রাখা দরকার এ কথাটাও যে, সব ক্ষেত্রেই কিছু লোভী মানুষ থাকে এবং অসৎ উপায় অবলম্বন করতেই তারা দক্ষতা অর্জন করে। কিন্তু এরাও সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও এদের দেখা মেলে। সরকারি, বেরিকারি উভয়ক্ষেত্রেই। তাই সরকার প্রতি মুহূর্তে সতর্ক এদের জন্য। অন্যদের সাবধান করার প্রচেষ্টা চালায়। এই প্রয়াস বর্তমানে উভয় পরিষেবার ক্ষেত্রেই, অর্থাৎ, সরকারি ও বেসরকারি দুটোই কড়া হাতে সামলাচ্ছে।

অসহায় মানুষের পাশে সরকার আছে। অসুস্থতা মানুষকে সবচেয়ে অসহায় করে, যত ধনী ব্যক্তিই হোক না কেন, রোগ কোনও কিছুর পরোয়া করে না; আর

এই দীর্ঘ অতিমারী সে কথাই নতুন করে জানিয়ে দিল সকলকে। তাই কোনওরকম বিভাজন না রেখেই, সকলের জন্য খুলে দেওয়া হল স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগের দরজা। সকলের জন্য চালু হল স্বাস্থ্যসাথী কার্ড।

দুয়ারে সরকার পৌঁছে গেল, মানুষ এল, এল শিবিরে। ফিরে গেল একটি কার্ড নিয়ে। নিশ্চয়তার একটি কার্ড, কে দিল এই নিশ্চয়তা? সরকার। আবার প্রমাণিত হল বিজ্ঞাপনের সেই কথা কত সত্য—মানুষের পাশে মানুষের সরকার।

দিন গড়িয়ে চলেছে। 'দিদিকে বলো' যেমন একদিন সাড়া ফেলেছিল, ধীরে ধীরে সাহস-সঞ্চয়ী মানুষ এবার দেখল, দিদিই চলে এল ঘরে ঘরে। হাঁক দিয়ে যেন ডাক দিল। সরকার এল মানুষের দরকারের কথা শুনতে। বিশ্বজুড়ে ডেভেলপমেন্ট পলিসির পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা স্তরে যে কথা বারবার ভাবা হয়েছে, হচ্ছে—সেই কথাই গুরুত্ব পেল। নিচের থেকে উঠে আসুক প্রয়োজনের কথা। উঁচুতলার মানুষকে কাজ করতে হবে তৃণমূলের মানুষের কাছে গিয়ে। পৌঁছতে হবে শিকড়ে। বুঝতে হবে তাদের যাপনরীতি, ভাষা ব্যবহারের চমৎকারিত্ব, চাহিদার চরিত্র, নিজস্ব ইতিহাসের ধারাবাহিকতা।

দশ-দশটি বছর সময় লেগেছে সরকারের। একদিনে সম্ভব হয়নি দুয়ারে পৌঁছনো। 'দুয়ারে সরকার'—একটি প্রকল্প বা কর্মসূচির নাম। কিন্তু দশ বছর ধরে সরকার চেয়েছে ঘনিষ্ঠভাবেই মানুষের মধ্যে থাকতে। কোন্ মানুষ? সহজ উত্তর—'রাজ্যবাসী'। রাজ্যবাসী মানে রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দ। রাজ্যটার নাম পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্যটার ভাঙা-গড়ার ইতিহাস, মিলে-মিশে থাকার কথকতা, বৈচিত্র্যের নানা রঙের বয়ে যাওয়া নদী, ভাষা-উপভাষার ভিড়ে জমে ওঠা কলকলানী—এসবই জানান দেয় 'রাজ্যবাসী' শব্দটার মধ্যে এক সমুদ্র যেন ঢুকে আছে। ওপর থেকে যা নিস্তরঙ্গ। এই 'ঐক্য'-ই রাজ্যটিকে লড়াই করার শক্তি দেয়।

'স্বাস্থ্যসাথী'-র কার্ড প্রথম থেকেই দেওয়া হয়েছে পরিবারের মহিলা কর্ত্রীর নামে। নারীর ক্ষমতায়ন এই রাজ্যে উন্নয়নের অভিমুখকে নিয়ন্ত্রণ করে। নতুন করে সেকথা উল্লেখের প্রয়োজন নেই, এ কথা মনে করারও কোনও যুক্তি নেই। কারণ নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই চলবে। নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন সার্বিকভাবে না-ঘটা পর্যন্ত বিষয়টির গুরুত্ব একচুলও কমানো যাবে না। বাস্তবকে অস্বীকার করে এগোনো যায় না। কঠোর হাতে তার মোকাবিলার প্রয়োজন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা বলেই মহিলাদের জন্য নানা প্রকল্প শুরু করে দেন না। অনেক ভাবনা-চিন্তা, আলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি এক-একটি মানবিক প্রকল্প ঘোষণা করেন। মানুষ যেন মানুষের অধিকারে বাঁচতে পারেন, সেটাই প্রাধান্য পায় মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকারের ভাবনায়।

সমস্যার পাহাড় ডিঙানো সহজ নয়। কিন্তু একটু একটু করে যেন সমস্যার ঘনত্ব হ্রাস করা যায় সেই প্রয়াস নিরন্তর চলতে থাকে। আর তাই একটার পর একটা

প্রকল্পের মাধ্যমে চলে এই হাঁসফাঁস করা পরিস্থিতির থেকে একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ দেওয়া।

আবারো ফিরে আসে, বারবার ফিরে আসে সেই একই কথা। বারবার লিখতেও হয়, মনে করিয়ে দিতেও হয়। যেমন মিড-ডে-মিল-এর কথা, যেমন কন্যাশ্রীর কথা, যেমন সবুজ সাথী-র কথা।

'সকলের জন্য শিক্ষা', 'সর্বশিক্ষা', 'অঙ্গনওয়ারি অথবা আইসিডিএস' শব্দগুলো বহুদিন শোনা। সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি কেউ কেউ পড়েছেন, সকলে পড়েননি। এর প্রকৃত অর্থও অনেকে বোঝেননি। অনেকের জীবনেই সুযোগ হয়নি বিদ্যালয়ে যাওয়ার, শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার। কত-না-সমস্যা, কত-না-ক্ষোভ, কত-না-অভিযোগ। গুমরে গুমরে মরে মনের মধ্যে। প্রতিদিনের চাওয়া-পাওয়ার বাতাস যেন বারুদ-গন্ধে দমবন্ধ করে দেয়। হৃদয়জাত এই বারুদ জীবনগুলোকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। ক্ষতে প্রলেপ লাগাতেও চালু হয় প্রকল্প। যেমন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'।

সামান্য একটু অর্থ-সাহায্য, মাস গেলে কটা টাকা বইতো নয়। না, না, অসামান্য হয়ে যায় কারো কারো কাছে। বাঁচিয়ে তোলে কত জীবন। বেশ কয়েকটি এই ধরনের প্রকল্প চালু আছে এই রাজ্যে। বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, লোকপ্রসারের ভাতা ইত্যাদি। মাস গেলে এই সামান্য অর্থই কত মানুষের জীবনের বাঁচার প্রয়োজনীয় রসদ জোগায়। আমাদের চারপাশে এমন মানুষের অভাব নেই। এমন একটা সমাজের মধ্যেই আমরা বেঁচে আছি। সুতরাং চোখ বন্ধ করে রেখে এদের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

আর্থিক সামর্থ্য সকলের একই রকম থাকে না। সামর্থ্য কমে গেলেও দোরে দোরে হাত পাততে পারে না অনেকেই। আর তারই জন্য সমাজ কল্যাণের ব্রত নেয় সরকার। পিছনের সারিতে পড়ে থাকা মানুষগুলোর জন্য ভাবতে বসে সরকারি দপ্তর। বিভিন্ন দপ্তর মিলেমিশে একসঙ্গে এইসব সমস্যার সমাধানের পথ তৈরি করে। অন্ধকারে আলো জ্বলে ওঠে। তপশিলি ও আদিবাসী মানুষদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। এককালীন নয়। প্রতি মাসে, ষাট-উত্তীর্ণ মানুষদের জন্য পেনশন তথা ভাতা চালু হয়। আর ষাটের নীচে যে মহিলারা আছে, তাদের জন্য চালু হয় 'লক্ষ্মী'র ভাণ্ডার'। তপশিলি ও আদিবাসীদের জন্য এক হাজার প্রতি মাসে, অন্যান্যদের পাঁচশো।

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের কাজ শুরু হল দুয়ারে সরকারের কর্মসূচির মাধ্যমে। অর্থাৎ, একেবারে ঘরের দোরে পৌঁছে গেল সহায়তার হাত। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বিধানসভা নির্বাচন, ২০২১-র আগে। বিপুল জয়ের পর শুরু হল পূরণের কাজ। রাজ্যজুড়ে, এই অতিমারীতে ঘরের মহিলারা এলেন। শিবিরে গিয়ে ফর্ম পূরণ করলেন। সরকারি কর্মী ও আধিকারিকরা অত্যন্ত নিষ্ঠায় এই কাজ করে চললেন একমাস ধরে। এরই মধ্যে কোথাও কোথাও চলল উপনির্বাচনের বিধিনিষেধ।

প্রথম পর্যয়ের 'দুয়ারে সরকার' ও 'পাড়ায় পাড়ায় সমাধান'—সাড়া ফেলে দিয়েছিল। প্রশংসিত হয়েছে অমর্ত্য সেনের মুখেও। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের এইসব শিবির প্রমাণ করল সরকার কাজ করতে চায়। খোঁজে তাই নতুন পথ, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটায় মানুষের ভালো করার জন্য। আন্তরিকতায়। দরদে।

—সু রা

রাজ্যবাসীর সার্বিক উন্নয়নই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য

রাজ্য সরকারের ২০২১-২২ সালের অর্থবর্ষের বাজেট বিধানসভায় পেশ করা হয় ৭ জুলাই, ২০২১ তারিখে। অর্থমন্ত্রী শ্রী অমিত মিত্রের অসুস্থতার জন্য পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই বাজেট পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে। এটি পুনর্মুদ্রিত করা হল।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহতী সদনে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করছি।

বর্তমান অর্থমন্ত্রী ডঃ অমিত মিত্রের শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে আমার উপর দায়িত্ব পড়েছে পরিষদীয় মন্ত্রী হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করার। বাংলার মা-মাটি-মানুষকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। শত প্রতিকূলতা তৈরি হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিপুল সমর্থন ও আশীর্বাদ তৃতীয়বারের জন্য এই মহান রাজ্যের জনগণকে সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা নতমস্তকে মা-মাটি-মানুষকে পুনরায় কুর্নিশ জানাই।

এমন রাজ্য কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি.....এ রাজ্যের সবটাই শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বর্ণময় ছন্দময় চিত্র।

আমাদের মা-মাটি-মানুষ সরকারের বহুমুখী প্রকল্পের বাস্তবচিত রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে জনহিতকর সেবায় আমাদের সরকার অদম্য সাহসিকতার প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে রাজ্যের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সুদক্ষ পরিচালনায় বহুবিধ জনকল্যাণমূলক কর্মসুচির সফল রূপায়ণ এবং সামগ্রিকভাবে রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাজ্যবাসী আপ্লুত।

আমরা সকলের সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

২০২১-এর ৫ই ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা বাজেট পেশ করেছিলাম এবং সেই বাজেটে আগামী দিনে আমাদের লক্ষ্যের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছি। এই মহতী সদন ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষের প্রথম চার মাসের ব্যয়বরাদ্দ ভোট অন অ্যাকাউন্টে পাস করেছে।

২০২১ সালের ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেটে সরকার রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য সকল সামাজিক ক্ষেত্র যথা—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ২৬টি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেছিল। এছাড়াও বিভিন্ন পরিকাঠামোমূলক প্রকল্পের ঘোষণা করে তার রূপায়ণের জন্য অর্থবরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের রাজ্যে নজিরবিহীন ৮-দফা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ফলে ২০২১-এর মার্চ মাসে কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউ ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের জীবনহানি কমানোর লক্ষ্যে, নির্বাচনী দফা কমানোর জন্য আমাদের অনুরোধে কর্ণপাত করা হয়নি। আমাদের এই অনুরোধ যদি গৃহীত হতো তাহলে বেশ কিছু মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব হতো।

প্রথম দফা নির্বাচনের সময় কোভিড অতিমারির সংক্রমণের হার যেখানে ৩ শতাংশের মতো ছিল, সেখানে অষ্টম দফার সময় এই অতিমারি লাফিয়ে বেড়ে ৩৩ শতাংশে গিয়ে পৌঁছায়। আমাদের নবনির্বাচিত সরকারের আপ্রাণ চেষ্টায় এই অতিমারির প্রকোপ এখন নিম্নমুখী এবং সংক্রমণের হার ২.১৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

রাজ্য সরকার শুরু থেকেই চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও আধিকারিকদের নিয়ে দল গঠন করে কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিকে দারুণভাবে সামাল দিয়ে এসেছে। রাজ্য সরকার সরকারি পরিচালনায় থাকা ২৩৫টি হাসপাতালকে শুধুমাত্র কোভিড হাসপাতাল রূপে গঠন করেছে, যার মধ্যে ১৯৪টি সরকারি হাসপাতাল রয়েছে এবং ৪১টি বেসরকারি হাসপাতালকে কোভিড চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে। এই হাসপাতালগুলিকে কোভিড রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা তথা সাব-ডিভিশনে কোভিড হাসপাতাল গঠন করা হয়েছে। রাজ্যের জনগণের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য আমরা যথাসাধ্য নজরদারি চালু রেখেছি এবং সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

আমরা প্রায় ২.৩ কোটি ভ্যাকসিন ইতিমধ্যেই মানুষকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। টিকাকরণের কাজে বাংলা ১ নম্বরে। টিকা বণ্টনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি উদাসীনতার বিরুদ্ধে আমাদের সরকার বহুবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। আমরা চাই বাংলার সমস্ত মানুষের টিকাকরণ হোক। ভ্যাকসিন যা পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে টিকাকরণের কাজে আমাদের রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত একশ ভাগ সফল।

আমাদের রাজ্যকে ২০২০-র মে মাসে চরম বিধ্বংসী সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আমফান-এর মুখোমুখি হতে হয়েছে, তার রেশ কাটতে-না-কাটতেই ২০২১-এর ২৬ মে ভয়ংকর সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' আছড়ে পড়ে। আমাদের সরকার দুয়ারে ত্রাণ কর্মসূচি গ্রহণ করে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে মানুষজনকে দ্রুত ত্রাণ দেওয়ার জন্য দুয়ারে ত্রাণ শিবির গঠন করেছে, যেখানে এই মানুষজন তাদের আবেদনপত্র জমা করতে পারেন এবং সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ত্রাণের টাকা পৌঁছে দেয়।

'কোভিড' ও 'ইয়াস'-এর যৌথ বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনকে এবং প্রাণীসম্পদ রক্ষার্থে সরকার বিভিন্ন উদ্ভাবনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

আমি এই মহতীসদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে সারা দেশ এবং আমাদের রাজ্যের জনগণকে পেট্রোল ও ডিজেলের ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির জন্য চরম দুঃখ ও দুর্দশায় ভুগতে হচ্ছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এই মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পেট্রোল ও ডিজেলের উপর কেন্দ্রীয় শুল্ক, সেস এবং সারচার্জ কমিয়ে মূল্য যথেষ্ট হ্রাস করার দাবি জানিয়েছেন।

এই মহতী সদন শুনে বিস্মিত হবেন যে ৪ঠা মে ২০২১ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ৮বার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে, যার মধ্যে জুন মাসেই ৬ বার বাড়িয়েছে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ৪ বার বাড়িয়েছে। এই সমস্ত মূল্য বৃদ্ধি দেশের মুদ্রাস্ফীতিও বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে সাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। ভোজ্য তেলের দাম ৩০.৮ %, ডিমের দাম ১৫.২ %, ফলফলাদি ১২% এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দামও কোভিডের মধ্যে ৮.৪৪ % বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই মহতী সদন আরও বিস্মিত হবেন জেনে যে ভারত সরকার তেল এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য থেকে ২০২০-২১ সালে কোভিডের মধ্যেও বিপুল পরিমাণে ৩.৭১ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব হিসেবে সংগ্রহ করেছে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার বিগত ছয় বছরে তেল এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের উপরে ২০১৪-১৫ সাল থেকে যে রাজস্ব সংগ্রহ করেছে তা বিপুল এবং ৩৭০ শতাংশ। এই বৃদ্ধি মূলত সেন্ট্রাল এক্সাইজ, সেস এবং সারচার্জের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফল যা আদতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে কর হিসেবে সংগ্রহ করা।

এছাড়াও ভারত সরকার ঘুর পথে সমানে সেস বৃদ্ধি করে চলেছে যাতে করে রাজ্যগুলি তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী।

আমি উল্লেখ করতে চাই যে সাধারণ মানুষের কিছুটা সুরাহার কথা ভেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যের উপর ছাড় ঘোষণা করেছে। এই মহতী সদন LPG সিলিন্ডারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কথা শুনে চমকে উঠবেন, যা দেশের গৃহস্থ ও গৃহবধূদের রান্না করার ক্ষেত্রে সরাসরি আঘাত হেনেছে। LPG সিলিন্ডারের মূল্য যেখানে ২০২০-এর মে মাসে ৫৮৪.৫০ টাকা ছিল, সেটা বেড়ে ২০২১ সালের ১লা জুলাই ৮৬১ টাকা হয়েছে, অর্থাৎ ২৭৬.৫০ টাকা বেড়ে গেছে। বিগত ১৪মাসে ৪৭ শতাংশ দাম বেড়েছে। ২০২০-র মে মাস থেকে ভারত সরকার গ্যাসের ভর্তুকি কমানো শুরু করেছে। ফলে দারিদ্রসীমার নীচে থাকা ৮ কোটি গরিব মানুষ যারা উজ্জ্বলা স্কিমের অধীনে রয়েছে তারা চরম বিপদে পড়েছে। এমনকি এই সংকুচিত অর্থনৈতিক অবস্থায় কাজ হারানো বহু মানুষ এবং মধ্যবিত্তের পক্ষেও এই বাড়তি দাম বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের সুবিধার কথা ভেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবিলম্বে পূর্বের ভর্তুকি ফিরিয়ে এনে এই খাতে অর্থবরাদ্দ বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছেন।

বিগত ১০ বছরে বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল সাফল্য এসেছে। যেখানে ২০১০-২০১১ অর্থবর্ষে রাজ্যের গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GSDP) ছিল ৪,৬০,৯৫৯ কোটি টাকা, সেখানে ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষে GSDP প্রায় ২.৯৪ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩,৫৪,৫১৮ কোটি টাকায়। ২০১০-২০১১ সালে মূলধনী ব্যয় (Capital Expenditure) ছিল ২,২২৫ কোটি টাকা, সেটাও ২০২০-২০২১ সালে প্রায় ৭.২ গুণ বেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে ১৮,১৭০ কোটি টাকায়। সামাজিক ক্ষেত্রে এই ব্যয় বরাদ্দ ২০১০-২০১১ থেকে ২০২০-২০২১-এরমধ্যে ১০.১১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে, কৃষি ও কৃষি অনুসারী ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ১০.৫ গুণ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৫.৫৮ গুণ।

বিগত ১ বছরের কোভিড-১৯ অতিমারি, 'আমফান' এবং 'ইয়াস'-এর জন্য অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও রাজ্য ফিসকাল ডেফিসিট-এর মতো অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে।

আমরা গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে যেখানে ২০২০-২০২১ অর্থবর্ষে ভারতের GDP-র বৃদ্ধি নঞর্থকভাবে ৭.৭ (-৭.৭) শতাংশে নেমে এসেছে, সেখানে বাংলার GDP সদর্থকভাবে ১.২ (+১.২) শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের এটি আরও একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

জনগণের কল্যাণসাধনই আমাদের সরকারের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের সরকার বিগত ১০ বছর ধরে জনগণের উন্নতিকল্পে এবং তাদের

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে চলেছে। এই কর্মসূচিগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

আমাদের সরকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সার্বিক সুবিধা দেওয়ার জন্য ২০২০-র ১লা ডিসেম্বর 'দুয়ারে সরকার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যাতে রাজ্যবাসী বাড়ির কাছেই সমস্ত সরকারি পরিষেবা পেতে পারেন। ২০২০-র ১লা ডিসেম্বর থেকে ২০২১-এর ৮ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়কালে পঞ্চায়েত ও বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডে ৫ দফায় ৩২,৮৩০ টিরও বেশি শিবির হয়েছে। এই শিবিরগুলিতে ২.৭৫ কোটি মানুষ উপস্থিত হয়েছেন, যা এককথায় অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব। সেখানে ১.৬২ কোটিরও বেশি যোগ্য আবেদনকারীদের পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

দুয়ারে সরকার কর্মসূচির আরও একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল সর্বজনীন স্বাস্থ্যবিমা 'স্বাস্থ্যসাথী' যা দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমরা ২ কোটিরও বেশি পরিবারকে স্বাস্থ্যসাথী বিমার আওতায় নিয়ে আসতে পেরেছি।

সমস্ত রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্যসুরক্ষার জন্য ২,২৬০টি হাসপাতালের মাধ্যমে জনপ্রতি বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা করে স্বাস্থ্যবিমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরফলে রাজ্যবাসী বিপুল চিকিৎসা খরচের হাত থেকেও যেমন রেহাই পাবেন, তেমনিই খরচের জন্য তাঁদের উপর ঋণের বোঝা থেকেও রেহাই পাবেন। এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড কাগজবিহীন, নগদহীন ও স্মার্টকার্ডভিত্তিক।

'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে রাজ্য সরকার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন, বিশেষ করে পরিকাঠামো উন্নয়ন, পরিষেবা প্রদান এবং মানবসম্পদের বিকাশের কথা ভেবে ২০২১-এর ২ জানুয়ারি 'পাড়ায় সমাধান' নামক নতুন কর্মসূচি চালু করেছে।

আমাদের সরকার জনগণের সুবিধার্থে 'দুয়ারে সরকার' এবং 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচির শিবির বছরে দুবার করে আয়োজন করবে।

আমাদের প্রিয় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই সরকার কিছু জনকল্যাণমূলক প্রকল্প শুরু করে দিয়েছে; যেগুলি হল—

১. নতুন কৃষকবন্ধু প্রকল্প

এই নবতম কৃষকবন্ধু প্রকল্পটি ১৭ই জুন, ২০২১ তারিখে চালু হয়েছে এবং কৃষকদের সুবিধা দেওয়ার কাজ রীতিমতো চলছে। এই প্রকল্পে কৃষকদের যাদের জমির পরিমাণ ১ একরের বেশি, তাদের যে বার্ষিক ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হত, তা এখন থেকে দ্বিগুণ করে ১০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এক একর বা তার কম জমির ক্ষুদ্র কৃষকদের এবং ভাগচাষীদের জমির পরিমাণের ভিত্তিতে পূর্বে বার্ষিক ন্যূনতম ২,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হত, সেই বার্ষিক আর্থিক সাহায্যের পরিমাণও দ্বিগুণ করে ন্যূনতম ৪,০০০ টাকা করা হয়েছে।

এই প্রকল্পে বার্ষিক ৩,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় ধরে প্রায় ৬২ লক্ষ কৃষককে সহায়তা দেওয়া হবে। খরিফ মরশুম ও রবি মরশুমের শুরুতে দুটি পর্যায়ে কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি এই টাকা দেওয়া হবে। এছাড়াও কৃষকবন্ধু' (মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ) প্রকল্পে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সসীমার মধ্যে কোনো কৃষকের অকালপ্রয়াণ ঘটলে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এককালীন অর্থসাহায্য করা হবে।

২. স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড স্কিম

ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুবিধার্থে আমাদের সরকার ৩০শে জুন, ২০২১ থেকে তাদের জন্য স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড স্কিম চালু করেছে, যার মাধ্যমে নামমাত্র সুদে ছাত্র প্রতি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রকল্পে ছাত্র-ছাত্রীদের শুধুমাত্র ৪ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে এবং অবশিষ্ট সুদ বাবদ অর্থ ভর্তুকি হিসাবে সরকার বহন করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই ৪ শতাংশ সুদ পড়াশুনা চলাকালীন দিতে হবে না শুধু নয়, তারা আরও ১ বছর সময় পাবে আয় শুরু হবার জন্য। এছাড়াও এই ঋণের জন্য কোনো অনুরূপ জামিন জমা রাখতে হবে না এবং রাজ্য সরকার এই ঋণের জামিনদার (গ্যারান্টার) হিসাবে থাকবে। এরফলে সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যেও ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে জীবনে সফল হওয়ার সুবিধা লাভ করবে।

৩. দুয়ারে রেশন

বাড়ির দরজায় রেশন সরবরাহের সুবিধার্থে 'দুয়ারে রেশন' কর্মসুচি ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। পাইলট প্রকল্প হিসাবে বেশকিছু জেলায় তা চালু করা হয়েছে এবং বাকি জেলাগুলিতেও শীঘ্রই চালু করা হবে। এরফলে সাধারণ মানুষের রেশন সংক্রান্ত সমস্যা দূরীভূত হবে।

৪. লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

আমাদের সরকার রাজ্যের গৃহস্থ মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামক এক প্রকল্প চালু করবে। এই প্রকল্পে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিভুক্ত মহিলারা মাসিক ১,০০০ টাকা করে পাবেন এবং তপশিলভুক্ত নন যারা

সেই সমস্ত মহিলাদের মাসিক ৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গৃহস্থ মহিলাদের ন্যূনতম আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এই প্রকল্পের টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে।

আমরা বিশ্বাস করি রাজ্যবাসীর সার্বিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমেই এরাজ্যের সামাজিক ও পরিষেবামূলক উন্নতি এবং পরিকাঠামোগত মানোন্নয়ন করে রাজ্যকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এরফলে সার্বিকভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের বিকাশ সম্ভব।

৫ই ফেব্রুয়ারি পেশ করা অন্তবর্তী বাজেটের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা আশাবাদী যে আগামী ৫ বছরে ১.৫ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারব।

প্রধান প্রধান দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দ

মহোদয়, আমি প্রধান দপ্তরগুলির প্রস্তাবিত বরাদ্দ সংক্ষেপে পেশ করছি, যা আপনার অনুমতিসাপেক্ষে পড়া হল বলে ধরে নিচ্ছি। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সরাসরি আর্থিক ও কর নীতির সংস্কারের প্রস্তাব (১৫ নং পাতা) থেকে পড়া শুরু করছি।

১. কৃষি বিভাগ

আমি, কৃষি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯,১২৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২. কৃষিজ বিপণন বিভাগ

আমি, কৃষিজ বিপণন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৯১.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩. খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

আমি, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১২,২৯৩.১৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ

আমি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২২০.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫. প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২২১.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৬. মৎস্য বিভাগ

আমি, মৎস্য বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪২৬.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৭. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৩,৯৮৩.২৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৮. সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ

আমি, সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৬৪৭.০৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৯. জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

আমি, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪৬৭.২৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১০. সমবায় বিভাগ

আমি, সমবায় বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫১৮.৪০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১১. বন বিভাগ

আমি,বন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯০১.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

আমি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৬,৩৬৮.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৩. বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

আমি, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৫,১৭০.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৪. উচ্চশিক্ষা বিভাগ

আমি,উচ্চশিক্ষা বিভাগেরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫,১৪৩.০৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৫. কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ

আমি, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৮৪.৮০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৬. যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ

আমি, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭২৭.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৭. তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ

আমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮০৪.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৮. জনশিক্ষাপ্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ

আমি, জনশিক্ষাপ্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী

অর্থবর্ষে ৩৮১.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৯. জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পানীয় জল (PH) বিভাগ

আমি, জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পানীয় জল (PHE) বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৫৭৯.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২০. পরিবহণ বিভাগ

আমি, পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৭৩৭.০৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাবকরছি।

২১. পূর্ত বিভাগ

আমি, পূর্ত বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬,৩৮৩.২৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২. ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ

আমি, ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪১৭.২৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৩. বিদ্যুৎ বিভাগ

আমি, বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৫৯৮.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৪. পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১২,৪৪৬.২২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৫. আবাসন বিভাগ

আমি, আবাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৭০.৩১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৬. মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ

আমি, মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৬,০৪৫.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৭. সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

আমি, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪,৭৭৭.৮২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৮. অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগ

আমি, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,১৭১.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৯. উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ

আমি, আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,০৬৮.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩০. শ্রম বিভাগ

আমি, শ্রম বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,০৯৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩১. স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

আমি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭১২.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩২. উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৭৬.৫১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৩. সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ

আমি, সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৭৩.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৪. পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ

আমি, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬৭২.২১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৫. স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ

আমি, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১১,৯৩৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৬. কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ

আমি, কর্মীবর্গও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৭৩.১৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৭. বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

আমি, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,১০৫.৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৮. অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ

আমি, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৩৫.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৯. সংশোধন প্রশাসন বিভাগ

আমি, সংশোধন প্রশাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৩৭.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪০. ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগ

আমি, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,১৪৪.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪১. শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগ

আমি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৯১.৯১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।।

৪২. সরকারি উদ্যোগ ও শিল্পপুনর্গঠন বিভাগ

আমি, সরকারি উদ্যোগ ও শিল্পপুনর্গঠন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে। ৭১.০৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৩. পর্যটন বিভাগ

আমি, পর্যটন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৫৭.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৪. তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ

আমি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৮৩.৫১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৫. উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ

আমি, উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১১৪.১৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৬. পরিবেশ বিভাগ

আমি, পরিবেশ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯৭.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৭. অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগ

আমি, অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৪.৩১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ

আমি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭০.১১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

আর্থিক ও কর নীতির সংস্কার :

৪.১ পণ্য ও পরিষেবা কর

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা অবহিত আছেন যে GST কাউন্সিলের অনুমোদিত সংশোধনগুলি কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়কেই চালু করতে হয়। আমি এই সদনে GST কাউন্সিলের অনুমোদিত সেইরকম ১৪টি সংশোধনীর প্রস্তাব করছি ফিন্যান্স বিলের মাধ্যমে।

৪.২ পরিবহণক্ষেত্রে রোড ট্যাক্সে ছাড়

কোভিড মহামারীর কারণে পরিবহণক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, সে কথা চিন্তা করে রাজ্য সরকার রোড ট্যাক্স এবং অতিরিক্ত ট্যাক্স ১লা জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ৩০শে জুন, ২০২১ অবধি ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল।

সেই পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন না হওয়ায় এবং এখনও পরিবহণ ক্ষেত্র আর্থিক বিপর্যয়ের ধাক্কা না কাটিয়ে ওঠায়, রোড ট্যাক্স এবং অতিরিক্ত ট্যাক্স, ১লা জুলাই, ২০২১ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২১ অবধি মকুব করার প্রস্তাব করছি।

৪.৩ স্ট্যাম্প ডিউটির হারে বিশেষ ছাড়

আমরা জানি গোটা দেশের সঙ্গে এই রাজ্যও এখন কোভিড অতিমারির কারণে এক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এরফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অনেক কমেছে। রিয়েল এস্টেট সেক্টরও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের রাজ্য সরকার জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়/লিজ প্রভৃতি দলিলের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রদেয় স্ট্যাম্প ডিউটিতে কিছুটা ছাড় দিতে চান।

আমি উক্ত দলিলগুলির ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটির হার ২ শতাংশ করে কমানোর প্রস্তাব করছি।

এছাড়াও সব ধরনের দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বাজারদর (Circle Rate) ১০ শতাংশ হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

এখন থেকে ৩০শে অক্টোবর, ২০২১-এর মধ্যে দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করলে এই দুটি সুবিধাই পাওয়া যাবে।

(৫)

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এবং এই মহতী সদনে উপস্থিত সকল মাননীয় সদস্যগণের সামনে আমি ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষে রাজ্যের জন্য ৩,০৮,৭২৭ কোটি (নেট) টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর 'কবিতাবিতান' গ্রন্থের কয়েকটি পঙক্তি স্মরণ করে –

জাগো বাংলা জাগো নব কলেবরে জাগো

সার্থক হও মাগো। পরিপূর্ণতায় তুমি জাগো॥

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০২১-২০২২

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত, ২০১৯-২০২০	বাজেট, ২০২০-২০২১	সংশোধিত, ২০২০-২০২১	বাজেট, ২০২১-২০২২
	আদায়				
১।	প্রারম্ভিক তহবিল	(-)৫.৪৫	(-)২.০০	(-)২০.০৮	(-)৩.০০
২।	রাজস্ব আদায়	১৪২৯১৪.২১	১৭৯৩৯৮.০০	১৪৫৯৭০.৯৯	১৮৬৬৮১.২৬
৩।	মূলধনখাতে আদায়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	ঋণখাতে আদায়				
	(১) সরকারি ঋণ	৭৫৬৯৮.৬৯	৭৯৪৬৫.০০	৯৩৬৭৮.৫২	১১৫৬৭২.৯২
	(২) ঋণ	৬৬.৬৭	৫০৭.০০	১৬৫.৬১	১৩৯.৩২
৫।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	৬৬১৫৬০.২৩	৭৫৫৫৬৭.৭৩	৬৭৬৩৩৬.০৫	৭৪০৮৬২.৭৫
	মোট	**৮৮০২৩৪.৩৫**	**১০১৪৯৩৫.৭৩**	**৯১৬১৩১.০৯**	**১০৪৩৩৫৩.২৫**
	ব্যায়				
৬।	রাজস্বখাতে ব্যয়	১৬২৫৭৫.১২	১৭৯৩৯৮.০০	১৮০৩১৬.০১	২১৩৪৩৬.৫২
৭।	মূলধনখাতে ব্যয়	১৫৯৭০.৫২	৩১০৪৭.০০	১৪৫১৮.১১	৩২৭৭৪.২০
৮।	ঋণখাতে ব্যয়				
	(১) সরকারি ঋণ	৪০৪১৩.০২	৪৪২৮৯.০০	৪৮৩২৭.৪৫	৬১০৪২.৬৫
	(২) ঋণ	১২৬৬.৩০	৯৪৩.০০	৩৬৫২.৪৯	১৪৭৩.৮৩
৯।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	৬৬০০২৯.৪৭	৭৫৯২৬৬.৭৩	৬৬৯৩২০.০৩	৭৩৪৬৩৩.০৫
১০।	সমাপ্তি তহবিল	(-)২০.০৮	(-)৮.০০	(-)৩.০০	(-)৭.০০
	মোট	**৮৮০২৩৪.৩৫**	**১০১৪৯৩৫.৭৩**	**৯১৬১৩১.০৯**	**১০৪৩৩৫৩.২৫**

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত, ২০১৯-২০২০	বাজেট, ২০২০-২০২১	সংশোধিত, ২০২০-২০২১	বাজেট, ২০২১-২০২২
নীটফল					
	উদ্বৃত্ত (+)				
	ঘাটতি (-)				
(ক)	রাজস্বখাতে	(-)১৯৬৬০.৯১	০.০০	(-)৩৪৩৪৫.০২	(-)২৬৭৫৫.২৬
(খ)	রাজস্বখাতের বাইরে	১৯৬৪৬.২৮	(-)৬.০০	৩৪৩৬২.১০	২৬৭৫১.২৬
(গ)	প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	(-)১৪.৬৩	(-)৬.০০	১৭.০৮	(-)৪.০০
(ঘ)	প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	(-)২০.০৮	(-)৮.০০	(-)৩.০০	(-)৭.০০
(ঙ)	নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ/				
	(১) রাজস্বখাতে	.....	.....	.....	.....
	(২) রাজস্বখাতের বাইরে	.....	.....	.....	.....
(চ)	পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাপ্য হইতে সংস্থান	.....	.....	.....	.....
(ছ)	রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	.....	.....	.....	.....
(জ)	রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)১৯৬৬০.৯১	০.০০	(-)৩৪৩৪৫.০২	(-)২৬৭৫৫.২৬
(ঝ)	নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-)২০.০৮	(-)৮.০০	(-)৩.০০	(-)৭.০০

খ্যাতির শীর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শতাব্দী প্রাচীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বছরে (২০২১) পশ্চিমবঙ্গের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় বলে স্বীকৃতি লাভ করল। শুধু তাই নয়, দেশের মধ্যে অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চতুর্থ স্থান পেল। এই স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্রের শিক্ষা দপ্তরের NIRF। NIRF অর্থাৎ ন্যাশনাল ইন্সিটিটিউটশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক। এছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন আগেই এক আন্তর্জাতিক সম্মানও লাভ করল। এই যুগপৎ স্বীকৃতিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের ভিতর এক উচ্চাসনে বসল। ২০১৫ সালে গঠিত NIRF সংস্থাটির কাজ হল দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পঠন-পাঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে কতটা কাজ করছে তা দেখা। এই নিরিখেই তাদের মূল্যায়ন করা হয়। সেই হিসাবে দেখা গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে পিছনে ফেলে দিয়ে এগিয়ে এসেছে সামনের সারিতে। রাজ্যের মধ্যেও প্রথম হওয়ার খবরটিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অত্যন্ত গর্বের।

এই ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক দেশের সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বছরে একবার মূল্যায়ন করে র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠানের পঠন-পাঠনের মান, গবেষণার মান ইত্যাদি দেখে এই র‍্যাঙ্কিং দেওয়া হয়। এই স্বীকৃতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গর্বিত করেছে। এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে কিছুদিন আগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে আর একটি নতুন উপাধি যুক্ত হওয়ার ঘটনাটি। ২০২১ সালের সাংহাই র‍্যাঙ্কিং-আকাদেমিক র‍্যাঙ্কিং অফ ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির (ARWU) বিচারের নিরিখে সারা দেশের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশের তালিকায় দেখা গেছে, তার উপরেই অর্থাৎ প্রথম স্থানে রয়েছে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স। এই খবরটিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় এক খুশির হাওয়া বইয়ে দেয়। কারণ সাংহাই র‍্যাঙ্কিং সারা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে অত্যন্ত পরিচিত নাম। এটি শুরু হয় ২০০৩ সালে।

এই সংস্থা সারা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি র‍্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তার একটি মূল্যায়ন প্রতি বছর প্রকাশ করে। এই কাজটি যথেষ্ট স্বচ্ছতার সঙ্গেই তারা করে। এছাড়াও আরও একটি নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়েও তারা পুনর্বার স্ক্রুটিনি করায় যাতে পুরো র‍্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় থাকে। তাই সাংহাই র‍্যাঙ্কিংকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। এবছর সারা পৃথিবীর ২০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০০০টি প্রতিষ্ঠান এই মেধা তালিকাভুক্ত হয়। সেই তালিকার মধ্যেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলির মধ্যে এটি খ্যাতির শীর্ষে চলে আসে। পরিশেষে বলা যায়, দু-দুটো সাড়া জাগানো খবরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়দ্যালয় আবার তার পুরনো ঐতিহ্য ফিরে পেতে চলেছে।

সাক্ষাৎকার

করোনা মোকাবিলায় সম্পূর্ণ তৈরি রাজ্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

মিউকরমাইকোসিস : করোনা রোগীর সুগার থাকলে অতিরিক্ত সাবধানতা

চিকিৎসকেরা বলছেন, কোভিডের চিকিৎসায় দ্বিতীয়-তৃতীয় বা চতুর্থ ঢেউ-এভাবে নামকরণ বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ করোনা ভাইরাস পুরোদমে রয়ে গেছে। সঙ্গে কিছু অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে বারবার ঠেলে দিয়েছে আমাদের। অন্যদিকে, কোভিডের হাত ধরে আসছে মিউকরমাইকোসিস, যা এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণ।

এই দুই বিষয় নিয়ে প্রশ্নোত্তরে দিল্লি এইমস-এর প্রাক্তনী, কলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং কলকাতার বেলেঘাটা আই. ডি. হাসপাতালের কোভিড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট বিশেষজ্ঞ ডাঃ যোগীরাজ রায়।

প্রশ্ন : প্রথমেই একটি বাস্তব সমস্যায় আসি। গ্রামীণ এলাকায় বহু মানুষ এখনও মাস্ক পরছেন না। একটু জ্বর এলেও টেস্ট করতে যাচ্ছেন না। কোভিড সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন, এমনটাও নয়। বিপদ কী তাহলে বাড়বে?

উত্তর : দেখুন বিপদ চলছে। বিপদ কিছুই কমেনি। বিপদ অস্তাচলে যায়নি। সুতরাং বিধিনিষেধ না মানলে কিন্তু সমূহ বিপদ ফিরে আসার সম্ভাবনা।

দেখুন, গ্রামীণ এলাকাতেও কিন্তু কোভিডের আক্রমণ হচ্ছে। একেবারে হচ্ছে না, তা নয়। যথেষ্টই হচ্ছে। আসলে গ্রামীণ এলাকার সঙ্গে শহর বা শহরতলীর পার্থক্য হল, গ্রামের মানুষ অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন। শহরে বহু মানুষ এক সঙ্গে বসবাস করেন। গ্রামের দিকে, হয়তো ১০টা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কারো কারো হচ্ছে। ফলে গ্রামের মানুষের মনে হয়ত তেমনভাবে করোনা দাগ কাটতে পারছে না। আসলে প্রশ্নটা এখানেই যে, আমরা মনে দাগ ফেলা অবধি অপেক্ষা করব নাকি সংযত জীবনযাপন করব। কারণ আমরা যদি সংযত জীবনযাপন না করি, তাহলে কিন্তু করোনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, আমি এসেছি। সুতরাং বিপদ রয়েই গিয়েছে।

প্রশ্ন : এই আগামীর সম্ভাবনাকেই কী ঢেউ বলা হচ্ছে? তাহলে কী তৃতীয় ঢেউ আসবেই?

উত্তর : ঢেউ বিষয়টি আপেক্ষিক। কারণ করোনা তো চলে যায়নি। ঢেউ চলছেই। যখন সংক্রমণের হার এবং সংক্রমিত হওয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকে, তখন তাকে আমরা একটা করে ঢেউ বলছি। আর এই ঢেউকে কমাতে যে বিধিনিষেধ, যে লকডাউন হয়, তখন একটা শূন্যস্থান বা গ্যাপ তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গে এক্কেবারে সাম্প্রতিক যে অবস্থা, এই যে লকডাউন বা নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ যাই বলুন, এর ফলে সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। নিষেধ উঠলে হয়ত আবার সংক্রমণ বাড়তে পারে, যাকে তৃতীয় ঢেউ বলব। এখন তৃতীয় ঢেউ আসবে নাকি দ্বিতীয় ঢেউ যেতে না যেতে তার সঙ্গে আর একটা ঢেউ মিশে গিয়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় মিলে বিরাট আকার নেবে, সেটা তো সময়ই বলতে পারবে।

প্রশ্ন : এই আগামীর সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে সরকারি পরিকাঠামো কীভাবে তৈরি হয়েছে? বিশেষ করে শিশুদের কথা ভেবে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সরকারি স্তরে?

উত্তর : সরকারি পরিকাঠামো কিন্তু, প্রথম ঢেউ-এর তুলনায় এখন অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে প্রথম ঢেউ-এর সময় যে শয্যা সংখ্যা, আই. সি. ইউ. বা ভেন্টিলেটর ব্যবস্থা ছিল, সে তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে দ্বিতীয় ঢেউ-এর সময়। আমি আমার নিজের সরকারি হাসপাতাল, বেলেঘাটা আই. ডি. হাসপাতালের কথা বলতে পারি, বেড অনেক বেড়েছে। ২০২১ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে শয্যাসংখ্যা ছিল ১২০ টি। সেটি এখন বেড়ে ৩৮০ টি করা হয়েছে। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট অর্থাৎ আই. সি. ইউ. এর সংখ্যা ছিল ৩৩ টি। সেটি এখন আরও ১০০টি বেড়েছে, অর্থাৎ ১৩৩টি হয়েছে। সারা রাজ্যের প্রতিটি সরকারি কোভিড হাসপাতালেই কিন্তু এই হারে, এই অনুপাতে, এই আঙ্গিকে শয্যা-পরিকাঠামো বেড়েছে। সেই সঙ্গে যে বারবার বলা হচ্ছে, করোনার তৃতীয় ঢেউতে শিশুরা বিশেষ করে শুধু খুদে খুদে বাচ্চারাই

আক্রান্ত হবে এমনটাও কিন্তু নয়। আসলে শিশুরা কিন্তু এই দ্বিতীয় ঢেউতেও আক্রান্ত হয়েছে, একেবারেই হয়নি তা কিন্তু নয়। তবে খুব বেশি জটিলতা তৈরি না হলে তো চিকিৎসকদের কাছে শিশুরা আসবে না বা আনা হবে না। প্রথম ঢেউয়ের তুলনায় দ্বিতীয় ঢেউতে বয়সের একটা পরিবর্তন অর্থাৎ অতি বয়স্ক বা বয়স্কদের তুলনায় কমবয়স্করা বেশি আক্রান্ত হয়েছে, এটা কিন্তু সত্য ঘটনা। আর বিশেষত শিশুদের জন্য পরিকাঠামোর কথা যদি বলা যায়, পেডিয়াট্রিক আই. সি. ইউ. কিন্তু অনেকটাই বেড়েছে। এমনকি, এখন বড়দের জন্য যে ভেন্টিলেটরগুলি রয়েছে, সেগুলি শিশুদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। শুধু একটা পরিবর্তন দরকার। বড়দের চিকিৎসকরা নয়, শিশুদের জন্য দরকার পড়বে শিশু চিকিৎসক।

প্রশ্ন : গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো কোভিড মোকাবিলায় কতটা তৈরি?

উত্তর : পরিকাঠামো অনেকটাই উন্নত হয়েছে। বিশেষ করে রাজ্যের বহু হাসপাতালে কিন্তু সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন, অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো হয়ে গেছে। বিশেষ করে যেগুলি রাজ্যের নবীন মেডিক্যাল কলেজ, যেগুলি ৪-৫ বছর বা ৭-৮ বছরের মধ্যে গড়ে উঠেছে, যেমন—রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ, রায়গঞ্জ বা মালদা মেডিক্যাল কলেজে কিন্তু এই অক্সিজেন সংক্রান্ত নতুন পরিকাঠামো বসে গেছে। আমাদের যেগুলি বহু পুরনো মেডিক্যাল কলেজ যেমন—কলেজ স্ট্রিটের কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, উত্তরবঙ্গ বা বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি জায়গাগুলি ছাড়া বাকি সব নতুন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কিন্তু পরিকাঠামো ইতিমধ্যেই তৈরি। পরিকল্পনা, ভাবনাচিন্তা না থাকলে এগুলি ধারাবাহিকভাবে হবে কেন? তবে সবটাই নির্ভর করছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ওপর। অর্থাৎ, ঢেউ শুরু না হলে বোঝা যাবে না আদৌ কতটা তৈরি হয়েছিলাম বা পরিকাঠামোর আদৌ ফাঁকফোকর রয়েছে কীনা।

প্রশ্ন : একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। করোনার টিকা। দেখুন, টিকা তো নিতেই হবে। কিন্তু নিলেই যে মুক্তি মিলবে, তা তো নয়। কারণ ভাইরাস যেভাবে বদলাচ্ছে, তাতে হয়ত দ্রুত করোনার বুস্টার ডোজও নিতে হতে পারে। দুটি প্রশ্ন—(ক) টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কিছু রয়েছে? (খ) টিকার কার্যকারিতা কতদিন, তারপর কী?

উত্তর : প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি, প্রত্যেক কিছুরই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া মেডিক্যাল সায়েন্স হয় না। তবে সেটার পেছনে কতটা বিপদ আদৌ হতে পারে, কি সমস্যা আসতে পারে সেটা দেখতে হবে। অস্থি-সংযোগের ব্যথা, সাধারণ জ্বর, গা-হাত-পা ব্যথা, গায়ে অল্প র‍্যাশ বেরোনো এগুলো হতেই পারে। দেখতে হবে, কোনও জটিল বিরূপ প্রভাব পড়ছে কীনা। কোভ্যাক্সিন, কোভিশিল্ড, স্পুটনিকের পরও বেশ কিছু নতুন টিকা ভারতে আসার সম্ভাবনা। অন্যান্য টিকা নিলে যেমন সামান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তেমনি করোনার টিকা নিলেও খুব বেশি প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, প্রতিটি টিকাই আলাদা আলাদা, 'টার্গেট' নির্ভর। আসলে ভাইরাসও তো নিজেকে অভিযোজিত করে চলেছে নিয়ত। সেও তো নিজেকে পরিবর্তন করছে। সেও তো মরতে চায় না। ফলে মানুষ ও ভাইরাসের লড়াই চলবে। কোনও টিকাই তাই, ১০০ শতাংশ কার্যকরী হবে না। হয়ত ৬০-৭০ শতাংশ কার্যকরী হবে। আবার কোনও কোনও টিকার ক্ষেত্রে, এখন যে স্ট্রেন চলছে, ৮০-৯০ ভাগ অবধি আটকানো সম্ভব। সেটা হয়ত ভাইরাস নিজেকে কিছুটা আবার পরিবর্তন করে নিলে আমরা লড়াইতে কিছুটা পিছিয়ে পড়ব। টিকা দিলে কী হবে? আসলে এই মহামারি বা অতিমারির লড়াইতে টিকা একটা বড় অস্ত্র। ভাইরাস যদি নিজেকে অভিযোজিত করে, তখন আবার টিকার ডোজ এবং মাত্রার পরিবর্তন করতে হবে। এখন মহামারি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটা টিকা নিলে মোটামুটি ৬০-৭০ শতাংশ রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতায় বলি, করোনার দ্বিতীয় ঢেউতে আমি প্রায় ১৫০০ জন জটিল করোনা রোগীর চিকিৎসা করেছি। এবং এঁদের মধ্যে ২-৩ জন ছাড়া বাকিরা কিন্তু কেউই করোনার টিকার দুটি ডোজ সম্পূর্ণ করেননি বা করতে পারেননি। অর্থাৎ টিকা নিয়ে জটিল কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা খুব কম, দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং ২ টি টিকা নেওয়ার পর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করার পর্যাপ্ত সময় যদি কেউ পান, তাহলে দেখা যাচ্ছে, টিকা যথেষ্টই কার্যকরী হচ্ছে।

প্রশ্ন : বিভিন্ন জার্নাল এবং সংবাদমাধ্যমে নানা টিকার নানা ধরনের কার্যকারিতার শতাংশ প্রকাশ হচ্ছে। কোনও টিকা ৬০-৭০ শতাংশ। কোনও টিকা ৮০ বা কোনও টিকা ৯১.৮ শতাংশ। ফলে মানুষ বিভ্রান্ত। বুঝতে পারছেন না, কোন টিকা নেওয়া ঠিক!

উত্তর : ভারতে এখন যা অবস্থা, তাতে ১৩০-১৪০ কোটি দেশের লোককে যদি প্রত্যেককে টিকা দিতে হয়, তাহলে আমরা কিন্তু এত বাছবিচারের জায়গাতেও নেই। এই যে শুনছেন, কোনও টিকা ৯৫ শতাংশ বা কোনও টিকা ৮০ শতাংশ কার্যকরী, এগুলি সবগুলিই 'Controlled Situation' অর্থাৎ 'নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি'তে দাঁড়িয়ে পাওয়া। অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষটি যখন একটি টিকা পান, তখন কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে টিকাটির কার্যকারিতা

কিছুটা হলেও কমে যায়। নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির মতো ৯৫ বা ৮০ শতাংশ ইত্যাদি থাকে না। অন্যদিকে বিভিন্ন টিকার কার্যকারিতার পরিসংখ্যান বা শতাংশের এই যে পরিসংখ্যান, এর কপচাকপচি, একজন অতি সাধারণ মানুষ হিসেবে আমার আপনার বোঝাও কিন্তু সম্ভব নয়। বরং যাঁরা বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স, বায়োটেকনোলজির ওপরের দিকে, টিকার বিষয় বা পরিসংখ্যান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, সেরকম মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ছাড়া আমজনতার এগুলো বোঝার বা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা নেই। সেই বিদ্যেবুদ্ধি সকলের নেই। তাই ভাবনাচিন্তা না করে যে টিকার আয়োজন করা হচ্ছে, তার ওপর ভরসা করে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আমি কোনও পথ দেখি না। আমি নিজেই টিকার প্রথম দিনই টিকা নিয়েছি। আবার দ্বিতীয় দিন টিকার সময় গিয়ে টিকা নিয়েছি। টিকার পছন্দ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার জায়গাতেও আমরা নেই।

প্রশ্ন : করোনা পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে, অনেকের শরীরে একটি নতুন ছত্রাকের আক্রমণ হচ্ছে, যাকে বলা হচ্ছে, মিউকরমাইকোসিস। এই ছত্রাক, কিন্তু করোনা আক্রান্তদের শরীরেই বেশি করে আক্রমণ করছে। মৃত্যুহার অনেক বেশি। এই রোগটি কেন হঠাৎ এল? আগে কী কোনওদিন এই আক্রমণ হয়েছিল? কি এর উপসর্গ? এর চিকিৎসাই বা কী?

উত্তর : প্রথমেই বলি এই যে 'কালো ছত্রাক' বা 'ব্ল্যাক ফাংগাস' বলে নতুন নামকরণ হয়েছে বা নাম দিয়ে চালানো হয়েছে, নামটাই ভুল। এর আসল নাম মিউকরমাইকোসিস। কালো কালো দেখতে বলে হয়ত কালো ছত্রাক বলা হচ্ছে। এটা নতুন কিছু রোগ নয়। শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাস সংক্রমণের পরে এই ছত্রাক অনেক সময় আক্রমণ করে। অনেক সময় ইনফ্লুয়েঞ্জার পরেও মিউকরমাইকোসিস আসতে পারে। আসলে করোনার চিকিৎসা করতে গিয়ে যেটা দেখা যাচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে অনিয়ন্ত্রিত কর্টিকোস্টেরয়েডের ব্যবহার হয়েছে। এই যথেচ্ছাচার স্টেরয়েডের ব্যবহারের ফলে বেশির ভাগ মানুষের রক্তে শর্করার মাত্রা অর্থাৎ ডায়াবেটিসের অবস্থা ভীষণ বাজে জায়গায় চলে গেছে। এই স্টেরয়েডের মাত্রাহীন এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের কথা তো কোথাও করতে বলা হয়নি। কিন্তু সেটা হওয়ার ফলে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের পরিসংখ্যান উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। সেই সঙ্গে কোভিড আই. সি. ইউ.-গুলি তো নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। কারণ করোনা নিয়ে প্রথম থেকেই একটা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কাজ করছে। এর ফলে এই রোগের ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা আরও বেড়েছে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এটি তো একটি সমান্তরাল অতিমারির পর্যায়ে চলে গেছে। আমি নিজে যখন উত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছি, তখন হয়ত বছরে ৬০-৭০ জন রোগীর দেখা পাওয়া যেত। সেটা এই করোনার সময় এক একটি প্রতিষ্ঠানে ৭০০ জনের মতো চলে আসছে। কী হারে এই রোগের আক্রমণ বেড়েছে, ভাবা যায় না। সেই সঙ্গে জানা দরকার, এই চিকিৎসা ভীষণ ব্যয়বহুল। অনেক সময় ৩-৪ মাস ধরে হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা করতে হয়। এর ফলে শয্যা ধরে রাখার পরিসংখ্যান বেড়ে যাবে। অন্যান্য বিষয়ের চিকিৎসক বিশেষ করে স্নায়ুরোগ এবং নাক কান গলার চিকিৎসকদের প্রয়োজন আরও বেশি হয়ে পড়বে। মূলত মিউকরমাইকোসিসের আক্রমণ ঘটে তিন জায়গায়। নাসিকা এবং শ্বাসনালির প্রকোষ্ঠে, ফুসফুস এবং মস্তিষ্কে। এর আক্রমণে মৃত্যুহার যথেষ্ট। যেমন নাসিকা প্রকোষ্ঠে মিউকরমাইকোসিস হলে ৬০-৭০ শতাংশ রোগীকে বাঁচানো যায় না। ফুসফুসে এই ছত্রাক হলে ৭০-৮০ শতাংশ রোগীর মৃত্যু ঘটে। আর মস্তিষ্কে যদি এই ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ে, শতকরা প্রায় সবাই বা অন্তত ৯০ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে রোগী মারা যান। মূলত অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের কারণে, কোভিডের পরবর্তী পর্যায়ে ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে। তাই করোনা থেকে সেরে ওঠার পর ডায়াবেটিসের বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক থাকা জরুরি। এই রোগের উপসর্গ হল—করোনা পরবর্তী পর্যায়ে যদি দেখা যায় অক্সিজেনের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছে, নাক বন্ধ হয়ে আসছে, মুখ ফুলে ফুলে উঠছে, অসহ্য মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে, চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, নাক দিয়ে কালো রঙের ড্যালা ড্যালা কালো কালো কিছু বের হচ্ছে, দাঁত ব্যথা ও মনে হচ্ছে যেন দাঁতের চোয়াল খুলে বেরিয়ে আসবে ইত্যাদি। সেই সঙ্গে করোনা থেকে সেরে ওঠার সময় অনিয়ন্ত্রিত সুগার দেখা গেলে ছত্রাক মিউকরমাইকোসিসের সম্ভাবনা প্রভূত বেশি।

প্রশ্ন : করোনার চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসঙ্গে আসা যাক। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR)-এর নির্দেশিকা অনুসারে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইনের ব্যবহার তো দীর্ঘদিন বন্ধ। সম্প্রতি নির্দেশিকা দিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে যে, ডক্সিসাইক্লিন এবং আইভারমেকটিনের ব্যবহারও বন্ধ। তাহলে এখন নতুন কী পদ্ধতিতে করোনার চিকিৎসা চলছে?

উত্তর : বন্ধ হয়েছে, সম্পূর্ণ ঠিক নয়। নানা মতবাদ রয়েছে। যেমন অতি সম্প্রতি 'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন' বলে একটি গবেষণাপত্র, সেটি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত, সেখানে আবার (ডক্সিসাইক্লিন ও আইভার মেকটিন)-এই কম্বিনেশন ব্যবহার করে ভাল সাফল্য আসছে, দেখা গেছে। আই সি এম আর আসলে যে নির্দেশিকা দিয়েছে, সেটি এর আগের নানা গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে।

আসলে চিকিৎসকরাও ভীষণ দিগ্‌ভ্রান্ত, কী করা উচিত, কীভাবে চিকিৎসা চালনা করা উচিত, এই বিষয়ে। তবে করোনার প্রথম দিন থেকে নানা ধরনের রোগী দেখে যেটা মনে হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি রোগ ধরা পড়া এবং অক্সিজেনের মাত্রা বজায় রাখা—এই দুটি করোনার অন্যতম অস্ত্র। অক্সিজেনের মাত্রা যদি ৯৩-এর নীচে নেমে যায় এবং শরীরে যদি করোনার উপসর্গ থাকে তাহলে দ্রুত হাসপাতালে এনে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন : করোনার চিকিৎসা এবং টীকা নিয়ে সাম্প্রতিক দুটি বিষয় উঠে আসছে। এক, করোনার টিকা এবং অ্যান্টিবডি তৈরি। দুই, করোনা নিরাময়ে অ্যান্টিবডি ককটেল। এই দুটি বিষয়ে বিস্তারিত জানান।

উত্তর : করোনার টিকা নিলেই সকলের সমান অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। দেখতে হবে অ্যান্টিবডি তৈরির কোষগুলি কতটা সুস্থ। কোনও বিশেষ রোগ বা অসুস্থতা থাকলে কিন্তু শরীরে অনাক্রমতা সেভাবে তৈরি, নাও হতে পারে। আর শুধু যে অ্যান্টিবডি-নির্ভর অনাক্রমতা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, তা কিন্তু নয়। আরও অনেক কিছুর ওপর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি, অ্যান্টিবডি উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়গুলি নির্ভর করে। সেই সঙ্গে ঠিকমতো 'কোল্ড চেন' মেনে টিকাগুলি রাখা ও দেওয়া হচ্ছে কিনা সেটাও দেখা দরকার, টিকার উপযোগিতা মাপার ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় বিষয় হল, অ্যান্টিবডি ককটেল। যা শোনা যাচ্ছে, প্রতি ডোজের দাম প্রায় ৬০-৭০ হাজার টাকা। সেই সঙ্গে সেটি করোনার হালকা উপসর্গের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে। ভারতের মতো দেশে একটা ইনজেকশন নেওয়ার জন্য ৬০-৭০ হাজার টাকা দেওয়ার ক্ষমতা, তাও শুধু হালকা উপসর্গের জন্য; এই ক্ষমতা ক'জনের আছে! আসলে এই করোনাকালে প্রচুর ওষুধ কিন্তু বাজারে এসেছে। তবে সবই মৃদু উপসর্গের জন্য। জটিল করোনারোগীর জন্য তেমন কোনও ওষুধ এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে আসেনি। তার ফলে আমরা এখন অল্প সময়ের জন্য স্টেরয়েড ব্যবহার করছি। নিশ্চিত না হলেও, যেহেতু এখনও ব্যবহারের ছাড়পত্র রয়েছে, সেগুলিও ব্যবহার হচ্ছে। থ্রম্বোসিস বা রক্ত জমাট বাঁধা বন্ধ করতে বিশেষ কিছু ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। আসলে আমাদের হাতে যা অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে, সে তুলনায় অ্যান্টি ফ্যাংগাল ওষুধ খুব কম। অ্যান্টি ভাইরাল আরও কম। বলতে গেলে করোনা নিরাময়ে অ্যান্টিভাইরাল এখনও পাইনি।

প্রশ্ন : 'কোল্ড চেন' অর্থাৎ সঠিক তাপমাত্রা বজায় রেখে দেশ বা রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে কী টিকা দেওয়া সম্ভব?

উত্তর : অসম্ভবের কোনও জায়গাই নেই। যে টিকা যে তাপমাত্রায়, রাখা ও দেওয়া দরকার, সেটা সেই তাপমাত্রা বজায় রেখেই দিতে হবে। সেটাই হচ্ছে। যে কারণে দু-একটি টিকা, যেটি -৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সংরক্ষণ করা দরকার, সেই টিকা ভারতে আনা বা দেওয়া হচ্ছে না। সুতরাং টিকার কার্যকারিতা, পূর্ণমাত্রায় পেতে গেলে সঠিক তাপমাত্রা অর্থাৎ 'কোল্ড চেন' বজায় রাখতেই হবে। এর কোনও বিকল্পই নেই। না হলে, টিকা কোনও কাজেই আসবে না।

প্রশ্ন : শেষ প্রশ্ন। করোনার প্রথম দিন থেকে প্রথম সারিতে যোদ্ধার মতো লড়াই করে বহু মানুষকে নিজের হাতে সুস্থ করেছেন। আবার এই সময়েই বহু সতীর্থ, নিকটাত্মীয়, সহযোদ্ধা বা নিজের শিক্ষক-চিকিৎসককেও হয়ত হারিয়েছেন। এর পরেও রোজ ছুটছেন। এই উৎসাহের উৎস কী? মানুষকে কী বার্তা দিতে চান?

উত্তর : এটা তো আমাদের কাজ। আমরা ছাড়া কে করবে! তবে যেদিন দেখি, আই সি ইউ-তে একদিন ৭-৮ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে কিংবা সুস্থ হতে হতে হঠাৎ কোনও রোগীর মৃত্যু ঘটে গেল—তখন তো মনে হতাশা আসেই। কারণ আমরাও তো মানুষ। খুবই মুষড়ে পড়ি তখন। আবার উঠে দাঁড়াই। যদি এই দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রেক্ষিতে ভারতীয় ভাবনায় নিজেকে একটি বৃহৎ পরিবারের অর্থাৎ বাবা, মা ছাড়াও মাসি, পিসি, মেসো, কাকা, জ্যাঠামশাই ইত্যাদি সকলকে নিয়ে সদস্য বলে মনে করেন, তাহলে কোভিড কিন্তু সেই প্রতিটি পরিবারকেই আঘাত করেছে। এমন কোনও পরিবার পাওয়া খুবই দুষ্কর, যেখানে এই দ্বিতীয় ঢেউতে করোনার আক্রমণ ঘটেনি। তাই ক্লান্ত লাগে। শুধু আমি কেন, করোনার চিকিৎসা যাঁরা করছেন, প্রত্যেকে আজ ক্লান্ত, শ্রান্ত। আমরা, চিকিৎসকরা জানি না, কতদিন এই লড়াই চালাতে পারব। মাঝেমধ্যে মনোবিদদের সঙ্গেও কথা বলতে হচ্ছে।

মানুষকে একটাই বার্তা দেওয়ার। করোনা রয়েছে। করোনা ভরপুর রয়েছে। হঠাৎ আপনাকে বা আপনার বাড়ির লোককে আক্রমণ করতেই পারে। উপসর্গ দেখলেই আলাদা হয়ে যান এবং চিকিৎসা শুরু করুন। যে হাসপাতাল পাবেন, ভর্তি হয়ে চিকিৎসকদের লড়াইটা করার সুযোগ দিন।

সাক্ষাৎকার : রাতুল দত্ত, সহ-সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ।

বঙ্গদর্শন

বঙ্গদর্শন বিভাগে রাজ্যের নানা প্রান্তের নানাবিধ বিষয়ে প্রতিবেদন, নিবন্ধ ও তথ্য প্রকাশিত হয়। এই বিভাগে নতুন সংযোজন হচ্ছে **'আমার জেলা'**, রাজ্যের ২৩টি জেলাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে 'আঞ্চলিক ইতিহাস'-কে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে আমার জেলার ভূমিকা হয়ে উঠুক উজ্জ্বল। এই রাজ্যের আনাচে-কানাচে ইতিহাস মুখ লুকিয়ে রেখেছে। এরই মধ্যে ধরা আছে এই অঞ্চলের অতীত ঐতিহ্যের পরম্পরা। উৎসুক মন জানতে চায় ইতিহাস গড়ে ওঠার খুঁটিনাটিও। ভাঙাগড়ার খেলা চলতেই থাকে। তারই মাঝে ধরা থাকে পরিবর্তনের পালার নানা কাহিনি, ছবি। 'আমার জেলা'—এই পালাবদলের কথাই তুলে ধরছে বিশিষ্ট লেখকদের কলমে।

পুজোর গন্ধে মেতেছে মানুষ

পুজোর গন্ধ নিয়ে আসে শিউলি, শরৎ, কুমোরের উঠোনের সার সার দুর্গার মাটি লেপা কাঠামো। আনে আকাশের নীল সাদা মেঘ। আর কাশফুল।

বাঙালির সারা বছরের প্রতীক্ষা এই পুজোর জন্য। পুজোর ছুটির জন্য। ঘরে ফেরার জন্য।

দলবেঁধে ঠাকুরদেখা। সে কী কম মজার। পুজো মানে আনন্দ। আগমনীর সুর বাজে। মনের মধ্যে। উমা আসবেন ঘরের মেয়ে হয়ে। ছেলেপুলে নিয়ে। ঘর গেরস্থালি সেজে ওঠে। রঙ লাগে দেওয়ালে। ঝাড়াপোছার কাজ চলে। সরে যায় ধুলোমাখা পর্দা। চাদর। নতুন বা ধোয়াকাচা জিনিসে ঝকঝক করে সব। যার যেমন সামর্থ্য তার তেমন আয়োজন। বচ্ছরকার দিন। ধূলিমলিন জীবনের সব অন্ধকার দূর হোক। মায়ের আশীর্বাদে।

পুজো মানে দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজো মানেই বাঙালিত্ব। একথা নতুন করে বলার নয়। পুজোর আনন্দে ভেসে যাওয়া বাঙালির হক। পুজোয় যাদের বিশ্বাস আছে, ভালোলাগা আছে, পুজো তাদের কাছে উৎসব হয়ে ওঠে। যে ধর্মেরই মানুষ হোক না কেন উৎসবে তিনি সামিল হন। সামিল হতে পারেন। দুর্গোৎসব তো হাজার কাজের রাজসূয় যজ্ঞ যেন। নানা ধর্মের, নানা বর্ণের মানুষ জুড়ে যান পেশার টানে, নেশার টানে, পেটের টানে। আনন্দ তো এখানেই।

দুর্গাপুজোর আয়োজকরাও সারা বছর অপেক্ষায় থাকে। ছোট করে একটি পুজোর আয়োজন মানে বেশ বড়ো খরচের বহর। কর্মকর্তাদের মুখে চিন্তার ভাঁজ। এখন আর চাঁদার জন্য কোনও জোরজুলুম করা যায় না। প্রশাসন এব্যাপারে খুব কড়া। অগত্যা সরকারের সাহায্যের জন্য বসে থাকা। সেই নিয়েই নমো নমো করে পুজো সারতে হবে। পুজো মানে এখন দুমদাম করে যা কিছু করা নয়। থানা পুলিশের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রেখে চলা। হাজারো নিয়ম কানুন। আলোচনাসভা। কোর্টের নির্দেশ মন দিয়ে শোনা। বোঝা। কতরকম গাইড। আবার করোনার জন্য নানা বিধিনিষেধ মানার ব্যবস্থা করা।

পুজো হল এবছরও। কোথাও নিয়মরক্ষার। কোথাও আয়োজনের সব বাড়বাড়ন্ত ঝেড়ে ফেলে।

বিশেষ নিবন্ধ

পর্যটন শিল্পে করোনার থাবা

বামাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

করোনার প্রথম ঢেউ থেকে দ্বিতীয় ঢেউ পর্যন্ত সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পর্যটন শিল্প। আবার তৃতীয় ঢেউ আসছে। কবে ঢেউ আসা বন্ধ হবে আর কবে মানুষ ঘর থেকে ভ্রমণমুখী হবেন তার কোনো নির্দিষ্ট রূপরেখা কারুর কাছে নেই। বিশ্ব মানচিত্রে যতগুলো পর্যটন স্থান আছে সকলের চিত্রই মোটামুটি একই রকম। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা সকলেই দীর্ঘ অনিশ্চিত-এর মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ করোনা ভাইরাসের প্রকোপে জর্জরিত। আমাদের রাজ্য করোনাকে জয় করতে পারবে আশা করছি। করোনার প্রকোপ থেকে রাজ্যবাসীকে সুরক্ষিত রাখার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে যে ভাবে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এই করোনা ভাইরাসের জন্য ভারতসহ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে ধাক্কা খেয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পে যদি একটা রূপরেখা তৈরি করা হয়, দেখা যাবে সব শিল্পের পাশাপাশি পর্যটনশিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অন্যান্য শিল্প সরাসরি যুক্ত থাকলেও পর্যটন শিল্প কিন্তু যুক্ত নয়, পর্যটন শিল্প একটি ভিন্ন ধারার শিল্প, এই শিল্পের উৎপাদন নেই,প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারে আছে। কিন্তু জীবনধারার মূলস্রোতে কিন্তু রয়ে গেছে পর্যটন শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বছরে একবার বা দুবার হোক ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। রাজ্য, ছাড়িয়ে বিদেশেও পাড়ি জমাচ্ছে বাঙালি।

পর্যটন শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনেক বড়ো বড়ো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তন আসে। পরিবর্তন আসে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেই পরিবর্তনের ধারাতেই রাজ্য পর্যটনের উন্নতি ও প্রসারে, বলতে গেলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সরকার। সরকারের প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেন। ২০১৪-র পর থেকে এই রাজ্যে আস্তে আস্তে পর্যটন শিল্পের নানাভাবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। ২০১৯ সারা বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে ভারত যখন টুরিজম-এর বিচারে ৩৪ নম্বর স্থানে চলে আসে সেই সময় প্রতিটি রাজ্যকে পাল্লা দিয়ে এই রাজ্য উঠেছিল সপ্তম স্থানে। পেছনে ফেলে দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থানকে।

সেই বছর থেকেই বাংলায় পর্যটক আনার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে একটি সমন্বয়কারী দল তৈরি করেছিল রাজ্য। ১৪টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি হয় সেই দলটি। বিদেশি পর্যটকদের আনার ক্ষেত্রে রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতা করে এই সমন্বয়কারী দল। ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন তথ্য অনুযায়ী দেশে পর্যটনকে কেন্দ্র করে আয় বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। ২০১৭ সালে পর্যটন থেকে আয় বাড়তে শুরু করে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুন এর মধ্যে দেশে পর্যটন ক্ষেত্রে ৯৫,৭১৩ কোটি টাকা আয় হয়েছিল। অন্তর্দেশীয় পর্যটকদের আনাগোনায় প্রথম ১০ টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল ষষ্ঠ। সেই বছরই বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনায়

এরাজ্যর অবস্থান ছিল ষষ্ঠ। সেই সময় রাজ্য সরকার অভিনেতা শাহরুখ খানকে রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করেন। এখনো পর্যন্ত বিদেশে বিশেষ করে ইউরোপে ইযুরো টি ভি চ্যানেলের মাধ্যমে রাজ্যের বেশকিছু স্থানকে বিদেশি মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়।

রাজ্য সরকার গড়ে তুলেছে ডেস্টিনেশন ইস্ট নামে এক প্রকল্প। রাজ্যের আনাচে-কানাচে কত বৈচিত্র ছড়িয়ে রয়েছে তা বলার নয়। এর ইতিহাস যেমন প্রাচীন এবং সুখপাঠ্য তেমনি এর স্থান-মাহাত্ম্য রয়েছে। এই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এত দেখার এবং উপভোগ করার মতো জায়গা রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিদেশি পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এই ডেস্টিনেশন ইস্ট তৈরি করা হয়। এই উদ্যোগের পেছনে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি।

রাজ্য সরকার একটি নতুন প্রকল্প নিয়েছিলেন পরিবেশবান্ধব বা পর্যটন বান্ধব। পরিবেশবান্ধব-এর কাজ ছিল যে সমস্ত অঞ্চলে মানুষ ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন এই অঞ্চলে ইকোলজিকাল ব্যালেন্স যাতে নষ্ট না হয় সেটাই দেখার তাদের লক্ষ্য। সেই সঙ্গে পর্যটন বান্ধবদের কাজ পর্যটকদের আতিথেয়তা এবং একটা সুরক্ষা বলয় তৈরি করা। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুসারে, রাজ্যের পর্যটন শিল্পের মোট আয় আনুপাতিক হারে ক্রমশ বেড়েই চলছিল। এই বিবেচনার দুটো কারণ আছে। প্রথমত, উত্তর-

পূর্ব ভারতের অনেক এলাকার পরিস্থিতি পর্যটকদের ও পর্যটনের অনুকূল নয়। বিহার বা ঝাড়খন্ড অথবা ওড়িশার মতো রাজ্যগুলো পর্যটন উন্নয়নে সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে রাজ্যের নিজস্ব। রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নত। রাস্তাঘাটের উন্নতি না হলে পর্যটনের উন্নতি হয় না। যশ পরবর্তীকালে দীঘা মন্দারমনি কয়েক মাসের মধ্যে আবার নতুনভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে দিঘা ও দার্জিলিং জেলার সৌন্দর্য রক্ষার বাড়তি নজরও কার্যকর হয়েছে। ডুয়ার্সের জঙ্গলগুলো যেভাবে সেজে উঠেছে এককথায় অনবদ্য। ডুয়ার্সের নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র পর্যন্ত গড়ে তোলা হচ্ছে। ডুয়ার্সকে জনপ্রিয় করার জন্য বিদেশি ও অন্য রাজ্যের মানুষরা এসে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

এই লকডাউন-এর পরিস্থিতিতেও রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন উত্তরবঙ্গে গিয়ে নতুন নতুন পরিকল্পনার কথা উত্তরবঙ্গের মানুষকে জানিয়ে এসেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প হল গাজলডোবার পর্যটন হাব। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'ভোরের আলো'। গাজলডোবায় 'ভোরের আলো 'সেজে উঠছে জোরকদমে। তৈরি হয়েছে ৬টি সরকারি কটেজ। আরও ২০টির কাজ চলছে। এরই মধ্যে আবার নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু পরিকল্পনা। তিস্তা থেকে মংপো পর্যন্ত রাফটিংয়ের কথা ভাবা হচ্ছে। তিস্তা সেচখালে প্যাডেলিং বোট নামানো হবে। তিস্তার কোলে এখন স্থানীয় স্তরে নৌকাবিহারের ব্যবস্থা রয়েছে। সেই নৌকাগুলি পর্যটন দপ্তর সাজিয়ে দেবে। রঙিন ছাউনি দিয়ে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হবে। একদিকে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল, একদিকে তিস্তা সেচখাল, তিস্তায়

বিশাল বাঁধ এবং জলাধার। উত্তরে তাকালেই হিমালয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা। এ ছাড়া হচ্ছে হেলিপ্যাড। রয়েছে আরও বহু বিনোদনের আয়োজন। যেমন হট এয়ার বেলুন। গাজলডোবা থেকে সরস্বতীপুর চা-বাগান পর্যন্ত জঙ্গলের ভেতর দিয়ে জঙ্গল সাফারি, হাতি সাফারির পথ করবে বন দপ্তর। গাজলডোবায় তিস্তার ওপর হচ্ছে আরেকটি সেতু। পর্যটকদের জাতীয় অসুবিধে না হয় তার জন্য স্থায়ী থানা হচ্ছে গাজলডোবায়। প্রকল্প এলাকায় অর্কিড পার্ক করা হবে। দুটি হাউসবোট আনা হবে। একটি রাখা হবে মিরিকের লেকে। গাজলডোবায় ফুড অ্যান্ড ক্রাফ্ট ইনস্টিটিউট খোলা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এখানে হোটেল ম্যানেজমেন্টের ধাঁচে কোর্স চালু হবে।

এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও শুনতে অবাক লাগলেও রাজ্যের পর্যটনকেন্দ্রগুলোর নিজস্ব হোটেলে ৬৪ শতাংশ ব্যবসা করেছে। সেভেন ওয়ান্ডার্স অব দা ওয়ার্ল্ড মানে বিশ্বে সাতটি বিস্ময়কর স্থান আছে। তেমনি এ রাজ্যের সাতটি বিস্ময়কর স্থান হিসেবে পর্যটন স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে আছে সুন্দরবন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, দার্জিলিং হিমালয়ান রেল, বিষ্ণুপুর, বোটানিক্যাল গার্ডেন, হাওড়া ব্রিজ, বিবাদীবাগ।

এ তো গেল সরকারি হিসাব নিকাশ। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও বেসরকারিভাবে নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। হরিপালের দ্বারহাট্টা, ঘটকপুকুর, শিউলিবনা, শুশুনিয়া, মাঠার রূপসী বাংলা, সীতারামপুরে বাইকার্স ক্যাম্প, শালবনি, বড়ন্তি, বুরুল, মেদিনীপুরের লাল কাঁকড়া বিচ, নর্থ বেঙ্গলের দিকে ঝালং খোলা, সালাম বঙ্গ, বাতাবারি, অজয় নদীর তীরে মন্দিরা, জি

প্লটে ঝাউমন, মৌসুনী আইল্যান্ড এছাড়া আরো বেশ কয়েকটি নতুন টুরিস্ট স্পট তৈরি হয়েছে। ভারতবর্ষের অর্থনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গত ২ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ ১৭ হাজার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, পর্যটনবান্ধব পরিবেশের কথা। সেভাবেই রাজ্যে অনেক ছোট ছোট সুন্দর পর্যটনস্থল গড়ে উঠেছে। রাজ্যের প্রচেষ্টায় ২০১৬ সাল থেকে বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে এই রাজ্য স্থান করে নিয়েছে। বিদেশি পর্যটক এবং বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটকরা পশ্চিমবঙ্গে ভীষণভাবে ভিড় করছেন। এটা রাজ্যের সাফল্য। এটা আমাদের মতো যারা পর্যটনের সঙ্গে জীবনজীবিকাকে জুড়ে দিয়েছি তাঁদেরও সাফল্য। ২০১৮ হিসেবে শুধুমাত্র পুজোর সময় পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩ হাজার বিদেশি পর্যটক এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের গর্ব দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গের গর্ব সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গের গর্ব ডুয়ার্স, দীঘা, মন্দারমনি তাজপুর, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের হিসেব বলছে, ২০১৮ জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত গোটা দেশের মোট বিদেশি পর্যটকের পাঁচ শতাংশ কলকাতা বিমানবন্দর দিয়ে ভারতে এসেছেন। ২০১৭ সাল থেকে যা বেশ খানিকটা বেশি। অ্যাপ ক্যাব সংস্থা উবেরও জানাচ্ছে, কলকাতায় তাদের বিদেশি যাত্রী বেড়েছে।

উবের-এর 'হাউ ইন্ডিয়া মুভড ইন ২০১৯' শীর্ষক এক সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে—সারা দেশের পাঁচটি শহরে উবের সর্বাধিক বিদেশি পর্যটক পেয়েছে। এই তালিকায় আছে কলকাতার নাম। এই তথ্যগুলো আসলে কী ভাবে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্প বেড়ে উঠছিল তারই একটি রূপরেখা মাত্র।

করোনার জন্য প্রথম লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্প ধাক্কা খেতে শুরু করল। রাজ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে ছিল ডুয়ার্স আর দার্জিলিং জেলা। ভুটানের প্রবেশের দরজা হলো ডুয়ার্স। ডোর শব্দ থেকে ডুয়ার্স। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ জঙ্গলভূমি তখন সবেমাত্র সাজ সাজ রব। তিস্তা থেকে সংকোশ নদী পর্যন্ত করোনা আসার আগে প্রায়

১০০টি হোটেল সুন্দরভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করছিল। প্রতিদিনই আনাগোনা ছিল দুই থেকে আড়াই হাজার পর্যটকের। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১,৮৬,০০০ মানুষ যুক্ত ছিলেন। করোনার জন্য ২০২১ সালের মে মাস পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা। প্রতি বছর গড়ে প্রায় দশ লাখ মানুষ উত্তরবঙ্গে বেড়াতে যান । এর মধ্যে প্রায় দেড় থেকে দু লাখ বিদেশি পর্যটক। এই করোনা আবহে বিদেশি পর্যটক তো দূর অস্ত, রাজ্যের পর্যটকদেরও দেখা নেই। উত্তরবঙ্গের প্রায় কুড়ি লাখ মানুষ পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। কিন্তু বারবার করোনার ধাক্কায় সেখানকার পর্যটন শিল্প আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান পর্যটন মহল। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটন শিল্প নির্ভর করে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যটকদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যটকদের উপরেও। সব স্বাভাবিক থাকলে পরে প্রতিদিন গড়ে নয় কোটি টাকার ব্যবসা হয়ে থাকে। যা এখন প্রায় শূন্যের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পর্যটনের সঙ্গে জড়িত পরিবহণ ব্যবসায়ী এবং হোটেল ব্যবসায়ীদের পরিস্থিতি শোচনীয়। প্রায় কুড়ি হাজার ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী এবং প্রায় দশ হাজার হোটেল ও হোমস্টে ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়ে গিয়েছে। এই তথ্য জানিয়েছেন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব। তিনি আরো বলেন, উত্তরের পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম বেঙ্গল সাফারি পার্ক, গজলডোবা ভোরের আলো, বোদাগঞ্জের ভ্রামরী দেবীর মন্দির, মহানন্দা অভয়ারণ্য, জলদাপাড়া অভয়ারণ্য, সিকিমের নাথুলা, দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্ক, টাইগার হিল-সহ একাধিক জায়গা এখন পর্যটকশূন্য। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত কর্মীরা এখন চাষাবাদ অথবা বেসরকারি সংস্থার চাকরিতে যোগ দিতে শুরু করেছেন।

উত্তরবঙ্গ পর্যটনের জন্য যতটা উন্নতি করেছে সেই তুলনায় কলকাতার কাছে সুন্দরবন কিন্তু তুলনামূলকভাবে ততটা উন্নতি হয়নি। উন্নতি না হলেও সুন্দরবনের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুসারে বছরে দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পর্যটক ভিড় করেন সুন্দরবনে। প্রতিবছর ৩০ হাজার করে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে। পর্যটনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলো যেমন লঞ্চ মালিক, ট্রাভেল এজেন্ট, লঞ্চ চালক, হোটেল মালিক এরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। সেইসঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতি বিরাট ভাবে ধাক্কা খেয়েছে করোনা, আম্ফান, যশ আসার ফলে।

আপনি ভারতের যেখানেই ভ্রমণ করতে যাবেন বাঙালি পাবেন। সে ছোট হোক কিম্বা বড়ো ভ্রমণ স্পট হোক। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ট্রাভেল এজেন্ট-এর সংখ্যা অনেক বেশি। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল। পর্যটন শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে ট্রাভেল এজেন্টরা। এরাই দেশ ও বিদেশ ভ্রমণ করতে নিয়ে যান মানুষদের। ট্রেনে বা বিমানে টিকিট থেকে শুরু করে হোটেল বুকিং এমনকি বাঙালির রস আস্বাদনের জন্য এখান থেকে রান্নার ঠাকুর পর্যন্ত নিয়ে যান রাজ্যের বাইরে। এই ছোটো ছোটো পর্যটন সংস্থা গুলো বলতে গেলে কোমায় চলে গেছে। বহু

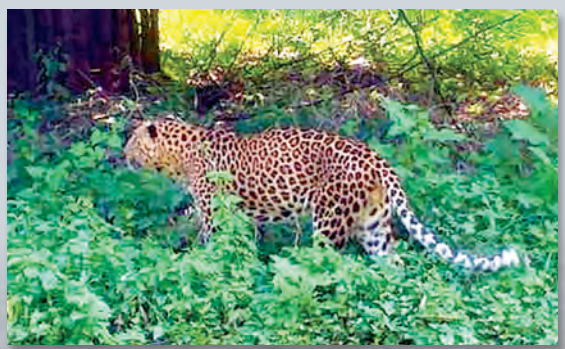

মানুষ কর্মহীন। বহু পর্যটন সংস্থার মালিককে জীবনধারণের জন্য বেছে নিতে হয়েছে বিভিন্ন পন্থা। কেউ মুদির দোকান করেছেন, কেউ কাঁচামাল বিক্রি করছেন, কেউবা রাস্তার ধারে ছোটো ছোটো রেস্টুরেন্ট খুলেছেন। এক কথায় বলা যেতে পারে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাভেল এজেন্ট, হোটেল মালিক, গাড়ির মালিকেরা। সেই সঙ্গে ট্যুর অপারেটরদের যুক্ত কর্মীরা।

ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানস মহাপাত্র বলেন, সার্বিকভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটন শিল্প। পর্যটন শিল্পের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোনের ব্যবস্থা করেছে। এটি একটি ভালো পদক্ষেপ। কিন্তু লোনমুখি হতে চাইছেন না ট্রাভেল এজেন্টরা। ঋণ করে হয়তো টাকা পাওয়া যাবে কিন্তু সে টাকা দিয়ে কীভাবে তাঁরা ব্যবসা করবেন? করোনার প্রভাব এতটাই তীব্র যে মানুষকে ঘর থেকে বের করা বড়ো মুশকিল। আমাদের সঙ্গে আগামী এক বছর করোনার ভয়ে মানুষ ভ্রমণ করতে যাবেন কিনা সন্দেহ আছে। কয়েক লক্ষ মানুষ কর্মহীন। তাঁরা পরিবার চালাবে কি করে? ওষুধের পয়সা, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটির টাকা কোথা থেকে জোগাড় করবে? এই বিশ্ব বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের লড়াই করবার কোনও জায়গা নেই।

এবার আসি ভারতে

দেশে কর্মসংস্থানের সঙ্গে এই পর্যটন ব্যবসায় যুক্ত আছেন ৮.১ শতাংশ মানুষ। পর্যটনের সঙ্গে যদি পর্যটনের অনুসারী শিল্পকে যুক্ত করা হয় তাহলে এই সংখ্যাটা আরো বেড়ে যাবে। ভারতে ভ্রমণ ও পর্যটন খাত ২০১৯ আর্থিক বছরে ৮৮ মিলিয়নেরও বেশি লোকের কর্মসংস্থান করেছে। ২০১৯ সালে, সর্বোচ্চ অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের রাজ্য ছিল উত্তরপ্রদেশ, যেখানে ৫৩৫ মিলিয়নেরও বেশি পর্যটক ভিজিট করেছে। করার কারণও আছে। পর্যটনকে যদি দুটো ভাগে ভাগ করা হয় তার একটি ভাগ রয়েছে বিনোদন স্থাপত্য, অন্যদিকে রয়েছে ধর্মীয় পর্যটন। উত্তরপ্রদেশের রয়েছে আগ্রা, মথুরা-বৃন্দাবন, বারানসি, লখনউ, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, সারনাথ। উত্তর ভারত ভ্রমণের মূল রসদ রয়ে গেছে উত্তরপ্রদেশে। বাঙালি মানসিকতায় উত্তরপ্রদেশের পর ধর্মীয় পর্যটন বেশি ভিড় থাকত হরিদ্বার থেকে চারধাম। প্রথম করোনা ভাইরাসের প্রকোপ এর পরেও চারধাম খোলা ছিল। ট্রেন চলাচল না করার জন্য বাঙালি পর্যটনের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আসার পর চারধাম পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবছর মে মাসে কলকাতার পর্যটন সংস্থার কাছে প্রচুর বুকিং ছিল চার ধামের। এবছর এপ্রিল ও মে জুন মাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পর্যটন শিল্প। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি সংস্থার কর্ণধার দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘এপ্রিল মে জুন মাসের ভ্রমণের জন্য আমরা আমাদের গচ্ছিত মূলধন থেকে বিমানের টিকিট এবং রেলের টিকিট কেটেছি, বিভিন্ন হোটেলকে, গাড়িকে অগ্রিম টাকা পাঠিয়েছি। ট্রাভেল এজেন্ট-এর হাতে কানাকড়ি পর্যন্ত নেই। হোটেল ব্যবসায়ীরা তাদের লিজ মানি দিতে পারছেন না।

ট্যুরিজম এর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত গাড়ির মালিকরা তারা ব্যাংকের ঋণ শোধ করতে পারছেন না। দুবছর ধরে কোনও কাজ নেই'। রাজ্য সরকার ঋণের ব্যবস্থা করলেও কেন্দ্রীয় সরকার পর্যটন শিল্পের জন্য নতুনভাবে কোনওরকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। এমএসএমই (MSME)-র মাধ্যমে যে ঋণের কথা বলা হয়েছিল সে ঋণ কোনওভাবে পর্যটন কর্মীদের কাজে আসেনি। দেশের অর্থমন্ত্রক বিভিন্ন শিল্পের জন্য, বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বিনিয়োগের কথা বলেছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত পর্যটন শিল্পের জন্য নানান প্যাকেজ থাকলেও কোনও রকম আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়নি। যে প্যাকেজগুলি অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন আপাতদৃষ্টিতে শুনতে ভালো লাগলোও তাতে কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের উদ্যোগে 'দেখো আপনা দেশ' সিরিজের আওতায় 'আনলক পর্ব এবং কোভিডের সময় নিরাপদে, দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে ভ্রমণ ও পর্যটন' শীর্ষক ৩৯তম ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়েছিল।

আলোচনায় মহামারী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যচিত্র এবং সুরক্ষা বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরা হয়। পর্যটক এবং এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাস এবং অন্যান্য পরিবহন ক্ষেত্রে সুরক্ষা গ্রহণ, আতিথেয়তার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, প্যাকেটজাত খাবার পরিবেশন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি পর্যটনস্থলে ভ্রমণের সময় পর্যটকদের অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, হোটেলের ঘরে জীবানুনাশক স্প্রে করা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া প্রয়োজন বলেও বক্তারা আলোচনায় জানান। ভারত কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার প্রতিটি নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধ। এই সময়ের মধ্যে পর্যটনের জন্য গাইডলাইন ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার। দেশের অর্থনীতির বিকাশে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পর্যটন ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই দেশের পর্যটনের বিকাশে সরকার সব সময় গুরুত্ব দিয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে পর্যটকদের কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় তা নিয়েও আলোচনা হয়। কিন্তু সে আলোচনা আলোচনার মধ্যেই যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে কোভিড-পরবর্তী পর্যটন কর্মীদের কী আশার আলো তারা দেখাচ্ছেন?

রাজ্য থেকে বহু পর্যটক বিদেশ ভ্রমণে পাড়ি দেন। তার সংখ্যাটাও খুব একটা কম নয়। এই রাজ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি ট্যুরিজম সংস্থা যারা শুধুমাত্র বিদেশ ভ্রমণ করায়। গত দু 'বছরে বেশ কয়েকটি বড়ো সংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু সংস্থার কর্মী ছাঁটাই করে অল্প অল্প কাজ করছে। লকডাউন পরিস্থিতিতে বিদেশ বলতে একমাত্র মালদ্বীপ। আর কোনও দেশে কীভাবে প্রবেশ করা

যাচ্ছে না। করোনার প্রথম ঢেউয়ের পরে আনলক পর্বে দুবাই ইজিপ্ট রাশিয়া কিছুটা খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পর্যটক কোথায়? কোন দেশে করোনার জন্য নতুন কী আইন প্রণয়ন হচ্ছে সেটাই এখন মানুষ বুঝতে পারছেন না। সকলের মনেই এক আতঙ্ক, বিদেশে গিয়ে আটকে পড়বো না তো?

বাড়ির কাছে বিদেশ বলতে সবচেয়ে কাছে ভুটান, বাংলাদেশ ও নেপাল। উত্তরবঙ্গের জয়গাঁও থেকে প্রতিদিন ভুটানের ফুন্টসেলিং পর্যটকদের যাতায়াত ছিল প্রায় ২৫ হাজার। দুই হাজার কুড়ি সালে ৬ই মার্চ থেকে। সমস্ত পর্যটকদের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হলো। সেই বছরই একুশে এপ্রিল ভুটানের গেটে তালা পড়ে যায়। প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গের জয়গাঁও থেকে দেড় লক্ষ মানুষ ভুটানে প্রবেশ করতেন। যে জয়গাঁও-তে এক সময় ছিল মানুষের উপচে পড়া ভিড় এখন সেখানে স্তব্ধতার বাতাবরণ। রাজ্যের এই অঞ্চলে প্রায় ১০০ ট্রাভেল এজেন্ট ছিলেন। জয়গাঁও ট্রাভেল এজেন্ট-র এক মুখপাত্র জানান, বেশিরভাগ ট্রাভেল এজেন্ট অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। কেউ গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন কেউ তাদের নিজস্ব গাড়ি, জমি বিক্রি করে কোনও রকমে দিন গুজরান করছেন।

নেপাল কিন্তু ভারতীয়দের জন্য পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়নি। দ্বিতীয় লকডাউন-এর পর থেকে যদিও খুব কম সংখ্যক পর্যটক নেপালে গিয়েছেন। আর কলকাতার কাছে বাংলাদেশ এখন বর্ডার বন্ধ করে রাখা আছে। ভারত থেকে বাংলাদেশের যত সংখ্যক মানুষ যেতেন তার দশগুণ মানুষ বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসেন। জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মতে, ২০১৯ সালে ৫০ মিলিয়ন ভারতীয় বিদেশে ভ্রমণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছিল। কার্যত হয়েছিল ৫০ মিলিয়ন থেকে কিছু কম।

বিদেশে ভ্রমণকারী সংস্থার মধ্যে কলকাতায় অন্যতম সংস্থা থমাস কুক সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা থেকে সেভাবে বিমান চলাচল না থাকার জন্য

বিদেশ সফর ৫০% কমে গেছে। প্রথম করোনা পরিস্থিতি পর সেপ্টেম্বর থেকে কিছু মানুষ বিদেশ সফর করেছিলেন। এ বছরে জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত মানুষ কিছু বিদেশ সফর করেছিলেন। দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর সব দেশেই তাদের নিয়ম কানুন অনেকটাই পাল্টে যায়। মানুষের ভেতর ভয় কাজ করছে। বিদেশ ভ্রমণ করতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে পর্যটকরা। ভারতীয় পর্যটকরা সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড, দুবাই, মালদ্বীপ এবং বালির মতো গন্তব্যস্থল সবসময়ই বেশ কিছু কারণে পছন্দ করেন। আপাতত ভারতীয় পর্যটকদের এইসব দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ভারতীয়রা কোন কোন দেশকে খুব পছন্দ করে? এই ক্ষেত্রে মানুষের কাছে প্রাধান্য পায় কোন দেশের সঙ্গে তাদের খুব ভালো কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে, কোন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মিল আছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিলতার থেকে সেখানে মানুষের আবেগ বেশি প্রাধান্য পায়। ২০১৯ সালে প্রায় ১.০৯ কোটি বিদেশি পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। এখানে এসে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা) ব্যবসা ও প্রমোদে খরচ করেছিলেন। একজন বিদেশি পর্যটক ভারতে ২১ দিনের মতো থাকেন। প্রতিদিন গড়ে ৩৪ মার্কিন ডলার খরচ করেন।

পর্যটন ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকারও। বলা হয়েছে, প্রথম পাঁচ লক্ষ বিদেশি পর্যটককে একেবারে বিনামূল্যে ট্যুরিস্ট ভিসা দেওয়া হবে। পাশাপাশি, দেশের প্রায় ১১ হাজার নথিভুক্ত ট্যুরিস্ট গাইড ও এই ক্ষেত্রের অংশীদারদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়। কিন্তু ভারতে আসার মতো পর্যটকদের সংখ্যা বড় কমই। ভারতে ভ্রমণ ও পর্যটন খাত ২০১৯ আর্থিক বছরে ৮৮ মিলিয়নেরও বেশি লোকের কর্মসংস্থান করেছে। এই পরিসংখ্যান খুবই আশার আলো ছিল। করোনার ঢেউ আছড়ে পড়ার পর সরকারিভাবে হিসেব নেই কত মানুষ কর্মহীন হয়েছেন।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট লেখক, আন্তর্জাতিক পর্যটন ব্যবসায়ী এবং সহ-সভাপতি, সর্বভারতীয় ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

বিশেষ নিবন্ধ

পরিবেশ ও পাখি

তাপস কুমার দত্ত

এই বিশাল পৃথিবীতে জীবজগৎ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে একে অপরের উপর নির্ভরশীল হওয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় বাস্তুতন্ত্র। মানুষ যেমন অক্সিজেন, জল ছাড়া বাঁচতে পারেনা, তেমনি বিভিন্ন প্রানী ও উদ্ভিদরা অক্সজেন ও জলের উপর নির্ভরশীল। পারস্পরিক নির্ভরতার বন্ধনেই পৃথিবী হয়েছে প্রকৃত অর্থে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের খনি। উদ্ভিদ ও পাখি মানুষের সঙ্গে যেন গভীর এক সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। তারা যেন মানুষের পরম বন্ধু। এই বন্ধন যতদিন অটুট থাকবে ততদিন আমাদের এই পৃথিবীর অস্তিত্ব। পরিবেশে গাছ, জলাশয়, পাখি আজ সংরক্ষণ করা খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। গাছ ও জলাশয় ছাড়া পাখিদের বাঁচানো খুবই কষ্টকর।

গাছ তার সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে অক্সজেন নির্গমনের মধ্য দিয়ে মানুষকে উপহার দিয়েছে এক মুক্ত নির্মল পরিবেশ আর মুক্ত বিহঙ্গ পাখি তার রূপ বৈচিত্রের মাধ্যমে মানুষকে সকল সময়ে দিয়ে গেছে আনন্দ। পাখি যে তার ডানায় ভর করে উড়ে বেড়ায় এই বিষয়টাই মানুষকে এক সময়ে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছিলো। মানুষ ভাবলো আমি যদি পাখির মতন করে উড়তে পারতাম তবে সেটা কেমন হতো। এই ধারণা থেকেই মানুষ একদিন তৈরি করে ফেললো উড়োজাহাজ বা বিমান। মানুষ নিজে নিজে উড়তে পারে না। উড়ন্ত পাখির দিকে তাকিয়ে উড়ানের স্বপ্ন মেটায়।

পাখি বিভিন্ন গাছের ফলমূল ও পোকামাকড় ধরে খেয়ে থাকে। তাহলে এতে আমাদের কি লাভ আছে ? ফলাহারি পাখির বিষ্ঠায় থেকে যায় ফলের বীজ। যা নতুন গাছের জন্ম দেয় মাটিতে পড়ে। শুধু তাই নয়, এই বিষ্ঠা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। তার মানে দাঁড়ালো পাখি আমাদের বন সৃজনে সাহায্য করে।

কিন্তু চোরা শিকারীদের কবলে পড়ে অনেক পাখি প্রান হারায়। চোরা শিকারীরা পাখি ধরে তা খোলা বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে। শীতকালে বিভিন্ন হাঁস জাতীয় পাখির মাংস লুকিয়ে বিক্রি হয়। একটা সময়ে উড়িষ্যার মংলাজুড়িতে এই পরিযায়ী পাখি শিকার করে কিছু লোক তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো কিন্তু তাদের বোঝানোর পর তারই আজ পরিবেশের বন্ধু হয়ে এই সমস্ত পরিযায়ী পাখির দেখাশোনা করে, যাতে অকারনে তাদের প্রান না যায়। আজ বহু মানুষ এই মংলাজুড়ি দর্শনে যান এই পরিযায়ী পাখিদের দেখার জন্য। তাদের দেখাশোনার ব্যবস্থা করে অনেক মানুষ আজ জীবিকা নির্বাহ করছেন। আমাদের দেশের সব জায়গাতে এই রকম ব্যবস্থা হলে বহু পরিযায়ী পাখি প্রানে

বেঁচে যাবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গাজলডোবা, চুপির চর বা পূরবস্থলী, হাওড়ার সাঁতরাগাছি, কুলিক এই রকম অনেক জায়গা আছে যেখানে শীতকালে অনেক ধরনের পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায়। যেমন সরাল, পিনটেল, চখাচখি, গার্ডওয়াল ইত্যাদি বহু ধরনের পাখির আগমন ঘটে শীত পড়ার সাথে সাথে। আমাদের দেশে ক্ষনিকের অতিথি এই সমস্ত পাখিরা আসে। আমাদের লোকাল প্রশাসনের সাথে সাথে স্থানীয় যারা অধিবাসী আছেন তারা যদি এই বিষয়টা মনোযোগের সাথে দেখেন তবে পাখি রক্ষার সাথে সাথে আমাদের পরিবেশটা আরো মনোরম হয়ে উঠবে। বিভিন্ন পাখি শিকার যতদিন না বন্ধ হবে ততদিন পাখিদের বাঁচিয়ে রাখা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। বিভিন্ন আইনকানুন থাকা সত্বে বহু পাখি চোরা শিকাড়ীদের কবলে পড়ে। আইন কানুন যদি ঠিক মত করে পরিচালনা করা হয় তবে এটা হয়তো অনেকটাই বন্ধ করা সম্ভব হবে। তবে তার আগে মানুষের সচেতনাবোধ যতদিন না তৈরি হবে ততদিন এই জিনিস বন্ধ করা বড়ই মুস্কিল। সেই কারনে মানুষের এই বিষয়ে সচেতনাবোধ আগে তৈরী করতে হবে। সেই জন্য মানুষের সচেতনাবোধ তৈরী করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে এবং মানুষকে ভালোভাবে বোঝাতে হবে যে পাখি ও পরিবেশ সংরক্ষন খুবই প্রয়োজন আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে।

পাখি যখন পোকামাকড় শিকার করে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে তখন সে বিভিন্ন পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গকে খেয়ে চাষের জমির অনেক উপকার করে। শুধু তাই নয় কাক, শকুন এই ধরনের পাখিরা আমাদের পরিবেশের পচাগলা খেয়ে আমাদের সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে তোলে। কাক যদিও বা দেখা যায় শকুন কিন্তু আমাদের পরিবেশে সেরকম খুব একটা দেখা যায়না। পরিবেশকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এরকম পাখির আজ খুবই প্রয়োজন। পৃথিবীতে এমন কিছু পচা গলা জিনিস আছে যা কিনা শকুনই একমাত্র খেতে পারে। আনথ্রাগবাহিত মরা জীব যদি শকুন বাদে অন্য প্রানী খাদ্য হিসাবে গ্রহন করে তবে সেই প্রানীর বিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে আনথ্রাগবাহিত জীবানু ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু শকুনের ক্ষেত্রে হয়না। শকুনের পেটে এমন এক ধরনের এনজাইম নির্গত হয় তাতে আনথ্রাগ রোগের জীবানু ধ্বংস হয়ে যায় তাই শকুনের মল থেকে এই রোগ ছড়াতে পারেনা। বিজ্ঞানীরা বলছেন ড্রাইক্লোয়েনাক নামক এক গবাদি পশুর ওষুধ শকুনের মৃত্যুর অন্যতম কারন। ক্রমশ শকুনের সংখ্যা কমেই চলেছে। পরিবেশকে জীবানু মুক্ত রাখার জন্য এই রকম একটি পাখির আজ খুবই প্রয়োজন।

আমি যে অঞ্চলে থাকি তা হলো উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত হালিশহর। একটা সময়ে হালিশহরের স্টেশন সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গাতে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পাখির দেখা মিলতো কিন্তু আজ তার সংখ্যা যেন ক্রমশই কমে যাচ্ছে। ২০১৯ সালের পর থেকে এই ঘটনা বেশী দেখা যাচ্ছে। শীতকাল আসলে এখানে যে জলাশয়গুলি ছিলো সেখানে হাজার হাজার সরাল পাখি ভিড় জমাতো। কিন্তু কয়েক বছর থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এদেরকে আর আগের মতো দেখা যায়না। এখানে নগরায়নের কিছু প্রভাব এই পাখিদের উপর হয়তো পড়েছে। একটা সময়ে সুদূর আলাস্কা থেকে ব্লু থ্রোট (Blue Throat) বা নীলগলা ফিদ্দা পাখি চোখে পড়তো, আজ আর রেল ইয়ার্ডের মাঠে এদের দেখা মেলেনা। এদের থাকার জন্য কাদামাটি ও জঙ্গলের দরকার সেটা আজ আমাদের পরিবেশে বড়ই অভাব। শুধু তাই নয় আমাদের এই পরিবেশে শীতকালে সুদূর সাউত ইষ্ট ইউরোপ বা ইরান থেকে আসা সোনা পাখি বা ব্ল্যাক হেডেড বানটিং (Black Headed Bunting) পাখির দেখা মিলতো কিন্তু ২০১৯ সালের পর থেকে এদের আর আগের মতো দেখা যায়না। শীতকালে বা অন্য সময়ে যে সমস্ত পরিযায়ী পাখি আমরা দেখতে পাই তাদের পৃথিবীর চৌম্বক শক্তিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। তাদের বিশ্ময়কর ক্ষমতার বলে তারা কখনই দিকভ্রষ্ট হয়না। হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে এক জায়গা থকে আর এক জায়গায় এরা যায়। পথের নিশানা কখনই এদের ভুল হয়না। কত উচ্চতাতে বাতাস কতটা মিলবে তা অনুভব করার ক্ষমতা এদের অত্যন্ত বেশী। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আভাস এরা আগের থেকে পেয়ে যায়। নিজের দেশে যখন প্রচন্ড শীত পড়ে তখনই পাড়ি দেয় কম উষ্ণতা আছে এই রকম জায়গাতে। তখনই আমরা তাদের পরিযায়ী পাখি বা ক্ষনিকের অতিথি হিসাবে আমরা মাঝে অতিথি হিসাবে পেয়ে থাকি। তাই পাখির সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশের যেন একটা আত্মিক টান আছে। পাখি ছাড়া যেমন পরিবেশকে মানায় না তেমনিভাবে সঠিক পরিবেশ ছাড়া পাখিও বাঁচেনা।

আমাদের হালিশহরে একটা সময়ে ছয় রকম মুনিয়া পাখির দেখা মিলতো। এই ছয় রকম মুনিয়া পাখি হলো – ট্রাই কালার মুনিয়া – Tri Colour Munia বা শ্যামসুন্দর, স্কেলি ব্রেস্টেড মুনিয়া – Scaly Breasted Munia বা তেলী মুনিয়া, ইন্ডিয়ান সিলভার বিল – Indian Silver Bill বা সর মুনিয়া, হোয়াইট রাম্পড মুনিয়া – White Rumped munia, চেষ্টনাট মুনিয়া – Chestnut Munia, লাল মুনিয়া বা রেড অ্যাভাডাভাট – Red Avadavat। আজ কিন্তু এদেরকে আগের মত দেখা যায়না। এদের বেঁচে থাকার জন্য যে দানা শস্য বা ঘাসের বীজ দরকার তার আজ বড়ই অভাব। নগরায়নের জলাভূমি বুজিয়ে ও গাছপালা কেটে ধূ ধূ প্রান্তরে পরিনত হয়েছে। ঘাস যদি না জন্মায় সেখানে আর ঘাসের দানাও হবেনা আর ঘাসের দানা না থাকলে মুনিয়া পাখির খাদ্যের অভাব হবে তাই তাদের আর দেখা মিলবেনা। এদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে পরিবেশের দরকার সেটা সংরক্ষণ করা আজ খুবই প্রয়োজন। পরিবেশকে যদি আমরা বাঁচাতে না পারি তবে এই পাখিদেরও দেখা একদিন হয়তো আমরা পাবোনা।

একটা সময়ে হালিশহরর স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জলাশয়ের উপর যে তার বা জলাশয়ের আশেপাশে গাছ আছে তাতে তিন ধরনের সোয়ালো (বার্ন সোয়াল–Burn Swallow, স্ট্রিক সোয়লো–Streak Swallow, অ্যাশি উড সোয়ালো –Assy Wood Swallow)পাখির দেখা মিলতো। জলাশয় ও জলাশয়ের কাছে গাছপলা কমে যাওয়ার জন্য এদের সংখ্যা যেন ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ফলে এদের থাকার জন্য যে পরিবেশের দরকার সেটা আর থাকছে না। যেন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। একটা সময় ছিলো যখন এখানে স্লেটি ব্রেষ্টটেড রেল Slaty Breasted Rail, রাডি ক্রেক –Ruddy Crake, বেলিয়ানস ক্রেকের-Ballion's Crake মতো পাখির দেখা মিলতো। আজ সেরকম আর চোখে পড়েনা।

একটা সময়ে উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরে অনেক তালগাছ ও নারকেল গাছ দেখা যেতো। নগরায়নের জন্য এই বিশেষ ধরনের দুই গাছের অনেকটাই আজ অভাব। তার সঙ্গে বিশেষ ধরনের লম্বা ঘাস ও উলুখাগরা আগের মতো আর দেখা যায় না। এই ঘাস ও উলুখাগরা থেকেই তারা বাসা বোনার সরঞ্জাম সংগ্রহ করতো। বাবুই পাখি (Baya Weaver) তার শিল্প নৈপুণ্যে ভরপুর ও মানুষকে তাক লাগানোর মতো যে বাসা তালগাছ বা নারকেল গাছে বুনতো সেটা আর আগের মতো আমাদের চোখে খুব একটা পড়েনা। তালগাছ, নরকেল গাছ না পেয়ে বাবুই পাখি এখন ঝোপঝাড়,জঙ্গল ও বিদ্যুতের তারের উপর বাসা বানাচ্ছে। এটা আমাদের

সত্যিই ভাববার বিষয়। সেই বাসা আগের মতো আকারেও অতটা বড়ো হয় না এবং দেখতেও আগের মতো অতটা সুন্দর নয়। তাহলে বুঝুন বাবুই পাখির তাহলে কি অবস্থা হয়েছে।

সভ্যতার অগ্রগতি ও মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে আজ জীববৈচিত্র ও বাস্তুতন্ত্র পুরোটাই ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। একদিন এরা হয়তো প্রকৃতি থেকেই লুপ্ত হয়ে যাবে। হারিয়ে যাওয়া বাস্তুতন্ত্র আবার নতুন করে ফিরে পাওয়া খুবই কঠিন। এইভাবে যদি বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়ে যায় তবে মানুষও একদিন বিপন্ন হবে। গাছ কাটলে হবেনা তার সাথে আরোও গাছ লাগাতে হবে। শুধু তাই নয় তার সঙ্গে সৃষ্টি করতে হবে আরো নতুন নতুন জলাভূমি। আর চাইনা কৃত্রিমতার ছোঁয়া, ফিরিয়ে দাও সেই জলাভূমি ও জঙ্গল ও দূষণমুক্তো পরিবেশ যেখানে প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারবো আর তার সঙ্গে উপরি পাওনা হিসাবে দেখা পাবো সুন্দর পাখিদের।

সবাইকে একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে আজ কাজ করতে হবে আমাদের এই পরিবেশ ও পাখি নিয়ে। তাহলেই হয়তো আমাদের পরিবেশ ও পাখিদের বাঁচানো যাবে। পরিবেশ বাঁচলে পাখি বাঁচবে এবং এদের বাঁচার সঙ্গে আমাদের জীবন ও বাঁচার পরিবেশ আরো সুন্দর হয়ে উঠবে। একা কখনোও বাঁচা যায়না। যদি আমরা ভাবি এদেরকে ছাড়া বাঁচবো তবে আমরা সবাই মূর্খের স্বর্গে বাস করছি। সবাইকে একসাথে নিয়ে বাঁচতে হবে।

বিশ্বে বহু প্রজাতি ও বহু রঙের পাখনা যুক্ত পাখি আছে। এই সমস্ত পাখিরা পৃথিবীতে এলো কি করে তা ভাবলে আমাদের মনে সত্যিই একটা বিশ্বয় সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞিনী এবং অনুসন্ধানকারীরা বলছেন আজ থেকে প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে দানবের আকারের এক প্রকার ডাইনোসর ছিলো যারা কিনা জলের মধ্যে থেকে সেই জায়গা তোলপাড়। করে বেড়াতো। এই ধরনের বিশাল আকারের সরিসৃপরা প্রকৃতির সাথে নিজেদের ঠিক খাপ খাওয়াতে পারলোনা। তবে এদের মধ্যে একটি প্রজাতি ছিলো যাদের সামনের হাতে চামড়ার পর্দা ছিলো, এর সাহায্যে এই প্রানীরা কখনও কখনও এটিকে তারা ডানা হিসাবে ব্যবহার করতো। একটা সময়ে তারা এটিকে ডানা হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলো, তারপরই বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারা পরিনত হলো ডানা যুক্ত ডাইনোসর। তারপর আরো অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন হয়ে আজকের আমাদের এই আধুনিক পক্ষীকূলকে আমরা পেয়ে থাকি। জীববিজ্ঞানী ও অনুসন্ধানকারী বহু প্রাচীন। শিলা থেকে ফসিল সংগ্রহ করে পাখিদের বংশ, গোত্র নির্নয় করতে আজ সক্ষম হয়েছেন। তবে এটা বোঝা গেলো ডানা যুক্ত ডাইনোসর জাতীয় সরিসৃপ থেকেই ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পাখির

রূপ পায়। তবে এটা ভালো করেই বোঝা গেলো যে ডানাওয়ালা ডাইনোসের সাথে পাখির অনেক মিল আছে। এই ডানার সাহায্যেই পাখি মুক্ত আকাশের যেখানে সেখানে উড়ে বেড়ায় এবং এই ডানার সাহায্যেই সে তার চলার গতি পেয়ে থাকে। পাখির ডানার গড়ন ও আকারের সাথে পাখির আকাশে উড়ার শক্তির একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির ডানার গড়ন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা অনেক অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে সমস্ত পাখির মাথা ছোটো ও গোলাকার আকারের হয়ে থাকে তাদের ডাক খুব মিষ্টি হয়ে থাকে।

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনসারভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন)। এদের দ্বারা প্রকাশিত নতুন রেড লিষ্টে ভারতের ১৫ টি পাখির নাম আছে এর সাথে আরো তিনটা প্রজাতির পাখি নতুন করে আগের তুলনায় আরো বেশী বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এই তিনটি প্রজাতিকে নিয়ার থ্রেটেনড ও ভারনাবেল বিভাগে রাখা হয়েছে। রেড লিষ্টে থাকা পাখিদের নাম হলো—হোয়াইট বেলিড হেরন, বেঙ্গল ফ্লোরিকান, জর্ডনস কানসার, ফরেষ্ট আউলেট, গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড, সোসিয়বেল ল্যাপউইং, ভারতীয় শকুন, সাদা পিঠ শকুন, লাল মাথা শকুন, লম্বা গলা শকুন, হিমালয়ান কুইল, গোলাপী মাথা হাঁস। নিয়ার থ্রেটেন্ড পাখিদের মধ্যে হলো রিভার ল্যাপউইং, রিভার টান। ভালনারেবল পাখি হলো লম্বা লেজের পাতি হাঁস। জলাভূমি ও নদী তীরবর্তী বাসস্থান ক্রমশ হারিয়ে যাওয়ার জন্য আজ এই তিন প্রজাতির পাখি অবলুপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেও সেই পরিবেশের কথা এসে গেলো। আমরা হয়তো সবাই বাস্টার্ড, বেঙ্গল ফ্লোরিকান ও জর্ডনস কানসার পাখির সংখ্যা দ্রুত হারে কমে চলেছে। মধ্যভারতে যদি আমরা দেখি তবে দেখতে পাবো সেখানে পর্ণমোচী জঙ্গল ধ্বংস হওয়ার জন্য হারিয়ে গেছে ফরেষ্ট আউলেটের সংখ্যা। শুধু তাই নয় হারিয়ে যেতে বসেছে ভারতের হিমালয় পর্বত ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বনভূমি ফলে বহু প্রজাতির পাখি আজ অবলুপ্তির পথে। শুধু তাই নয় পরিবেশে হয়ে রাসায়নিক দূষন যেমন ডাক্লোফেনাকের অতিরিক্ত নির্গমন শকুন প্রজাতির পাখিদের বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছে। পক্ষী বিশারদ ও জীব বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যদি এদের বাসস্থান অবিলম্বেই সংরক্ষন না কর হয় তবে এই ১৫ রকমের প্রজাতির পাখি পৃথিবী থেকে খুব তাড়াতাড়ি চিরতরে বিদায় নেবে। হয়তো এদের তখন আমাদের ছবির মাধ্যমে দেখতে হবে। স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে এই সমস্ত পাখি। তাই সবাইকে আজ সচেতন হওয়ার সময় এসেছে।

আমার হয়তো অনেকেই ডোডো পাখির কথা পরিনতির কথা জানি। ডোডো পাখি হলো ১৬০০ শতাব্দীতে আমাদের পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া এক বিস্ময় করা পাখি। এই পাখির বসবাস ছিলো ভারত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত মরিসাস দ্বীপে। ওলন্দাজ নাবিকরা এই দ্বীপে পৌঁছানোর একশো বছরের মধ্যে

এদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছিলো। তাই হয়তো মানুষের কাছে এই পাখির অনেক তথ্য অজানা হয়ে আছে। ডোডো পাখির শেষ দেখা মিলে ছিলো ১৬৬২ সালে। তারপর থেকে তাকে আর জীবন্ত রূপে দেখা যায়নি। আজ মরিসাসের জাদুঘরে এই পাখির কঙ্কাল। সংরক্ষিত করা আছে। এই পাখির মাংসের স্বাদ ভালো ছিলো না একথা জানা যায় একজন ওলন্দাজ অভিযাত্রীর লেখা থেকে। এই কালো বর্ণের পাখিগুলো অনেকটাই ঘুঘু পাখির মতো দেখতে ছিলো তবে এদের আকার ও ওজনে অনেক তফাৎ ছিলো। একটি ডোডো পাখি আকারে প্রায় সাড়ে তিন ফুট লম্বা এবং ওজনে প্রায় ২০ কেজি ছিলো।

এই ডোডো পাখির মাংস স্বাদে খুব একটা কিন্তু ভালো ছিলোনা তবও মরিসাস দ্বীপে খাদ্যের কোনো বিকল্প না থাকায় অভিযাত্রীরা নির্বিচারে এদের শিকার করতো এবং এর মাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহন করতো। জানা যায় ডোডো পাখি মাটিতে বাসা বাঁধতো এবং মাটির মধ্যে ঐ বাসাতেই ডিম পাড়তো এবং মানুষেরা সেই ডিম চুরি করতো। শুধু তাই নয় অভিযাত্রীরা ডোডো পাখি দেখলে এমনিই নির্বিচারে তাদের নিধন করতো। ডোডো পাখি খুব বোকা ধরনের পাখি ছিলো, সে খুব ভালো ভাবে উড়তেও পারতো না ফলে যেকোনো শিকারী প্রানীর শিকারের জন্য সহজ লভ্য ছিলো এই পাখি। এইভাবেই আমাদের পরিবেশ থেকে একদিন হারিয়ে গিয়েছিলো এই পাখিটি।

ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ভরা আমাদের সুন্দর বনে প্রায় ৪২৮ টি প্রজাতির পাখির বসবাস। ৪২০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এইখানে পরিযায়ী ও স্থানীয় পাখিদের বসবাস। আমাদের দেশে যে ১২ রকম প্রজাতির মাছরাঙা পাখি পাওয়া যায় তার মধ্যে ৯ রকম প্রজাতির মাছরাঙা আমাদের সুন্দরবনে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে দেখা মেলে গোলিয়াথ হেরোন, দুইমবেল, লার্জ ইগ্রেট, শুনবিল স্যান্টপিপার, টেরেক স্যান্ডপিপার, প্যাসিফিক

গোল্ডেন প্রোভারের মতো বিরল প্রজাতির পাখির। ভারতে যে ১৩০০ প্রজাতির পাখির দেখা মেলে তার প্রায় এক তৃতীয়াংশের দেখা মেলে এই সুন্দরবনে। যা কিনা। ভারতবর্ষের আর কোথাও এত ধরনের পাখির দেখা মেলেনা। সুন্দর বনের ধানক্ষেত, জলাভূমি, বাগান ও জলাশয়ে পাখির দেখা সব থেকে বেশী পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা বেশীরভাগই মৎস্যজীবি এই কারনে এরা পাখি শিকার করেনা, পাখির সংরক্ষনের জন্য এটি একটি খুব ভালো দিক পাখি শিকার হয়না বলেই আজ এখানে এতো ধরনের পাখির দেখা মেলে। পরিবেশ রক্ষার সাথে মানুষও যদি এই পাখিদের কথা একটু ভাবে তবে হয়তো আমাদের এই সুন্দর ধরনী থেকে আমাদের পাখিরা হারিয়ে যাবেনা।

পৃথিবীতে যতো পাখি আছে তার বেশীর ভাগই গাছে বসবাস করে। গাছেই তারা থাকে, গাছে বাসা বাঁধে ও গাছ থেকেই তারা তাদের খাদ্য খাবার সংগ্রহ করে। যদি গাছ কমে যায় তবে পাখিরও দেখা কম মিলবে। আমরা জানি বালিহাঁস গাছের। কোঠরে বাসা বাঁধে এই রকম দেড়শো দুশো বছরের পুরানো গাছে যেখানে অতি সহজে কোঠরে প্রবেশ করতে পারে। এই রকমের গাছ আজ খুবই কম দেখা যায় কারন আমরা এই সমস্ত গাছ নির্বচারে ধ্বংস করে ফেলেছি। যদিও বা নতুন করে গাছ। লাগানো হয় এবং সেই গাছ যদি ৩০ - ৪০ বছরের পুরানো হয় তাতে সেই কঠোর তৈরী হওয়া খুব মুস্কিল। বালিহাঁসেরা ঠিক মতো প্রজনন করতে পারছেনা ফলে এই ভাবেই তাদের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। পাখির সাথে পরিবেশের বনভূমি, জলাশয় কেমন যেন একটা নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে আছে, এই বন্ধন যেন জন্ম জন্মান্তরের। পরিবেশ রক্ষার মধ্য দিয়েই পাখিকে রক্ষা করা সম্ভব।

লেখক পরিচিতি: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

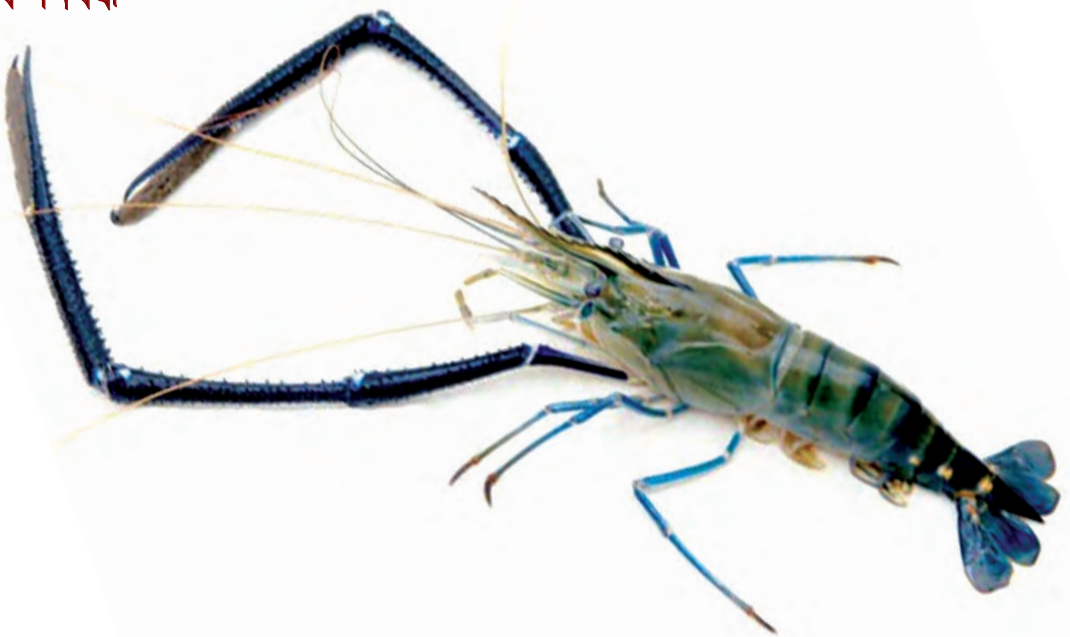

উপকূলবর্তী তিন জেলায় মৎস্য, চিংড়িচাষ ও কৃষিকার্যে ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব

ভূমিকা

২৬শে মে, ২০২১ বুধবার। এ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলাগুলির উপকূলবর্তী বঙ্গোপসাগর, হুগলি-মাতলা মোহনা ও নদী-সংলগ্ন ব্লকগুলিতে তীব্রভাবে আছড়ে পড়ল ইয়াস সুপারসাইক্লোন। প্রায় আড়াই ঘন্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে স্থায়ী থাকা বিধ্বংসী ঝড়, ভারী বৃষ্টি এবং একইসঙ্গে ওইদিন পূর্ণিমার ভরা কোটাল (জোয়ার)-তিনটির সম্মিলিত প্রভাবে ওইদিন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে রূপনারায়ণ, ভাগীরথী, দামোদর, পূর্ব মেদিনীপুরের অন্যান্য নদী, সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত নদী (ইছামতী, বিদ্যাধরী, মাতলা, পিয়ালী, হরিণভাঙা, সপ্তমুখী, ঠাকুরান প্রমুখ), মোহনা-অঞ্চল ও উপকূলবর্তী সমুদ্র। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণপ্রান্তে সাগর ব্লকে মুড়িগঙ্গা নদীর বাঁধ ১৫-২০টি জায়গায় ভেঙে গিয়ে ঘোড়ামারা এবং অন্যান্য গ্রাম পশ্চায়েতের অধিকাংশ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। নামখানা, গোসাবা, ক্যানিং-১, বাসন্তী, কাকদ্বীপ, কুলপি, কুলতলি, মথুরাপুর-২, ডায়মন্ড হারবার-১, ডায়মন্ড হারবার-২ এবং বিশেষতঃ পাথরপ্রতিমায় একই চিত্র—নদীবাঁধ ভেঙে গিয়ে চারিদিক জলে জলময়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় প্রবল জলের তোড়ে দক্ষিণে মোহনার সীমানা, বেশ কিছু নদীবাঁধ এবং উপনদী/চওড়া খাড়ির দুই পাড়ের বাঁধ ভেঙে (ফাটল ধরে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়ে প্লাবিত হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক জনজীবনপূর্ণ বহু গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা এর অর্ন্তভূক্ত, সাগর, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং-১, ক্যানিং-২, কুলপি, কুলতলি ব্লকগুলির অধিনস্ত। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে সুপারসাইক্লোনটি সর্বাধিক বেগে আছড়ে পড়বার ও স্থায়ী থাকবার মূল সময় এবং স্বাভাবিক পূর্ণিমার রাতের। ভরা কোটাল-দুইটিই এইবার সমকালীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই সামগ্রিকভাবে বিপর্যয়টির ভয়াবহতাও ছিল অনেক বেশি। আমরা জানি পুর্ণিমার রাতে জল এমনিতেই বেশি হয় নদীতে সবসময়। প্রবল ঝড়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছিল; নদীবাধ ছাপিয়েও নোনাজল লোকালয়ে প্রবেশ করে গিয়েছিল।

মাছচাষ

ওইদিন অধিকতর লবণাক্ত বা নোনা জল ঢুকে পড়ে নষ্ট করে ফেলেছে বহু গ্রামের কৃষিজমি, মিঠা/স্বাদু ও আধা-নোনা জলের মাছ চাষের পুকুর, বড়ো মিঠাজলের মাছচাষের ঘেড়ি/ঝিল এবং আধানোনাজলের মাছ ও চিংড়িচাষের ভেড়ি। সাগর ব্লকের প্রগতিশীল নরহরিপুর অগ্রদূত সামুদ্রিক মৎস্যজীবী খুটি সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর হলঘর প্রায় হাঁটুজলে থইথই; এছাড়া পার্শ্ববর্তী এলাকায় মাছচাষের পুকুরগুলি ভীষণরকমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ভালরকম পরিমাণ মিঠাজলের মাছ মরে ভেসে গিয়েছে। সম্প্রতি মিঠুন মণ্ডলের থেকে একথা জানা গেল।

শুধুমাত্র উন্নততর পদ্ধতিতে রুই, কাতলা, মৃগেল ও গ্রাস কার্প মাছ নয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চল লাগোয়া ব্লকগুলিতে অভিজ্ঞ ও প্রগতিশীল এবং মাঝবয়সী মাছচাষিরা মিঠা/স্বাদু জলের পুকুরগুলিতে গলদা চিংড়ি, পুরুষ তিলাপিয়া, বাটা, দেশি মাগুর, কই, দেশি ট্যাংরা, মৌরোলা, সরপুঁটি মাছগুলি প্রতিপালন করছেন এবং হালকা লবণাক্ত পুকুরগুলিতে নিয়ন্ত্রিতভাবে জোয়ারের জলকে প্রবেশ করিয়ে দিশি পারশে, রূপালি পারশে, আর-ভাঙন, ভেটকি, নানো ট্যাংরা বাণিজ্যিক আকারে চাষ করা হচ্ছে। সম্প্রতি কাদা কাঁকড়া, মুক্তগাছা, পায়রাচাঁদা, ভেনামি চিংড়ি, গুলশে ট্যাংরা, পাঙ্গাস চাষেও গুরুত্ব দিয়েছেন অনেকে। বন্যা বা প্লাবনের সময়ে জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত নদীর ও মোহনার আধা-নোনা জল ও নোনা জল মিঠা/স্বাদু জলের মাছচাষের পুকুরে ঢুকে পড়লে জলের লবণাক্ততা আকস্মিকভাবে বেড়ে যায়, যে অবস্থায় বাড়ন্ত অর্ধ-পরিণত ও পরিণত বড়ো রুই, কাতলা ও অন্যান্য মাছগুলি বেঁচে থাকতে পারে না। উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় যথাক্রমে ৬টি ও ১৪টি ব্লককে বলা হয় ব্র্যাকিশ-ওয়াটার ব্লক-এইখানে মিঠা/স্বাদু জলের এবং আধা-নোনাজলের দুইপ্রকার অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছই আবদ্ধ জলাশয়ে প্রতিপালন করা হয়।

ইয়াস ঝড়ের প্রভাবে গোসাবা, সাগর এবং পাথরপ্রতিমা ব্লকগুলিতে কৃষিফসল ও মাছচাষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। গোসাবা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ থেকে ১.৫-২.০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরষ্কার নেওয়া মাছচাষী শ্রী তুলসী হালদারের স্বাদুজল ও আধানোনাজলের মৎস্যখামার। ফোনে তিনি প্রতিবেদককে আকুলভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত মাছ মরে যাওয়া ও মিশ্র মাছ চাষের পুকুর থেকে প্রায়-পরিণত মাছ বেরিয়ে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেন। উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ইয়াস সাইক্লোনের প্রভাবে বহু পেশাদারি মাছচাষির পুকুরে ও ভেড়ি/ঘেড়িতে অস্বাভাবিক ভরা জোয়ারের ঢেউ-সম নদীর নানো জল প্রবলভাবে ঢুকে পড়বার দরুণ সমস্ত মাছের মড়ক ঘটেছে, মরা মাছ ভেসে ওঠবার পর চতুর্দিকে অস্বস্তিকর গন্ধ ছড়িয়েছে।

মাছের মড়ক, পুকুর ও ভেড়ি/ঘেড়ির জল উপছে পড়া -এর সঙ্গে মিঠা/স্বাদু জলাশয়গুলির নিকটবর্তী জায়গা

থেকে বাতাসের তোড়ে পাতাসহ গাছের ডাল ভেঙে উড়ে এসে পুকুরের জলে পড়ে পচতে শুরু করে পুকুরের জলের ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলির মানকে অত্যন্ত খারাপ করে তুলেছে, যা প্রতিপালনরত মাছের জীবনধারণের পক্ষে অযোগ্য। ঘটনার চার-পাঁচ দিন পর পর্যন্তও অধিকাংশ মৎস্যচাষি পুকুর থেকে মরে যাওয়া মাছ তুলে জল পরিষ্কার করে ফেলতে পারেননি। কারণ এই সুপারসাইক্লোন তাঁদের গৃহস্থঘরের স্বাভাবিক গঠন, আসবাবপত্র সব কিছুরই বিস্তর ক্ষতি করেছে চরম। দুর্দশাময় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করবার তথা পরিবারকে নিয়ে টিকে থাকবার কথা ভাবতে হচ্ছে। তাঁদের। মাথার উপরের ছাদ হারিয়েছেন বহু গ্রামীণ মাছচাষি ও কৃষিনির্ভর মানুষ।

বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, মিনাখা, হাসনাবাদ, ন্যাজাট, হাড়োয়া—উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকাও একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের কাছাকাছি উল্লিখিত দুইটি জেলার ব্র্যাকিশ-ওয়াটার ব্লকগুলিতে প্রবহমান নদীগুলির লবণাক্ততার মাত্রা ৫-৩০ পি.পি.টি। জোয়ারের সময় সমুদ্রের ৩০-৩৫ পিপিটি, লবণাক্ত জল নদীগুলিতে ঢুকে পড়ে আর সেই জল স্বাদু জলের মাছচাষের পুকুরে, ঝিলে ও ভেড়িতে ঢুকে পড়লে মাছের মড়ক অবশ্যম্ভাবী। নদীর এই প্লাবনকে আটকাতে বহু জায়গায় বাঁধ নির্মাণ করা হয় যা খুব শক্তসমর্থ বা টেকসই নয়।

লকডাউনের রেশ পুরোপুরি কাটেনি, গত ১২-১৫ মাস মাছচাষে আয় আগের বছরগুলির তুলনায় কম, তার উপর এই বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়। অনেক মৎস্যচাষির শুধু অধিকাংশ নয়, পুরো ফসলই জলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পুকুর পাড়ে মাছের খাবার, চুন ও সার মজুত রাখা অস্থায়ী ঘর, মাছ ধরবার জাল, ছোট নৌকা, পুকুরের একধারে থাকা বায়ুসঞ্চালিত এয়ারেটর যন্ত্র—এমন বিভিন্ন জিনিস ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বহু মৎস্যচাষির। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সুন্দরবন লাগায়ো ব্লকগুলিতে বড় বড় ঝিল ও ভেড়ি ইজারা নিয়ে মিঠা/স্বাদু জলে মৎস্য ও চিংড়ি চাষ করেন এমন কিছু মানুষের একেকজনের তো যে পরিমাণ প্রায় পরিণত ও পরিণত মাছ মরে ভেসে উঠেছে বা বেরিয়ে গিয়েছে, তা ধরে নিয়ে আড়তে বিক্রি করলে ৫-৮ লক্ষ টাকা আয় করা যেত। চার-ছয় মাস সময় ধরে ১-৫ বিঘা পুকুরে প্রতিপালন করা মাছ মরে ভেসে উঠেছে; কেউ কেউ তো প্রায় ৫ লক্ষ টাকা মৎস্যচাষে ব্যয় করে ফেলেছিলেন। বহু মৎস্যচাষিই এমন আছেন যাঁদের প্রত্যেকের ৫০,০০০-১,৫০,০০০ টাকার মাছ মরে গিয়েছে।

নামখানায় ধান জমিগুলিও নোনা জলে জলমগ্ন হয়েছে। সেখানে মাছ ভেসে থাকতে দেখা গিয়েছে, নিকটবর্তী

পুকুরগুলি থেকে যা বেরিয়ে এসেছে। বেশ কিছু গ্রামের জলমগ্ন রাস্তায় দেশি কই, শোল মাছও দেখা গিয়েছে। একেকটা মরে যাওয়া কাতলা মাছের কলকাতার যে কোনো আড়তে দামই হবে ৪০০-৮০০ টাকা (ভাল অবস্থায় থাকলে)। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে বীভৎসভাবে নোনাজল ঢুকে এক-একটি বড় ৫-৬ বিঘার গভীর পুকুরকে ভর্তি করে দিয়েছে, কোনোদিকে বাঁধ দেখা যাচ্ছে না। ৫০০-১০০০ গ্রাম বা আরো বড় আকারের রুই, কাতলা, সিলভার কার্প মরে গিয়ে ভেসে উঠেছে কাকদ্বীপ ও সাগরে মৎস্যবন্দর ও মৎস্য অবতরণস্থলে বেশ কিছু সামুদ্রিক মাছ ধরবার মোটরচালিত নৌকা ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

কৃষিকার্য

স্বাদু জলের পুকুরগুলির মতো শূন্য লবণাক্ততার কৃষিজমিতেও নদীর জল ঢুকে ধান ও অন্যান্য ফসলের ক্ষয়ক্ষতি করেছে এই দুই জেলায়। চাষের জমিতে সবেমাত্র ধানের চারা রোপণ করা হয়েছিল। ঘর, জীবন, জীবিকা সবকিছু তছনছ হয়ে গিয়েছে কৃষিনির্ভর মানুষগুলির। সরকারি সহায়তায় অথবা নিজস্ব পুঁজিতে গ্রামীণ কৃষিনির্ভর ও মৎস্যজীবী মানুষ ভালভাবে ঘর বাঁধবার বা মেরামত করবার জন্য প্রয়াজেনীয় সামগ্রী কিনে রেখেছিলেন— ইয়াস সবকিছু ধুইয়ে নিয়ে গেল। পুকুর পাড়ে ও ছোটো জমিতে অনেকেই লাউ, বেগুন, শসা চাষ করেছিলেন, তার আর কিছুই নেই।

পাথরপ্রতিমায় বনশ্যামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চারটি গ্রামে প্রায় ৩০০০ ফুট দীর্ঘ নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গ্রামগুলি নোনাজলের তলায় চলে গিয়েছে, সম্পূর্ণভাবে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গিয়েছে বাড়ি, মাছের পুকুর ও কৃষিজমি। পাথরপ্রতিমায় নদী-মোহনা থেকে ৫-৬ কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত জমিও নোনাজলের তলায় চলে গিয়েছে। বিস্তীর্ণ ফসলফলনের জমিগুলি নোনাজলে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যতে এই সকল স্থানে আর ভালভাবে ফসল ফলানো সম্ভব হবে না। রায়মঙ্গল ও কালিন্দী নদীর এইপাড়ে হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক; সেইখানেও নদী ও গ্রামের রাস্তায় সমান জলস্তর। ধানজমিগুলিতেই কিছুদিন পর থেকে বর্ষার ধান চাষ শুরু হওয়ার কথা, এখন তা নোনাজমিতে পরিণত হয়েছে। স্বাদু মাটিতে আগামী এক বছর স্বাভাবিকভাবে চাষ করা যাবে না।

চিংড়ি চাষ

পূর্ব মেদিনীপুর-সহ রাজ্যের তিন উপকূলবর্তী জেলায় ভেনামি চিংড়ি ও গলদা চিংড়ি চাষেও বিস্তর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন চাষিরা। নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা, রামনগর, মিনাখা, কাঁথি, হেড়িয়া, খেজুরি, নাচিন্দা, দেশপ্রাণ - ওই তিন জেলার এই সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে রপ্তানির উদ্দেশ্যে সতর্কতা সহকারে ভেনামি চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ি চাষ হয় খুবই দামি ফসল, জলজপরিবেশে। হঠাৎ লবণাক্ততার মান বেড়ে গেলে চিংড়ি আর বাঁচে না। বাধ্য হয়ে মরে যাওয়া চিংড়ি কেজিপ্রতি ১৫০ টাকায় বিক্রী করে ফেলেছেন চাষিরা, যার দাম হওয়া উচিত কেজিপ্রতি ৫৫০-৬০০ টাকা। অভিজ্ঞ পেশাদারি ভেনামি চিংড়ি চাষীরা ফসলকে কোনরকমভাবে বাঁচানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই দ্রুত সব শেষ হয়ে গেল। জীবিকা-কেন্দ্রীক ব্যবসাভিত্তিক চিংড়ি চাষকে গ্রাস করে নিল এই সর্বনেশে ইয়াস সুপারসাইক্লোন। এই মরসুমে আশানুরূপ ও ভালরকম ফসল উৎপাদন করবার ও মুনাফার বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন তাঁরা। সমস্ত প্রায়-পরিণত (কুইন্টাল কুইন্টাল) চিংড়ি পুকুরের জল উপচে সীমানা তথা নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের রসুলপুর নদীতে আকস্মিক প্রবল জোয়ারের কারণে ভেনামি চিংড়ির পুকুরগুলির চতুদিকের বাঁধ প্রায় পুরোপুরিই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই বছরের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন করে আর চিংড়ির পানো মজুত করা সম্ভব হবে না। কারণ বাঁধগুলি পুনর্নির্মাণ করতে বেশ কিছুদিন সময় লেগে যাবে। চিংড়ির ফলন তোলবার মুখেই এই বিপর্যয় ঘটে গেল। ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণ তাঁরা কেমনভাবে শোধ করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। ডিজেল-চালিত জেনারেটর, একাধিক বায়ুসঞ্চালিত এয়ারেটর যন্ত্র, পুকুরের চারদিকে নাইলন জাল ও চেরা বাঁশের তৈরি বেড়া সবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিছু জায়গায় পুকুর থেকে বেরিয়ে যাওয়া চিংড়ি স্থানীয় সাধারণ মানুষ চতুর্দিক জলমগ্ন এলাকা থেকে ধরে ১০০-১২৫ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি করেছেন। হলদিয়া, গোসাবা, সন্দেশখালি, কুলতলি-সহ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ফলে ডাঙা-সীমানার মাটির বাঁধ ভেঙে গিয়ে চিংড়িচাষের পুকুরের চতুর্দিকের বাঁধ ভেঙে চিংড়ি চাষে

ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে সুপরিচিত সুতাহাটা, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম, খেজুরি, রামনগর-১ ও ২ সমস্ত ব্লকে বড়ো এলাকা জুড়ে মিঠা/স্বাদু জলের মাছ এবং আলাদাভাবে ভেনামি ও গলদা চিংড়ির জলাশয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বিপুল অর্থের ফসল নষ্ট হয়েছে।

উপসংহার

এমন পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ মাছ ও চিংড়িচাষের পুকুরগুলিতে গাছের ডাল পড়ে পাতা পচে মাছ মরে গিয়ে জলের মানের অবনতি হয়েছে; কোনপ্রকার জলবাহিত অসুখ ও রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর প্রকোপ যাতে স্থানীয় মানুষের মধ্যে না দেখা দেয়, সেই কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্লকগুলির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের পরিচালনায় মৎস্যচাষিদের পুকুরে-ব্যবহারযাগ্যে পাথুরে চুন এবং পটাশিয়াম পারম্যানগানেট প্রদান করা হয়েছে এবং সঠিক পদ্ধতিতে জলে ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইয়াস সুপারসাইক্লোনের প্রভাবে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের মিঠা/স্বাদু ও আধা-নোনা জলের মাছ ও চিংড়ি মরে যাওয়া, জলজফসলের ক্ষতি হওয়া, নৌকা, হাঁড়ি ও জাল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া—সবকিছু বাবদ এই জেলায় ১৮টি ব্লক ও ২টি মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রায় ৪০,০০০ মৎস্যচাষিদের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

বিপর্যয়টি ঘটে যাওয়ার পাঁচ দিন পরেও পাথরপ্রতিমায় ও গোসাবায় শতাধিক কাঁচা বাড়ি জলের তলায় থাকতে দেখা যায়, ঝড়ের প্রভাবে গৃহস্থঘরের মাটির ভূমি (ভিত) ধুয়ে বেরিয়ে গেছে। ২০২০ সালের মে মাসের বিধ্বংসী আমফান ঝড়ের ঘটনার এক বছরের মাথায় আবার এই ভয়াবহ বিপর্যয়, করোনাভাইরাস, সেই সম্পর্কিত লক-ডাউন, গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অবনতি—যা সম্মিলিতভাবে মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। নিজেদের হতভাগ্য বলে মনে করতে শুরু করেছেন এঁরা। হেরম্বগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গ্রামগুলির মানুষের কোনওপ্রকার আয়ের মাধ্যম নেই এখন। অন্যান্য অঞ্চলেও একই ছবি প্রকটিত হয়েছে। কোভিড- ১৯ অসুখ এবং ওই সাঙ্ঘাতিক মারণ ভাইরাস মানুষকে আক্রমণ করে মেরে ফেলবার আগেই সাইক্লোন ঝড় এবং ক্ষুধাই মানুষকে মেরে ফেলবে-এমনও মত ব্যক্ত করেছেন অনেকে। ঝড়-ঝঞ্ঝাট এবং বন্যাকে সঙ্গী করেই তাঁদের নিত্য জীবনযাত্রা। খামারের হাঁস, মুরগিগুলিকে বাঁচানো যায়নি, গবাদিপশু অনেকেই সরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন স্থানীয় ত্রাণশিবিরে।

ব্যারাকপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বিজ্ঞানী ডঃ অর্চন কান্তি দাস মৎস্যচাষীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা যেন ২৬শে মে ২০২১ বুধবার সকাল বা দুপুরের মধ্যে মাছচাষের পুকুরে

শতকপিছু ৫০০ গ্রাম মাটো আয়োডিন-বিহীন লবণ যেন জলে ছিটিয়ে দেন, এবং বুধবার রাতে ছোটো সিমেন্টের আধারে শতকপিছু ৫০০ গ্রাম কলিচুন ভিজিয়ে পরদিন বৃহস্পতিবার খুব সকালে পুকুরে চুনদ্রবণ ছিটিয়ে দেন। কলিচুন রাতে ভিজিয়ে পরদিন ভোরবেলা দিতে হবে, আর ডলোমাইট বা চুনাপাথর দিনের বেলা দেওয়া যাবে। এতে দুর্যোগময় ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ে পুকুরের জলে গাছের পাতা-সহ ভাঙা ডাল পড়ে ও যদি পাতা পচতে থাকে, তাহলে মাছ মরবার সম্ভাবনা থাকবে না।

বছর বছর তীব্র ঝড় ও সুপারসাইক্লোনে আক্রান্ত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী গ্রামবাংলার মাছচাষের পুকুরের জলকে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে পারেন মৎস্যচাষিরা। জল থেকে ভেঙে পড়া গাছের ডাল ও পাতা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলে ফেলে পুকুরের আয়তন শতকপিছু ১ কেজি বালির সঙ্গে মিশিয়ে ৪০০ গ্রাম জিওলাইট প্রয়োগ করলে ভাল হয়। জিওলাইট জলকে শোধন করে, জল থেকে অ্যামোনিয়াকে শোষণ করে। জলের অতিরিক্ত কাদামাটি-জাত ঘোলাটেভাব দূর করবার জন্য শতকপিছু ১ কেজি বালির সঙ্গে মিশিয়ে ৭০০ গ্রাম ফটকিরি জলে গুলে নিয়ে প্রয়োগ করলে ভাল হয়। এক্ষেত্রে পুকুরে জলের গভীরতা ধরা হচ্ছে ১.০-১.২ মিটার। এর পরের দিন শতকপিছু ৫০০ গ্রাম গুঁড়ো করা পাথুরে চুনের দ্রবণ সকালবেলায় পুকুরের জলে প্রয়াগে করলে ভাল হয়; এবং এর পরের দিন শতকপিছু ১০ গ্রাম জীবাণুনাশক পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট-এর দ্রবণ প্রয়োগ করলে ভাল হয়। ভোরের বেলায় বাঁধের উপর পাম্প বসিয়ে ওই পুকুর থেকে জল তুলে প্রবল বেগে উপর থেকে দূর পর্যন্ত জল ফেলতে থাকলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে।

এই তিনটি জেলায় গ্রামগুলিতে ছোটো পুকুরে অনেকে রুই, কাতলা ও সমগোত্রীয় মাছের ধানিপোনা কিনে মজুত রেখেছিলেন পরবর্তী ২.৫-৩.০ মাসে চারাপানো উৎপাদন করবার জন্য। প্রতি বছর মে ও জুন মাসে ভাল মানের চারাপোনা উৎপাদন করেন বহু মৎস্যচাষি; সেইগুলির কোনও খোঁজ নেই। পূর্ব মেদিনীপুরে কয়েকজন বড় চিংড়িচাষির ১২-১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোকসান হয়ে গিয়েছে। বহু জায়গায় তো ধানজমি, মাঠ, পুকুর, বিল, ঝিল, নদী সব জলে একাকার হয়ে গিয়েছে। একের পর এক আতঙ্ক ছড়িয়েছে আইলা, ফণি, বুলবুল, আমফান, ইয়াস। পানীয় জলের ঘাটতি; মানুষের ঘুম, খাওয়া-দাওয়া কেড়ে নিয়েছে ইয়াস, বাড়িয়েছে দুশ্চিন্তা। গোসাবায় কিছু জায়গায় দুর্গাদোয়ানি নদীতে বাঁধ ১০০-৪০০ মিটার পর্যন্ত একটানা ভেঙে গিয়েছে। বিভিন্নরকমের মাছ নষ্ট হয়েছে, মানুষ অসহায়, চারিদিকে অথই জল, মূল পিচের বা কংক্রিটের রাস্তায় ভাটার সময়েই একটানা আধ-হাঁটু জল, জোয়ারের মুহূর্তে মাঠে এক বুক জল। নামখানায় সবজি ও ধান চাষ হয় এমন জায়গায় কোমর-উচ্চতায় জল, যেন সমুদ্রের চেহারা নিয়েছে। নদীবেষ্টিত অণ্ডাল, নদীতীরবর্তী গ্রাম ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত গ্রামীণ মানুষের মুখে আর্তস্বরে এখন একটাই কথা: 'সবকিছু শেষ হয়ে গেল।'

প্রতিবেদক—সুব্রত ঘোষ

মিউকরমাইকোসিস

কালো রঙের দেখতে হয় বলে অনেক সময়েই একে কালো ছত্রাক বলা হলেও এটি কোনওমতেই ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা কালো ছত্রাক নয়। সুতরাং মিউকরমাইকোসিসকে সেই নামেই পরিচিতি দেওয়া ভাল এবং এটি প্রথমেই পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

সামগ্রিক পরিসংখ্যান:

কী এই মিউকরমাইকোসিস, যা বিশেষ করে করোনা পরবর্তী রোগীদের মধ্যে কয়েকজনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে! এটি বহু পুরনো একধরনের ছত্রাক ঘটিত রোগ, যা সাধারণত ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে পরবর্তী সময়ে দেখা যেতে পারে। পরিসংখ্যান বলছে, পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় ভারতে মিউকরমাইকোসিসে আক্রান্তের সংখ্যা ৭০ গুণ বেশি। মূলত ডায়াবেটিস মেলিটাস অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত শর্করা, অঙ্গ প্রতিস্থাপন, কোনও ধরনের হেমাটোলজিক্যাল রোগ অর্থাৎ থ্যালাসেমিয়া বা হিমোফিলিয়া—এই তিন কারণ থাকলে ছত্রাকের আক্রমণ বেশি ঘটে। পৃথিবী বিখ্যাত 'ল্যানসেট' জার্নালে ২০২১ সালের মে মাস পর্যন্ত পরিসংখ্যান দিয়ে বলা হচ্ছে, কোভিডের প্রথম সূত্রপাত অর্থাৎ ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে যতজন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তার ৭১ শতাংশই ভারতীয়। এই জার্নালেরই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের মে-র তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত মিউকরমাইকোসিসের যত কেস মিলেছে, ভারতে তার ৪৫%-ই নতুন এবং ৩৪% মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। 'ল্যানমেট' জার্নাল বলছে, করোনা ও করোনা পরবর্তী সময় মিলে, ভারতে, ২৮মে, ২০২১ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৮৭২ জনের মিউকরমাইকোসিসের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বেশি সংক্রমণের পরিসংখ্যান উত্তর ও পশ্চিম ভারতে। গুজরাটে সবচেয়ে বেশি, ৩ হাজার ৭২৬ জন। এরপরেই মহারাষ্ট্র। অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে রয়েছে রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, হরিয়ানা, দিল্লি ইত্যাদি।

এই রোগে মৃত্যুহার যথেষ্ট বেশি। বেশ ব্যয়সাপেক্ষ এবং যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত ভারতে মিউকরমাইকোসিসে আক্রান্ত হয়ে যতজনের মৃত্যু ঘটেছে, তার মধ্যে (১) রাইনোসেরিব্রাল অর্থাৎ নাক দিয়ে মস্তিষ্কের আক্রমণে ৩১.৮%, (২) গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল অর্থাৎ অন্ত্রতে আক্রমণে ১৪.৮%, (৩) পালমোনারি অর্থাৎ ফুসফুসে আক্রমণে ১৭.৮%, (৪) রেনাল অর্থাৎ মূত্র সম্পর্কিত অঙ্গে সংক্রমণে ৯.৯%, (৫) কিউটেনিয়াস অর্থাৎ ত্বকে আক্রমণে ৪.৫ শতাংশ এবং অন্যান্য বাকি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নানা অঙ্গে সংক্রমণে ২১.২ শতাংশ রোগীর মৃত্যু ঘটেছে। করোনা ও করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের হিসেব অনুসারে, ২০২১ সালের ৩ জুলাই পর্যন্ত ২৪৭ জনের মিউকরমাইকোসিসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ১৫৯ জনের চিকিৎসা চলছে, ৩০ জন সুস্থ হয়েছেন এবং ৫৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে। সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান হল, মিউকরমাইকোসিসে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয় মস্তিষ্কে আক্রমণ ঘটলে এবং সবচেয়ে কম মৃত্যু হয় ত্বকে আক্রমণে।

মিউকরমাইকোসিস কি ?

একধরনের ছত্রাকের সংক্রমণঘটিত রোগ। বিশেষ ছত্রাকের বীজগুটি শ্বাসনালি দিয়ে শরীরে প্রবেশ করলে দ্রুত শৃঙ্খল বিস্তার হতে থাকে। শরীরের নানা অংশে, বিশেষ করে নাসিকা প্রকোষ্ঠ, ফুসফুস, মস্তিষ্কে চেপে বসে এই ছত্রাক। দেখতে কালচে, কখনও সবুজ। একেই বলে মিউকরমাইকোসিস।

রাজ্যে চিকিৎসার খরচ:

ব্যয়ভাবনার কথা দূরে সরিয়ে রেখে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর আপ্রাণ চেষ্টা করছে, প্রতিটি রোগীই যেন সুস্থ হয়ে ওঠেন। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে, ইতিমধ্যেই এই সংক্রমণের চিকিৎসায় খুব অল্পদিনের মধ্যে কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বলা চলে, এক-একজনের সরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় খরচ হচ্ছে ২.৫ থেকে ৮.৫ লক্ষ টাকার মত। এরপর বাড়িতে থাকলে খরচ হচ্ছে প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার কাছাকাছি। অর্থাৎ রোগী পিছু মাসে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। গড়ে ১০-১২ জন রোগীর চিকিৎসায় ব্যয় হচ্ছে ১ কোটি টাকার কাছাকাছি। মিউকরমাইকোসিসে আক্রান্ত রোগীর হাসপাতালে থাকা থেকে পরবর্তী ৬ মাসের চিকিৎসার খরচ ৪-১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে এবং এটি প্রায় সবটাই বহন করছে রাজ্য সরকার।

যেমন, মিউকরমাইকোসিসের চিকিৎসার মূল যে ওষুধ, ইনজেকশান অ্যাম্ফোটেরিসিন-বি, দেহের প্রতি কেজি ওজনের হিসেবে ৫ মিলিগ্রাম করে দরকার হয়। অর্থাৎ ভারত, সাধারণভাবে ৬০ কেজি ওজন হলে, ৬০ x ৫= ৩০০ মিলিগ্রাম ইনজেকশনটি দরকার। আবার প্রতি অ্যাম্পুলে থাকে ৫০ মিলিগ্রাম করে ওষুধ। অর্থাৎ, একজনকে ৩০০ মিলিগ্রাম ইনজেকশন প্রতিদিন দিতে ৬টি অ্যাম্পুল লাগে। আবার প্রতি অ্যাম্পুলের দাম ৪,৫০০ থেকে ৫,০০০ টাকার কাছাকাছি। ফলে দিনে প্রায় ৩০,০০০ টাকার ইনজেকশন দিতে হয় একজনকে। এই ওষুধ চলে ২১-৪২ দিন। ন্যূনতম ২১ দিন ধরলেও ২১ x ৩০,০০০=৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার মত খরচ হয়। এর সঙ্গে এম. আর. আই., সিটি স্ক্যান, অন্যান্য পরীক্ষা তো আছেই। এই হিসেব গেল একজনের সরকারি হাসপাতালে ২১ দিন ভর্তির সময়ে শুধু ইনজেকশনেরই খরচ।

এরপর রোগী একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি গেলে শুরু হচ্ছে অ্যান্টিফাংগাল ট্যাবলেটের কোর্স। নিয়ম হল, প্রতিদিনের হিসেবে ৩০ দিন খেতে হবে। প্রথম দিন ৬০০ মিলিগ্রাম এবং তারপর থেকে রোজ ৩০০ মিলিগ্রাম করে ২৯ দিন। ১০০ মিলিগ্রাম একটি ট্যাবলেটের মূল্য ৪৫০-৫০০ টাকার মতো। সরকারি টেন্ডারে যে দামে কেনা হচ্ছে, তাতে প্রথম দিন ১৮০০ টাকা এবং তারপর ৯০০ টাকা করে ২৯ দিনের হিসেবে মোট ২৮০০০ টাকা লাগছে। সবটাই সরকারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া একজন রোগীর খরচের হিসেব। যেহেতু এর ওষুধ বাইরে সহজলভ্য নয়, তাই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সময়েই এই ওষুধ কিনে দেওয়া হচ্ছে রোগীর পরিজনকে। এই হিসেবেই রোগীপিছু ৬ মাসে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, বাড়িতে চিকিৎসার সময়ে।

উপসর্গ/ কখন বোঝা যায়:

বর্তমান প্রেক্ষাপটে, মূলত কোভিড থেকে সেরে ওঠার সাথে সাথে যদি ভীষণ অনিয়ন্ত্রিত সুগার থাকে, তাহলে মিউকরমাইকোসিসে আক্রান্তের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সারা গা হাত পায়ে ব্যথা, জ্বর, নাক-চোখ-মুখ লাল বর্ণের হয়ে যাওয়া, প্রচণ্ড মাথা যন্ত্রণা, মাড়ি দিয়ে পুঁজ, দাঁতের পাটি খুলে আসার মতো অনুভূতি, মুখের একদিকে ব্যথা, অক্সিজেনের মাত্রা হঠাৎ কমে গিয়ে শ্বাসকষ্ট, ছোট ছোট শ্বাস, বমি করলে রক্ত ওঠা, নাক বা চোখ দিয়ে কালো কালো তরল পদার্থ বের হওয়া,—ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যেতে পারে।

কোন অঙ্গে বেশি আক্রমণ/ কী কারণে হয়:

সাম্প্রতিক কোভিড সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে বলা যায়, (১) কোভিড-১৯-এর জন্য শরীরে অনুক্রম্যতা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে, (২) অতিরিক্ত পরিমাণে কর্টিকোস্টেরয়েডের ব্যবহারে (যেটি করোনা পরিস্থিতিতে অনেক বেশি হচ্ছে) এবং (৩) হাইপারগ্লাইসেমিয়া অর্থাৎ রক্তে শর্করার পরিমাণ একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে এই ছত্রাক আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। শ্বাসনালী দিয়ে মস্তিষ্ক, ফুসফুস, অন্ত্র, ত্বক এবং অন্যান্য কিছু অঙ্গে এই ছত্রাকের ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।

সুগার শুধু অনিয়ন্ত্রিত নয়, অনির্ধারিত হলে বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশি। রক্ত যদি অতিরিক্ত পরিমাণ অ্যাসিড (কিটোন) তৈরি করতে শুরু করে অর্থাৎ কিটোঅ্যাসিডোসিস হলে, ক্যানসার আক্রান্ত বা বিশেষ কোনও অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ঘটনা ঘটলে, রক্তে শ্বেত রক্ত কণিকার পরিমাণ হঠাৎ ভীষণ কমে গেলে অর্থাৎ কেমোথেরাপির ফলে নিউট্রোপেনিয়া হলে, ছত্রাকের কঠিন সংক্রমণে ভরিকোনাজল ব্যবহার দীর্ঘদিন হয়ে চললে এবং রোগী যদি অনাক্রম্যতা নিয়ন্ত্রক কোনও ওষুধের ব্যবহারের মধ্যে থাকেন, তাহলে মিউকরমাইকোসিসে আক্রান্তের সম্ভাবনা বেশি।

রাজ্যে কোথায় চিকিৎসা:

মূলত ৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে এর চিকিৎসা চলছে। সেগুলি হল, (১) কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, (২) এস. এস. কে. এম. হাসপাতাল, (৩) বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ, (৪) উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ। এর মধ্যে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডা. বিভূতি সাহাকে প্রধান করে রাজ্যস্তরে একটি টেকনিক্যাল উপদেষ্টামণ্ডলী তৈরি হয়েছে। এস. এস. কে. এম. হাসপাতালকে 'অ্যাপেক্স হাব' করা হয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গ ও বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজকে আঞ্চলিক স্তরের হাব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মিউকরমাইকোসিসের সন্ধান পেলেই প্রত্যেক জেলায় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ভবনে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কোন বিশেষজ্ঞরা এই চিকিৎসায় যুক্ত হবেন:

রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ এবং জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি টিম তৈরির কথা বলেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। এই টিমে থাকবেন—মাইক্রোবায়োলজিস্ট, প্যাথলজিস্ট, রেডিওলজি বিশেষজ্ঞ, ইন্টারনাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ইনটেনসিভিস্ট, ই.এন.টি. বিশেষজ্ঞ, নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ, চক্ষু বিশেষজ্ঞ, দন্ত বিশেষজ্ঞ, ম্যক্সিলোফেসিয়াল ও প্লাস্টিক সার্জেন এবং এন্ডোক্রিনোলজিস্ট।

মিউকরমাইকোসিস ঠেকাতে কী করবেন, কী করবেন না:

এই ছত্রাকের আক্রমণ যেন না ঘটে, সেজন্য প্রথমেই রোগীর রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতেই হবে, বিশেষ করে যেখানে পরিকাঠামো বা বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। বাগানে কাজ

করার সময় সর্বদা ফুলহাতা জামা, ফুলপ্যান্ট, গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে। জৈব খাদ্য উপাদান যেমন পাউরুটি, সবজি, ফল-ফলাদি নষ্ট হতে থাকলে বা মাটি, জৈবসার ইত্যাদিতে ছত্রাক পড়তে শুরু করলে তা থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে স্টেরয়েড ব্যবহার করতে হলে, সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায়, সঠিক ওষুধ বিশেষভাবে ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। রোগীর অক্সিজেন থেরাপি চলার সময় বিশুদ্ধ জলই যেন ব্যবহার করা হয়। কোভিড রোগীদের হাসপাতাল থেকে ছাড়ার পর শর্করার মাত্রা ভীষণভাবে মাপজোক করতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিফাংগাল ব্যবহার করলেও তা সঠিক মাত্রায় হতে হবে। মিউকরমাইকোসিস সম্পর্কে চিকিৎসা শুরু করতে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় টেস্ট করাতে চিকিৎসকেরা যেন কোনওভাবেই দেরি না করেন, সেটিও স্বাস্থ্য দপ্তর নজর রাখতে বলেছে। কোভিড আক্রান্ত বা সেরে ওঠা রোগীদের নাক বন্ধের উপসর্গ দেখলে শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়াঘটিত না ভেবে, বিশেষ পর্যবেক্ষণের ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে।

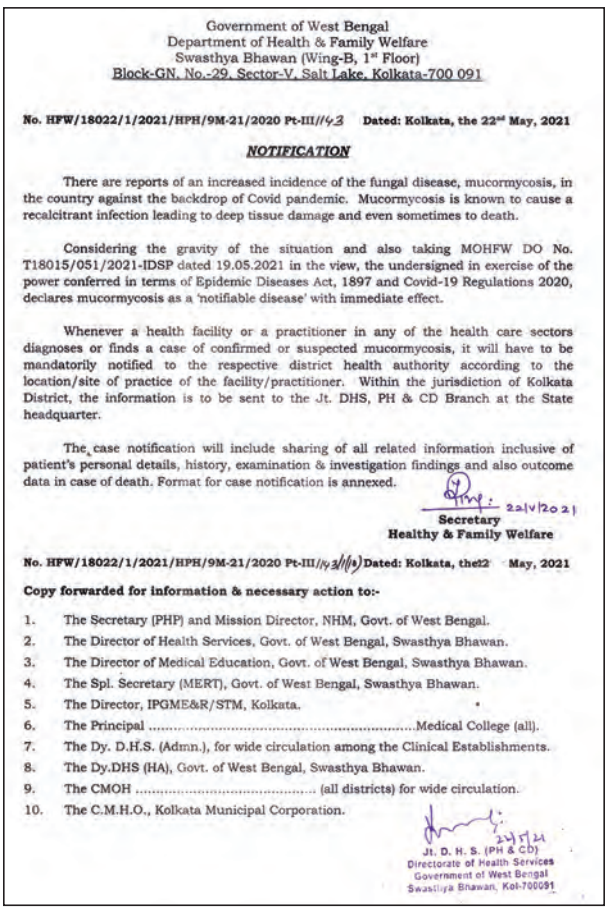

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare
Swasthya Bhawan (Wing-B, 1st Floor)
Block-GN, No.-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700 091

No. HFW/18022/1/2021/HPH/9M-21/2020 Pt-III/43 Dated: Kolkata, the 22nd May, 2021

NOTIFICATION

There are reports of an increased incidence of the fungal disease, mucormycosis, in the country against the backdrop of Covid pandemic. Mucormycosis is known to cause a recalcitrant infection leading to deep tissue damage and even sometimes to death.

Considering the gravity of the situation and also taking MOHFW DO No. T18015/051/2021-IDSP dated 19.05.2021 in the view, the undersigned in exercise of the power conferred in terms of Epidemic Diseases Act, 1897 and Covid-19 Regulations 2020, declares mucormycosis as a 'notifiable disease' with immediate effect.

Whenever a health facility or a practitioner in any of the health care sectors diagnoses or finds a case of confirmed or suspected mucormycosis, it will have to be mandatorily notified to the respective district health authority according to the location/site of practice of the facility/practitioner. Within the jurisdiction of Kolkata District, the information is to be sent to the Jt. DHS, PH & CD Branch at the State headquarter.

The case notification will include sharing of all related information inclusive of patient's personal details, history, examination & investigation findings and also outcome data in case of death. Format for case notification is annexed.

22/5/2021
Secretary
Healthy & Family Welfare

No. HFW/18022/1/2021/HPH/9M-21/2020 Pt-III/43(1) Dated: Kolkata, the12 May, 2021

Copy forwarded for information & necessary action to:-

1. The Secretary (PHP) and Mission Director, NHM, Govt. of West Bengal.
2. The Director of Health Services, Govt. of West Bengal, Swasthya Bhawan.
3. The Director of Medical Education, Govt. of West Bengal, Swasthya Bhawan.
4. The Spl. Secretary (MERT), Govt. of West Bengal, Swasthya Bhawan.
5. The Director, IPGME&R/STM, Kolkata.
6. The Principal ..... Medical College (all).
7. The Dy. D.H.S. (Admn.), for wide circulation among the Clinical Establishments.
8. The Dy.DHS (HA), Govt. of West Bengal, Swasthya Bhawan.
9. The CMOH ..... (all districts) for wide circulation.
10. The C.M.H.O., Kolkata Municipal Corporation.

Jt. D. H. S. (PH & CD)
Directorate of Health Services
Government of West Bengal
Swasthya Bhawan, Kol-700091

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা :

রক্তের সমস্ত ধরনের রুটিন ল্যাবরেটরি পরীক্ষার পাশাপাশি নাকের এন্ডোস্কপি, চেস্ট এক্সরে, ফুসফুসের সিটি স্ক্যান এবং বায়োপসি, মস্তিষ্কের এম. আর. আই., নাকের সিটিস্ক্যান, ছত্রাকের কালচার অর্থাৎ কী ধরনের ছত্রাক ইত্যাদির পরীক্ষা অবশ্যই করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

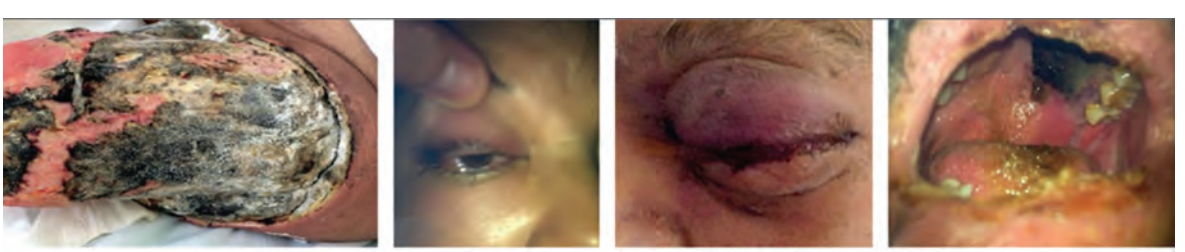

প্রতিবেদনের তথ্যসূত্র: *পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর ২০২১ সালের ২০ মে থেকে তাদের ওয়েবসাইটে মিউকরমাইকোসিস নিয়ে পরপর বেশ কয়েকটি নির্দেশিকা-সহ রোগের উপসর্গ, অ্যান্টিফাংগাল থেরাপি অর্থাৎ অ্যামফোটেরিসিন-বি ইনজেকশনের মাত্রা ও ব্যবহার ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সমস্ত তথ্য থেকে জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় অংশ তুলে ধরার কাজটি করেছেন পত্রিকার সহ-সম্পাদক* ***রাতুল দত্ত।***

Government of West Bengal
Department of Health and Family Welfare
Swasthya Bhawan
GN-29 Block, Sector- V, Bidhannagar, Kolkata-91

Memo No : HPH/ 9M - 21/2020/ Part - II /141 Date : Kolkata, 22.05.2021

ORDER

(A) All patients of Mucormycosis are to be managed at all Medical Colleges/District Hospitals, as the case may be. A multidisciplinary team may be constituted forthwith, with the following as members-

- Microbiologist/Pathologist/Radiodiagnosis expert
- Internal Medicine Specialist / Intensivist
- ENT Specialist
- Specialist Neurologist-if available
- Ophthalmologist
- Dental Surgeon
- Surgeon (Maxillofacial/Plastic)
- Endocrinologist-if available.

(B) The IPGMER & SSKM Hospital will be the apex hub and the North Bengal Medical College Hospital and BS Medical College Hospital will be regional hubs for the management of recalcitrant Mucormycosis cases. Need based referrals can be executed after consultation with and confirmation from the said hospital authorities.

(C) A crash capacity building and orientation for this erstwhile rare disease entity may be carried out at institutional/district level immediately. A Powerpoint presentation for the mentioned purpose is provided at the departmental website in Covid >> Guidelines.

(D) A state level Technical Advisory Group has been constituted with Prof. Bibhuti Saha, HoD, Tropical Medicine, STM as chairperson vide HPH/ 9M - 21/2020/ Part - II/140 dated 22.05.2021. The guidance of this Group may be sought for a comprehensive response as & when needed.

(E) Mucormycosis is notifiable and any such case (confirmed/suspected) is to be reported to the District Health authorities (Dy. CMOH-II). In Medical Colleges, it is the responsibility of the hospital authority to ensure the notification. They may utilize the IDSP machinery (where available). The District Health authority will share the collected information with the Jt. DHS, PH & CD at covidlabreport@gmail.com as & when such cases are reported. Within Kolkata District, case notification will be directly sent to the Jt. DHS, PH & CD.

22/5/2021
Director of Medical Education
West Bengal

22/5/21
Director of Health Services
West Bengal

মিউজিক থেরাপি
লকডাউনে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য

একটা অন্যরকম কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা সবাই। কোভিড/ লক ডাউন/ ঘরবন্দী জীবন। প্রতিদিনের এক অভ্যাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জীবন। পরিস্থিতি ও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরাও বদলে ফেলেছি আমাদের রুটিন, আমাদের কাজের পদ্ধতি। আজ গোটা দুনিয়া অনেকটাই চলছে অন্তর্জাল যোগাযোগে।

এই অভিনব পরিস্থিতিতে ভিন্নভাবে সক্ষম বা বিশেষ শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের কতটা ক্ষতি হল? বিস্ময়করভাবে, এই প্রশ্নটি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ হলেও সবচেয়ে কম আলোচিত। কোভিড-এর অভিঘাত নিয়ে অজস্র আলোচনাতে ওই শিশু-কিশোর-যুবারা কতটা পিছিয়ে পড়ল এই পরিস্থিতিতে, কী ধরনের নতুন সমস্যার মুখে পড়লো, কতটা মোকাবিলা করতে পারলো, সেসব প্রায় স্থানই পেল না।

প্রথম সমস্যা হল, অনেকেরই বাড়িতে কম্পিউটার, ট্যাব বা স্মার্ট ফোন কোনওটাই হয়তো নেই। কোনও কোনও স্কুল হয়তো তাদের সাহায্য করছে স্মার্ট ফোন দিয়ে। কিন্তু সব স্কুল সেটা করেনি, বা করতে পারেনি।

প্রতিবন্ধকতা বিভিন্ন ধরনের। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, দৃষ্টিহীন, শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা, মানসিক বা মেধা প্রতিবন্ধকতা। সবচেয়ে সমস্যা হল মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে, বিশেষ করে যারা খুবই নিম্নস্তরের মেধা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত। এরা সবাই যে স্মার্ট ফোন ব্যবহার করতে পারবে তাও নয়।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি, ফোনের প্রতি ওদের একটা বিশেষ আগ্রহ। এই সময়ে প্রযুক্তির সঙ্গে ওদের অনেকের নিবিড় পরিচয় গড়ে উঠেছে, এমন কি 'আত্মীয়তা' হয়েছে।

ওরা ফোনে কথা বলার সময় বসছে চুপটি করে এবং কিছু কিছু সহবত — যেমন, Good morning বা Good evening ইত্যাদি বলা শিখেছে। আমার মনে হয়, এটা একটা পজিটিভ দিক।

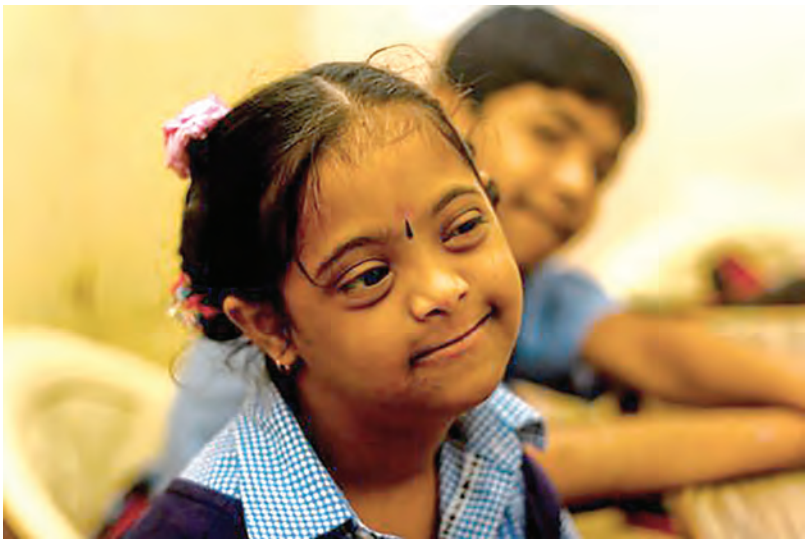

আবার, শারীরিক সমস্যার জন্য এই বিশেষ ছেলেমেয়েদের হয়তো এখন প্রতিদিন স্কুল কলেজে যাওয়া সম্ভব নয়; সব স্কুল কলেজে এখনো ramp নেই, lift নেই,কারো হয়তো বা যাতায়াত করতে আর কারো সাহায্য লাগে সবসময়। কিন্তু এখন অনলাইন ক্লাস হওয়াতে এরা প্রতিদিন ক্লাস করতে পারছে। এটাও একটা পজিটিভ দিক। তবে শ্রবণ- প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে অনলাইন ক্লাসে প্রশিক্ষকের নির্দেশ নিতে খুবই সমস্যা দেখা গিয়েছে।

অন্য দিকে, স্কুল বন্ধ। অনেকটাই নির্জনে এখন এ ধরনের বাচ্চারা। অনেক অভিভাবকরাই বলছেন, স্কুল নেই বলে বাচ্চা কিছুতেই ঘুম থেকে উঠতে চাইছে না, অথবা উঠলেও বিছানা ছাড়ছেই না। এক মায়ের কথা, তাঁর ছেলে ঘুম ভাঙার পর একের পর গান শুনতেই থাকে শুয়ে শুয়ে। আগে ঘুম থেকে উঠেই সাড়ে আটটার মধ্যে তার স্নান সারা হয়ে যেত, কারণ স্কুলে যেতে হবে। এখন অনলাইন ক্লাস হওয়াতে ক্লাস করছে নিয়মিত, কিন্তু স্নান করছে ক্লাস শেষে বেলা দু'টোয়।

আবার অনেকক্ষণ একজায়গায় বসে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা। স্কুলে তাদের জন্য নির্ধারিত বিশেষভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে, অনেকসময় একক ভাবেও (1:1) ক্লাস নেওয়া হয়। বাড়িতে সেটা সম্ভব নয়। এ সকল বাচ্চাকে জোর করে কিছু করানোও যায় না। এরা অনেকেই বকাঝকা বোঝে না, শাসনও বোঝে না। এদের সবসময় একটা নিয়মিত অভ্যাসের মধ্যে রাখতে হয় সেটা ব্যাহত হচ্ছে।

স্কুলে প্রতিদিন যাওয়া-আসার শারীরিক কসরতটা হচ্ছে না। স্কুলে যোগ ব্যায়াম ক্লাস, ফিজিওথেরাপি ক্লাস হতো, যা কখনোই অনলাইন করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু বাচ্চার এগুলি খুবই প্রয়োজন।

এভাবে অনলাইন ক্লাস করছে বটে, কিন্তু অনেকটাই বাধ্য হয়ে করছে; খুব খুশিমনে করছে না, বা অনেক অভিভাবকের কথায়, করেও খুব কাজের কাজ হচ্ছে না। মা-কে হয়তো পাশেই থাকতে হচ্ছে, মায়ের সহযোগিতাতে হয়তো করছে। নিজের চেষ্টা করা বন্ধ করে দিয়েছে। বাচ্চার আচরণগত সমস্যা (behavioural problem) হচ্ছে।

আগে স্কুলে পাঠিয়ে বাবা-মায়েরা অনেকটা সময় নিজেদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে কাটাতে পারতেন। যে-ক্ষেত্রে মা-বাবা দুজনেই কর্মরত, সেক্ষেত্রে এক বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই একা একা সব কিছু করতে পারে না এই বিশেষ ছেলে-মেয়েরা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাহায্য লাগে।

এই ধরনের বাচ্চাদের অন্য কোনও জগত নেই, সবচেয়ে আনন্দের জায়গা স্কুল-ই। স্কুলের গাড়িতে আসা, স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করা, খুনসুটি করা। শিক্ষক শিক্ষিকাদের আদরে, শাসনে দিন কাটে। কোভিড তাদের সেসব সোনার দিন কেড়ে নিয়েছে।

এখনো কিন্তু আমাদের সমাজ অনেক পিছিয়ে, যতোই আমরা একসঙ্গে চলতে চাই। অনেক বাবা-মা পছন্দ করে না, প্রান্তিক এই শিশুদের সঙ্গে তাদের বাচ্চাদের মেলামেশা। সাধারণ ছেলেমেয়েদেরও দেখেছি এদের প্রতি এক উদাসীনতা, অথবা, হয়তো নানা প্রতিবন্ধকতা, নানা কু-অভ্যাস, স্বল্প বুদ্ধির কারণে এখনও তারা বেশ কিছুটা 'পর', 'বিচ্ছিন্ন', কিংবা যেন 'ব্রাত্য'। তাই স্কুল বন্ধ থাকায় এক প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এদের জন্য।

এ জন্যই এই ধরনের শিশুদের অভিভাবকদের/ আত্মীয়জনের এবং প্রতিবেশীদের উচিত বাড়িতে/ সমাজে খুশির বাতাবরণ তৈরি করে রাখা। কারণ বেশিরভাগ সময়ই তাদের সঙ্গে আমরাও বাড়িতে থাকছি আজকাল।

এ ছাড়া, বাচ্চাদের বিভিন্ন শারীরিক কার্যকলাপ–যেমন যোগব্যায়াম, নাচ প্রভৃতি করানো যেতে পারে।

আর বিভিন্ন ছোটখাটো আনন্দদায়ী সৃজনশীল কাজেও নিযুক্ত রাখতে হবে।

লক্ষ্যণীয়, আগে ছেলেমেয়েদের টিচার বা থেরাপিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ হত সরাসরি। এখন হয় অন লাইনে, মুঠোফোনে।

সুর, ছন্দ, গতি এসবের প্রতি অটিজম বা অন্যান্য মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলেমেয়েরা একটু বেশি আকৃষ্ট হয়। তাই মিউজিকের সাহায্যে আমরা এদের অনেক কিছুই শেখাতে পারি। মিউজিক থেরাপি করা হয় দু'ভাবে: active music therapy ও receptive music therapy. প্রথম টিতে ছেলেমেয়েদের সরাসরি গান শেখানো, গাওয়ানো, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, ইত্যাদি করানো হয়।

দ্বিতীয় টিতে গান শোনানো, গানের আবহে নাচ বা অ্যাক্টিং মুভমেন্ট, ইত্যাদি করানো হয়। ছোট ছোট ছড়াতে সুর করে স্পেশাল এডুকেশন-ও করানো হয়। যেমন ধরা যাক, একটি বাচ্চার নাম রঙ্গন। এখন, 'রঙ্গন' দিয়ে ছোট্ট দুলাইনের ছড়া সুর করে নিয়মিত তাকে বলে বলে বোঝানো হয় তার নাম রঙ্গন। এভাবেও কিন্তু সে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারে।

যদি একটি অনুষ্ঠান করা হয় যেখানে কেউ গান গাইল, কেউ সঙ্গে নাচলো বা অ্যাক্টিং, কিংবা কোনও মুভমেন্ট করল। তখন কিন্তু অ্যাক্টিভ, রিসেপটিভ দু ধরনের কাজই হল।

এ কথা সবাই জানেন যে, এখন এমন একটা সময় এসেছে যে, সবসময় প্রয়োজনমতো বাইরে যাওয়া হয় না। ঘরেই কিন্তু অনেক কিছু তৈরি করে আমরা প্রয়োজন মেটাতে পারি। আমরা দেখেছি, অনেকগুলি কাপে রঙিন জল নিয়ে নানা সুর তোলা যায়।

সবার ঘরেই আছে কাপ; পাশে একটি গ্লাস উল্টে রেখে কাঠি দিয়ে বাজালে একটি সুন্দর ছন্দ তৈরি হয়।

খালি কৌটো-তে চাল, নানা রকম ডাল, শুকনো ফলের বীজ ইত্যাদি ভরে নাড়ালেও সুন্দর ছন্দ তৈরি হয়।

আমি বাচ্চাদের বলেছিলাম, তারাও যেন বুদ্ধি করে কিছু বানিয়ে আমাকে বাজিয়ে দেখায়/শোনায়। সবাই কিন্তু নানাধরনের জিনিস তৈরি করেছিল। সৃজনশীল এসব কাজে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে নিজেদের মগ্ন করেছিল ওরা।

এই গৃহবন্দী অবস্থায় আমরা থেরাপির সঙ্গে সঙ্গে ওদের নিয়ে বিভিন্ন অনলাইন প্রোগ্রাম করেছি। যেমন, রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ইত্যাদি। নাচ, গান, বক্তৃতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছে ওরা। বাবা-মায়েরা বলেছেন, এর ফলে ওরা ঘরে থাকার একঘেয়েমি থেকে মুক্ত হয়েছে, সবার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, আনন্দ করেছে।

আরেকটি জরুরি কথা হল, এধরনের অনুষ্ঠানে সাধারণদের যুক্ত করা, সমন্বয়ী বা inclusive অনুষ্ঠান করা। অর্থাৎ এইসব ভিন্নভাবে সক্ষম বাচ্চাদের সঙ্গে সবসময় সাধারণ ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিলিতভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে; তাতে socialisation বা সামাজিকতা তৈরি হবে বিশেষ ছেলেমেয়েদের, একে অপরের অনুভূতি, চিন্তা, উপলব্ধি, শৈল্পীক বিনিময়ের মাধ্যমে উন্নত করবে আরোও। আমার মনে হয়, এর একটা মানবিক দিকও আছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা কোনো একটি আলাদা গোষ্ঠী নয় যে তাদের নিয়ে সবসময় আলাদা অনুষ্ঠান করতে হবে, অথবা আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে।

Google meet, Facebook live ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অনলাইন অনুষ্ঠানে আমি তাই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা, ফেসবুক পেজ/গ্রুপের সঙ্গে ওদের যুক্ত করেছি। তাঁরাও এই অনুষ্ঠানে নিজেদের পরিবেশনা করেছেন। এ থেকে আমি অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি আমার বিশেষ ছাত্রছাত্রীদের থেকে। আর, ওদের নানা প্রতিভা সবার সামনে মেলে ধরতে পেরেছি। যা অনেকেরই অজানা।

মিউজিক থেরাপি অনেকটাই শান্ত করতে পারে হাইপার-অ্যাক্টিভ ছেলেমেয়েদের, মনযোগী করতে পারে অটিজম আছে এমন বাচ্চাদের। শুধু বিশেষ শিশু কেন, সঙ্গীত নিমেষে উধাও করতে পারে আমাদের যে-কারোর অবসাদ। বিশেষ বিশেষ রাগের গান বিশেষ বিশেষ রোগ নিরাময় করতে পারে। শুধু তার যথাযথ প্রয়োগ চাই।

সঙ্গীত এমন সম্পদ! এমন ঐশ্বর্য! এমন ধন্বন্তরী ওষুধ যা সর্বরোগহর॥

— দীপাঞ্জনা রায়চৌধুরী
মিউজিক থেরাপিস্ট

আমার জেলা

ইতিহাসের আলোয় বর্ধমান

অরবিন্দ সরকার

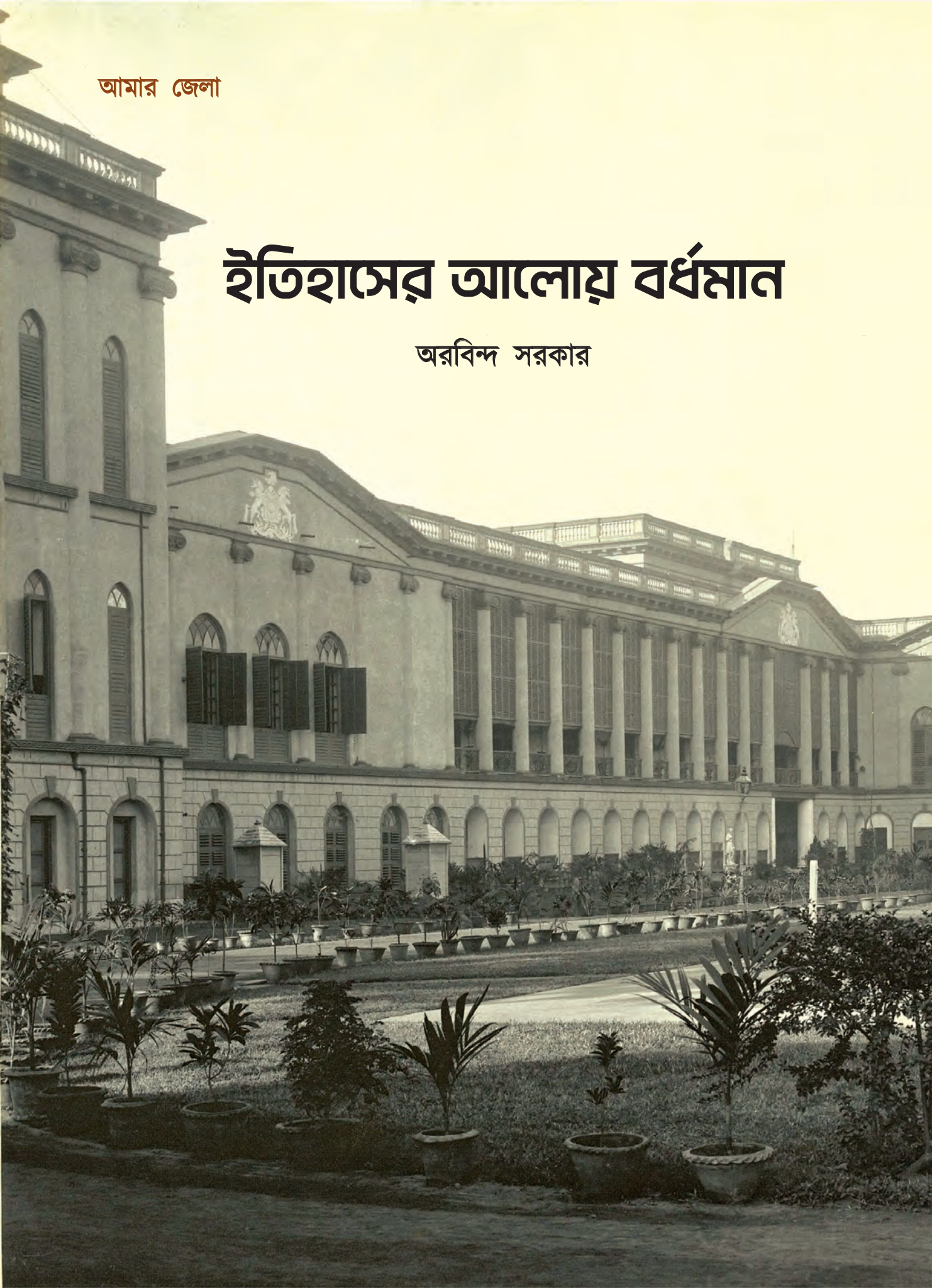

আমাদের ভারত ভোটপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা গঠিত স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দেশ চলে সংবিধান বিধি মেনে। সংসদে জনপ্রতিনিধিরা অধিবেশনে যোগদান করেন। সরকারের কার্যপ্রণালী জনস্বার্থে রচিত হয়, অঙ্গরাজ্যগুলিতে বিধানসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাজ্যের শাসনপ্রণালী একইভাবে তৈরি করে থাকেন।

আগে জমিদার বা রাজারা দেশ শাসন করতেন। এখন তার বিলুপ্তি ঘটেছে। তবে এখনও পৃথিবীর কিছু দেশে রাজা বা রানীরা দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন। আমাদের এখানে জমিদার বা রাজপ্রসঙ্গ আজ আলোচনায় উঠে আসবে অখণ্ড বাংলার, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার ভালো-মন্দে মিশিয়ে। শরিফাবাদ অর্থাৎ বর্ধমান রাজাদের কথা বলব। যাঁরা শাসন করেছেন, নিজেদের অর্থভাণ্ডার বাড়িয়েছেন, আর পাশাপাশি জনকল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন।

ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, বর্ধমান রাজ-এর আদি পুরুষ হলেন সংগ্রাম রাই। তিনি এসেছিলেন সেই সময়ের পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরের কোটলি থেকে। খেত্রী কাপুর বংশের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি একবার সপরিবারে বর্ধমান হয়ে তীর্থ করতে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত শ্রীজগন্নাথধাম পুরীতে হাজির হন। ভ্রমণ শেষে ফেরার পথে শহর বর্ধমান থেকে একটু দূরে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে এসে ডেরা বাঁধেন। সেখানে ব্যবসার কাজে লেগে পড়েন স্থায়ীভাবে। ফিরে আর যাননি লাহোরে। আসলে সেই সময় পাঞ্জাব প্রদেশ বেশ সামাজিকভাবে টালমাটাল অবস্থায় ছিল। সর্বোপরি, এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর ভালো লেগে গিয়েছিল ভীষণভাবে। এইসব ঘটনাবলী ষোড়শ শতকের শেষের দিকের। তখন দিল্লির রাজ সিংহাসনে রয়েছেন মোঘল বাদশাহ আকবর। আর বাংলার সুবেদার তখন রাজা মানসিংহ।

বাদশাহ আকবর বর্ধমানে জায়গীরদার করে পাঠালেন শের আফগানকে। স্বাধীনচেতা এই বীর মোঘলের দাক্ষিণ্যকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেই রাজকার্য চালাতে থাকেন। এমনকি তিনি রাজস্ব দিতে অস্বীকার করলেন। তখন প্রয়াত আকবর। দিল্লির রাজ সিংহাসনে জাহাঙ্গীর বসেই কুতুবউদ্দিনকে পাঠালেন বর্ধমানে শের আফগানকে শায়েস্তা করতে। এঁদের মধ্যে যুদ্ধ হয় বর্ধমানের সাধনপুর অঞ্চলে। উল্লেখ্য, এই যুদ্ধে সঙ্গম রাই মোঘল সৈন্যদের রসদ যোগান দেয়। স্বীকৃতিস্বরূপ, মোঘল বাদশাহ ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে সঙ্গম রাইকে তখন মুনসেফদারী ও চারহাজারী কোতোয়াল হিসেবে গণ্য করেন। কিছুদিনের মধ্যে বাংলার সেরা জমিদার হিসেবে বর্ধমান রাজকূলের সম্মান বৃদ্ধি পায়।

এখানে পূর্ব প্রসঙ্গ টেনে বলি, কুতুবউদ্দিন ও শের আফগানের যুদ্ধে উভয়েরই প্রাণ বিসর্জন হয়। উল্লেখ্য, শের আফগানের স্ত্রী মেহের-উন-ন্নেসার প্রতি জাহাঙ্গীর প্রথমাবধি প্রেমাসক্ত ছিলেন। কিন্তু বাবা আকবর তার গুরুত্ব দেয়নি। শের আফগানের সঙ্গে ওই রূপসী কন্যার বিয়ে দিয়ে বর্ধমানে আফগানকে জায়গীরদার করে দূরে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা সুখে ঘর সংসার করছিল। একটি কন্যা তাঁদের হয়। শের আফগানের মৃত্যুর পর মেহের-উন-ন্নেসাকে কন্যাসহ দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে জাহাঙ্গীর বিয়ের প্রস্তাব রাখে, কিন্তু প্রথমে কিছুতেই তাতে রাজী হয়নি মেহের-উন-ন্নেসা। এইভাবে বছর পাঁচেক পেরিয়ে যায়। তারপর তিনি বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হন নানা শর্তে। বিয়ের পরে সম্রাজ্ঞীর নতুন নামকরণ হয় নূরজাহান, যার অর্থ জগতের আলো। যিনি নৃত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায় পারদর্শী। এবারে তিনি বাদশাহকে কাঠের পুতুলের মতো বসিয়ে রেখে সাম্রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। এখানে এই প্রসঙ্গের ইতি টানা হল। আসি ফিরে, বর্ধমান জমিদার প্রসঙ্গে।

সঙ্গম রাই-এর ছেলে বঙ্কুবিহারীও বাবার মতো জমিদারির কাজে নিজেকে যুক্ত রাখলেন। বাবার ধান-চাল, অর্থলগ্নী ব্যবসায় লেগে থাকলেন। তারপর বঙ্কুবিহারীর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আবু রাই বাবার ব্যবসাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন। পাশাপাশি তিনিও চৌধুরাই পদে বহাল রইলেন। তার সময়ে রাজবংশের সমৃদ্ধি বহুগুণ বেড়ে যায়। তিনি আবার ব্যবসার থেকে জমিদারি কর্মে বেশি নজর দেন। গ্রাম বৈকুণ্ঠপুর থেকে নিজের গৃহ সরিয়ে নিয়ে এসে তিনি কাঞ্চননগরে নতুন আবাস গৃহ নির্মাণ করেন। যা বর্তমানে বর্ধমান শহর সংলগ্ন সমৃদ্ধশালী জনপদ। এই কাজটি তিনি করেছিলেন ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা সাল হিসেবে পরে ১০৬৪ নতুনগঞ্জ এলাকায় ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। যা আজও বিদ্যামান। তিনি দিঘিরপুল-এ স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য বড়ো দিঘি খনন করেন যাতে পানীয় জল খেতে অসুবিধা না হয়।

এই অঞ্চলে বড়ো বড়ো বহু গৃহ নির্মিত হয়। দো-চালা, চৌ-চালা আরও নানা ঢং-এর। মোঘল বাদশাহ শাজাহানের সময় ঢাকা যাওয়ার পথে তাঁর সৈন্যরা বর্ধমানে

জিড়িয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায়, তার ব্যবস্থা জমিদার করেন। এই কাজে খুশি হয়ে বাদশাহ বর্ধমান চাকলার মধ্যে রেকাবি বাজার ও মোঘলটুলির কোতোয়াল ও চৌধুরীপদে তাঁকে আসীন করেন। আবু রাই জমিদারি কাজ ছাড়াও ছিলেন সংস্কৃতি -পিপাসু। বাঘনাপাড়া অঞ্চলে বৈষ্ণব ভাবধারা প্রচারে তিনি বিভিন্ন আখরা তৈরি করেন। সুপণ্ডিত অধ্যাপক কাননবিহারী গোস্বামী রচিত 'বাঘনাপাড়া মন্দির বিগ্রহ ও সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থে তা সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে।

জমিদার আবু রাইয়ের ছেলে বাবু রাই বাবার মতো জমিদারির আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। বর্ধমান পরগনা ছাড়া তিনি আরও তিন-তিনটি পরগনা ক্রয় করে থাকেন। সেই সময় তাঁর বার্ষিক আয় পৌঁছে যায় ১,০০,২৬২ টাকায়। বাবু রাইয়ের ছেলে ঘনশ্যাম রাই ট্যাক্স আদায়কারী জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি পান। তিনি শহরবাসীদের সুখের কথা মনে রেখে অনেক জনহিতকর কাজে নিজেকে যুক্ত রাখেন। পানীয় জলের সুব্যবস্থা করেন বিশাল দিঘি খনন করেন। নিজের নামে সেই দিঘির নামকরণ হয় শ্যাম সায়র। এই বড়ো দিঘির খনন কাজ শেষ হয় ১৬৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে। সেই সময় জমিদার প্রতিটি শ্রমিককে এক ঝুড়ি মাটি প্রতি একটি করে কড়ি মজুরী হিসেবে দিয়েছিলেন। বহুযুগের পর বর্তমান কলমচিও এই সায়র ব্যবহার করে বর্ধমান রাজ কলেজে ছাত্র হিসেবে পড়াকালীন। সেই বৃহৎ দিঘি এখন শহর বর্ধমানে পরিবেশ রক্ষার্থে বিদ্যমান। তবে ২০২১ সালে এই দিঘি পানীয় জল হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। পৌরসভার কল্যাণে জলের তেষ্টা মেটানো হয় টাইম কলের মাধ্যমে। এই দিঘি সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত বর্ধমান জেলা সদর হাসপাতাল। উল্লেখ্য, কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভীষণ অল্প বয়সে ঘনশ্যাম রাই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে।

তাঁর চলে যাবার পর তাঁর পুত্র কৃষ্ণরাম রাই বাবার মতো পরগনাগুলির চৌধুরাই পদে নিযুক্ত থাকেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর অধীনে তখন পঞ্চাশটি পরগনার ট্যাক্স আদায়ের দায়িত্ব বর্তেছিল। ওই সময় তিনিই সুবে বাংলার সবচেয়ে বড়ো জমিদার হিসেবে গণ্য ছিলেন। দিল্লির বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তখন দাক্ষিনাত্যের টালমাটাল অবস্থাকে শান্ত করার জন্য লড়ে যাচ্ছেন। সেই সময় মারাঠিরা ভীষণ শক্তিশালী। দূরে থাকার ফলে পরগনাগুলিকে নিজের জিম্মায় আনতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। শায়েস্তা খাঁ তখন বাংলার দায়িত্বে ছিলেন, তিনি সামাল দিতে হয়রান। তিনি আসলে কার্যভার থেকে মুক্তি পেলেন ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে। নতুন দায়িত্ব বর্তাল ইব্রাহিম খাঁর উপর ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে। অতি বার্ধক্যের কারণে তার পক্ষে সবকিছু সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। এর ফলে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত জমিদাররা তাঁদের খুশিমতো জমির ট্যাক্স সংগ্রহ করছিল। আর ফৌজদারও তথৈবচ। বর্ধমান পরগনার জমিদার সেই সুযোগটি গ্রহণ করে। তাঁর কব্জায় পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী রাখার অনুমতি আদায় করলেন। আর এর ফলে তিনি অনেকগুলি পরগনা নিজের দখলে আনতে সমর্থ হলেন। বলাগড়, মনোহরশাহী, চন্দ্রকোণা ইত্যাদি পরগনাগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধিমান বর্ধমান জমিদার কৃষ্ণরাম বাদশাহ ঔরঙ্গজেব-এর কাছে ফরমান পাওয়ার জন্য আবেদন করলেন। বাদশাহ তা সানন্দে মঞ্জুর করলেন ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে। তার প্রধান কারণ ছিল অবশ্য সেই সময় বর্ধমান পরগনার জমিদার জমির ট্যাক্স সংগ্রহে সবার উপরে ছিলেন।

প্রাসঙ্গিকভাবে একটি তথ্য হাজির করছি বর্ধমান রাজাদের সম্পর্কে। J. C. K. Peterson তাঁর Bengal District Gazetters (Burdwan) মূল্যবান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

The Rise of the Burdwan Raj shortly afterwards the great Burdwan house whose history from the period onwards is identical with that of the district was founded. According to tradition the

রাজবাড়িতে বেনসন টাওয়ার ক্লক্

১৯৪১ সালে রাজ্যাভিষেকের পরে সোনার সিংহাসনে বসেন রাজা বিজয়চাঁদের পুত্র উদয়চাঁদ

original founder of the house, was one Sangram Rai a Khatri Kapur of Kotli in Lahore, who, on his way back from a pilgrimage to Puri, being much taken with the advantages of Baikunthapur, a village near the town, settled there and devoted himself to commerce on money lending. Abu Rai, who was appointed Choudhuri and Kotwal of Rekhabi Bazar in the town in 1657 AD under the Faujdar of Chakla Burdwan, is said to have been his grandson, and he is the first member of the house of whom there is any historical record. He owned his appointment to the good service rendered by him in supplying the troops of the Faujdar with provision at a critical time. His son Babu Rai, who owned Pargana Burdwan and three other estates, was succeeded in his turn by his son Ghanashyam Rai. Upon the death of Ghanashyam Rai, his son Krishna Ram Rai succeeded to the Zamindari and among other new estates acquired the Pargana of Senpahari. In 1689, he was honoured with a farman from the Emperor Aurangzeb in 38th year of his reign confirming his title as Zamindar and Chaudhuri of Parganas Burdwan. [Bengal District Gazetters, Burdwan, West Bengal Govt., reprinting March 1997 pages-34-35]

কৃষ্ণরাম রাইয়ের সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। মোঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেব উত্তর ভারতের জন্য সময় দিতে পারছিলেন না। এই সুযোগে ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে একটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহী রাজারা হলেন যথাক্রমে বিষ্ণুপুর রাজা গোপাল সিংহ, চন্দ্রকোণার তালুকদার রঘুনাথ সিংহ এবং বর্ধমান চাকলার অন্তর্ভূক্ত চেতুয়া ও বরদার জমিদার শোভা সিংহ এবং ওড়িষার পাঠান সর্দার রহিম খাঁ—এরা সকলে মিলিত হয়ে সসৈন্যে বর্ধমান-এ অভিযান করে। কৃষ্ণরাম-এর কানে এই খবর পৌঁছানো মাত্র তিনি কিছু সৈন্য নিয়ে বাঁধা দিতে এগিয়ে আসেন। কয়েকটি সংঘর্ষের পরে চন্দ্রকোণা যুদ্ধে কৃষ্ণরাম মৃত্যুবরণ করেন। প্রথমে ওরা বর্ধমানের দক্ষিণ দিকে এসে লুঠতরাজ করে। শেষে যুদ্ধ হয়। সেই সময় বর্ষাকাল ছিল।

কৃষ্ণরামের নিহত হওয়ার খবর পেয়ে ছেলে জগৎরাম ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি নিজেকে রক্ষা করার জন্য নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে নদিয়ার রাজা রামকৃষ্ণের কাছে হাজির হন মাটিয়ারাতে এবং সেখান থেকে তিনি জাহাঙ্গীর নগর অর্থাৎ বর্তমানে ঢাকা শহরে হাজির হন। সঙ্গী হিসেবে যতটুকু জানা যায় স্ত্রী ব্রজকিশোরী, দুই ছেলে কীর্তিচাঁদ ও মিত্রসেন এবং পরিচারিকাও ছিলেন। বিদ্রোহী শোভা সিংহের দল যখন শহর বর্ধমানে পৌঁছায় তখন তাঁরা কেউ ওখানে ছিলেন না। বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ তখন ঢাকায় অবস্থান করছেন। তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা জগৎরাম বলেন। কিন্তু বয়স্ক ইব্রাহিম খাঁ এই ঘটনাকে তেমন আমল দেননি। তাঁর রাজকার্যে চরম শৈথিল্যের প্রকাশ দেখা যায়। এদিকে বিদ্রোহীরা হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমানে ৭দিন ধরে ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ করে। এরপর এরা শহর বর্ধমানে ঢুকে কৃষ্ণরাম রাইয়ের পরিবারের পঁচিশ জনকে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা অন্দরমহলে ঢোকার আগেই কৃষ্ণরামের ছ-জন স্ত্রী-সহ তেরোজন অন্তঃপুরবাসী নারী জহর ব্রত পালন করে বিষপানে নিজেদেরকে আত্মাহুতি দেন।

বর্ধমান দখল ও কোষাগার লুণ্ঠন করে শোভা সিংহ সপ্তগ্রাম, হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দননগরের দিকে রওনা হন। এই সময় নুরউল্লা খাঁ ফৌজদার হুগলিতে শোভা সিংহকে বাঁধা প্রদান করে। এই ফৌজদারের অধীনে তখন যশোহর, হুগলি, বর্ধমান,

মেদিনীপুর, হিজলি ছিল। দুর্ভাগ্য এই, শোভা সিংহ-এর কাছে এই ফৌজদার বিপর্যস্ত হয়ে প্রাণভয়ে কাতর হয়ে হুগলি দুর্গ ছেড়ে রাতেই পালিয়ে যায়। তবে শোভা সিংহ যখন চুঁচুড়া ও চন্দননগরের দিকে আক্রমণ চালায় তখন ওলন্দাজদের সহযোগিতায় স্থানীয় সাহসী প্রভাবশালী মানুষজনেরা শোভা সিংহকে রুখে দেয়। আবার বর্ধমানে ফিরে আসে। এবং এখানে ফিরে এসে মদ্যপ কামান্ধ শোভা সিংহ কৃষ্ণরাম রাইয়ের মেয়ে রাজকুমারী সত্যবতীর ঘরে প্রবেশ করে এবং জোর করে ধর্ষণ করতে এগিয়ে এলে চুলের খোঁপা থেকে তীক্ষ্ণ ছুড়ি বের করে সাহসী সত্যবতী তার পেট চিরে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শোভা সিংহের মৃত্যু ঘটে এবং সত্যবতীও সেই ছুড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন।

এদিকে পলাতক জগৎরাম ঢাকার নবাবের কাছে আর্জি পেশ করলে যশোহরের ফৌজদার ইব্রাহিমের নেতৃত্বে যে বাহিনী পাঠানো হয় তারা এত ভীতু প্রকৃতির, ভয়ে চম্পট দেয়। ইব্রাহিমকে বরখাস্ত করে তাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁ দায়িত্বলাভ করেন। এদিকে রহিম খাঁর বাহিনী লুঠতরাজ করতে থাকে—বর্ধমান থেকে চন্দননগর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এদিকে এই বাহিনীকে রাজমহলের কাছে পরাস্ত করে জবরদস্ত খাঁ। পরবর্তী ঘটনা মোকাবিলা করতে তিনি শহর বর্ধমানে শিবির স্থাপন করেন। এর মধ্যে নতুন সুবেদার হিসেবে শাহাজাদা আজিম্-উস্-সান বহাল হন। তিনি জবরদস্ত খাঁকে নিরস্ত্র থাকার আদেশ দিয়ে সসৈন্যে বর্ধমানে হাজির হন। জবরদস্ত খাঁ মন খারাপ করে বর্ধমান ছেড়ে চলে যান। আর শাহাজাদা চুপচাপ বর্ধমানে অধিষ্ঠান করতে থাকেন। এই সুযোগে রহিম খাঁ সসৈন্যে বর্ধমানের কাছাকাছি জায়গায় উপস্থিত হলে শাহাজাদা তার মন্ত্রী খাজা আনোয়ারকে রহিম খাঁর সঙ্গে সম্ঝোতা আলোচনা করতে পাঠান। বর্ধমান শিবির থেকে বাঁকা নদী পেরিয়ে খাজা আনোয়ার রহিম খাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে রহিম খাঁ অতর্কিত আক্রমণে তাঁকে হত্যা করে এবং পরে শাহাজাদার শিবির আক্রমণ করতে গিয়ে নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইভাবে দুর্ধর্ষ ঘটনার মধ্যে এই ঐতিহাসিক পটভূমিকার পরিসমাপ্তি ঘটে। বেড়ে অবস্থিত নবাব বাড়িতে খাজা আনোয়ারকে কবর দেওয়া হয়। পরে বাদশাহ ফারুকশিয়ার (১৭১৩ খ্রিঃ—১৭১৯ খ্রিঃ) সেখানে সমাধি ভবন নির্মাণ করেন। শাহাজাদা আজিম-উস্-সান নগর বর্ধমানে বছর তিনেক কাটিয়ে সুবে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। তিনি অনেক বসতবাটি, রাস্তাঘাট এবং একটি জুম্মা মসজিদ তৈরি করেন।

উল্লেখ্য এই, শোভা সিংহের বিদ্রোহ ও রহিম খাঁর লাগাতার আক্রমণে ভারতে ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্য কারবারীরা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। এইসব কারণ দেখিয়ে ব্রিটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা—সুতানটি, চুঁচুড়া, চন্দননগরে তাদের ব্যবসা কেন্দ্রগুলিকে সুরক্ষার জন্য সুবেদারের কাছে দুর্গ নির্মাণের আর্জি জানায়। এবং এই প্রথম মোঘল শাসকরা দুর্গ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, শাহাজাদা আজিম-উস্-সন যখন বর্ধমানে অবস্থান করছেন, তখন এখানে বসেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে শাহাজাদার মাধ্যমে সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলকাতার জমিদারি কেনার বাদশাহী ফরমান অর্জন করেছিল। সেই ফরমান এখনো কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। আমিও সেই চুক্তিপত্র একবার সেখানে গিয়ে দেখে এসেছি।

বর্ধমানে শান্তি ফিরে এলে পলাতক জগৎরাম স্বভূমিতে ফিরে আসেন। বাদশাহের ফরমানে তিনি পিতার সম্পত্তি ও জমিদার পদের উত্তরাধিকারী হন। আর চম্পানগরী, পাণ্ডুয়া ও জাহানাবাদ সহ বাড়তি কয়েকটি মৌজা নিয়ে অর্থাৎ সব মিলিয়ে ঊনপঞ্চাশটি মৌজার জমিদারি ও চৌধুরী পদ পুনরায় লাভ করে। দুর্ভাগ্য এই, জগৎরাম কৃষ্ণ সায়রে একবার স্নান করতে নেমে গুপ্তঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা, ১৭০২ সালের। আর উল্লেখ্য, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ পরিবারের আর কেউ

উৎসব অনুষ্ঠানে মহারানীর সঙ্গে তাঁর সন্তানদের অংশগ্রহণ

লালজি মন্দির

কখনো ভবিষ্যৎ-এ কৃষ্ণসায়রে স্নান করতে নামেননি এমনকি এই পুষ্করিণীর মাছও খাননি। রাজা জগৎরাম (১৬৯৯-১৭০২) কেবলমাত্র বছর চারেক জমিদারি দেখভাল করেন। তবে বাবা কৃষ্ণরাম রাই-এর জমিদারির কাজকর্মে উনি সবসময় পাশে থেকে সহযোগিতা করেছেন। তিনি একটি সুন্দর গ্রামের জন্ম দিয়েছেন। সেই গ্রামে তাঁত শিল্পীরা থাকতেন, তাদের হাতে তৈরি উচ্চমানের গরদের শাড়ি সকলের ভীষণ পছন্দ। তারা এই ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। বর্ধমানের কাছেই সেই গ্রামটির নাম জগদাবাদ।

জগৎরামের হঠাৎ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে শূন্যতা নেমে আসে। তবে তাঁর সুদক্ষা স্ত্রী ব্রজকিশোরী দুই ছেলে কীর্তিচাঁদ ও মিত্রসেন রাইকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ান। সাহসী এই নারী দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে জমিদারি কাজে সবসময় সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। সেই সময় খাবার জলের খুব অভাব। তিনি সাধারণ মানুষের কথা ভেবে ১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে খনন করেন বিশাল দিঘি। যা এখন সকলের কাছে 'রানীসায়র' নামে সুপরিচিত। এই যশস্বিনী রাজমাতা শুধুমাত্র বর্ধমানে তাঁর কর্মকুশলতা সীমিত রাখেননি তিনি সুদূর মহাতীর্থ বৃন্দাবন ধামে উপস্থিত থেকে ইমলিঘাটের সিড়ি নির্মাণ করেন। মধুরাধামে যমুনা নদীর তীরে দুটি ঘাট ও শিবমন্দির নির্মাণ করে এইভাবে তিনি দেশের নানা জায়গায় দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনায় আজও তাঁর প্রতিষ্ঠিত লালজির মন্দির সকলের দর্শন বস্তু।

লালজীরের এই মন্দির ২৫টি দেউল বিশিষ্ট ২৫টি শৈল্পিকচূড়া এবং মন্দিরের গায়ে সুদক্ষ শিল্পীদের সৃষ্টি টেরেকোটার কাজ অতুলনীয়। যা ভারতের আর কোথাও চোখে পড়েনি। তিনি পুরীধামেও একাধিকবার ঘুরে আসেন। সেখানে তিনি মার্কণ্ডের বড়ো দিঘির সিঁড়ি নির্মাণ করেন তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে। ভক্তিময়ী শৈবভক্ত এই রাজমাতা ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে উল্লিখিত অম্বিকা কালনায় নির্মাণ করেন বৈকুণ্ঠনাথ শিবমন্দির, যা সকলের কাছে সুপরিচিত।

রাজা জগৎরামের পর বংশের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর বড়ো ছেলে কীর্তিচাঁদ রাই-এর উপর জমিদারির কাজকর্মের ভার ন্যস্ত হয়। তাঁর সময়কাল ১৭০২-১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ছোটোভাই মিত্রসেন ও তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীকে উপযুক্ত মাসিক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সুবিশাল জমিদারি নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ছোটো ভাইকে রাজবংশের কোগাছি দুর্গে নজরবন্দী রাখা হয়। সেই অবস্থায় তাঁদের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাঁর নাম রাখা হয় তিলকচাঁদ। অপরদিকে বড়ো ছেলে জমিদার কীর্তিচাঁদ-এর বিয়ে হয় পাঞ্জাবের ট্যান্ডন পরিবারের বুলচাঁদের মেয়ে রাজরাজেশ্বরীর সঙ্গে। বিয়ের পরে পরেই কীর্তিচাঁদের শ্বশুর মহাশয় বুলচাঁদ, তাঁর বাবা পীতাম্বর, ভাই ফতেচাঁদ সকলেই পরিবার-সহ পাঞ্জাব ছেড়ে মেয়ে-জামাইয়ের রাজগৃহে বর্ধমানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন।

জমিদার কীর্তিচাঁদ ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন। এই উর্জিতেজা মানুষটি জমিদারি পাওয়ার এক বছরের মধ্যেই দিল্লির বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ পেয়ে যান। এইটিই প্রথম সনদ। এর পর তিনি দ্বিতীয় সনদ পান ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে তখন দিল্লির সিংহাসনে ছিলেন বাদশাহ মহম্মদ শা। এই ফরমান-এ জমিদার কীর্তিচাঁদ সকল বিজিতদের কাছ থেকে এবং জমিদারি ট্যাক্স সংগ্রহ দস্যু ও চোর-ডাকাতদের দমন করবার জন্য আইন প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করলেন। এর ফলে 'রাজা' উপাধি না দেশের সুধিজনেরা তাঁকে মহারাজা বলে মান্যতা দিতেন। সেই সময়ের স্বনামখ্যাত কবি ব্যক্তিত্ব ঘনরাম 'ধর্মমঙ্গল' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে কীর্তিচাঁদকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

'অখিলে বিখ্যাত কীর্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান'
চিন্ত তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি, দ্বিজঘনরাম রসগান'।

লাউসেন-এর পালায় কবি শিরোমণি ঘনরাম উচ্চারণ করলেন:

নূতন মঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গান। মহারাজা কীর্তিচন্দ্র করিয়া কল্যাণ।

উল্লেখ্য, কবি ঘনরাম চক্রবর্তীকে জমিদার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

নদিয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মহাকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার-এর কলমে কীর্তিচাঁদের জয়গাঁথা উঠে আসে।

সুবে বাংলার শক্তিশালী এই জমিদার কীর্তিচাঁদ নতুন ট্যাক্স নীতিকে ফলপ্রসু করায় বর্ধমান চাকলার বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়। এর ফলে সাতান্নটি পরগনার জমিস্বত্ত্ব লাভ করে। যার সীমানা পাঁচ হাজার বর্গমাইলে পৌঁছেছিল। বছরে রাজস্ব দিতে হত কুড়ি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছ'টাকা।

আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল কীর্তিচাঁদ-এর। সেই সময় বাংলায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল জটিল। সেই প্রেক্ষিতে নিহত বিদ্রোহী শোভা সিংহ-এর দু-ভাই যথাক্রমে হিম্মত সিংহ এবং মহা সিংহকে সরাসরি যুদ্ধে ঘায়েল ও পরাস্ত করে। এই কীর্তিকে সম্মান জানাতে সেই সময় বর্ধমানের কাঞ্চননগরে তৈরি হয় বারদুয়ারী তোরণ। আমার মতো যে কেউ এখন এসে সেই তোরণ দেখতে পারেন—ঘষামাজা রূপে। যার দশ মিটার উচ্চতা এবং চওড়া ৭ মিটার। তিন কিলোমিটার ব্যাপী কাঞ্চননগরকে কীর্তিচাঁদ সুন্দরভাবে গড়ে তোলেন। রাঢ় অঞ্চলের অন্যতম নগর। বাদশাহ-এর কাছ থেকে যে জমিদারি কীর্তিচাঁদ অর্জন করেছিলেন তার মধ্যে একান্ন মহাপীঠের অন্যতম ক্ষীরগ্রামও যোগযুক্ত। এখানে দেবীর ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়। যেখানে যোগদ্যা মা স্বয়ং রয়েছেন। রাজ্য সরকারও তার দেখভাল করছেন।

বর্ধমানের কাছে হাট কীর্তিনগর কীর্তিচাঁদের তৈরি করা। আজ প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। আর দুটি কীর্তি এখন সুন্দরভাবে আছে যা রাজগঞ্জ এড়িয়ার অন্তর্ভুক্ত। মোহন্ত-স্থল—এখানে আছে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবীয় মঠ। এখানে 'রাধা দামোদর' বিগ্রহ অবস্থান করছেন। আমাদের কিশোরবেলায় দেখেছি এখানে উৎসব

বারদুয়ারী তোরণ—১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দ

উপলক্ষে সুন্দরভাবে সাজানো হত। যাত্রাপালার আসর বসত। স্পষ্ট স্মৃতিতে আছে এখানে এসে বিখ্যাত সোনাই দীঘি যাত্রাপালা উপভোগ করি। নানা প্রদর্শনী। রাজ পরিবারের ব্যবহৃত বাসনকোসন তৈজস পত্র প্রদর্শিত হত। বড়ো মেলা বসত। আর একটি কীর্তচাঁদের অন্যতম কীর্তি হল—উঁনি বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ষষ্ঠ শতকে কুব্জিকা তন্ত্রে বর্ধমানের মঙ্গলা দেবীর কথা পাওয়া যায়। মানিক দত্ত, মানিক গাঙ্গুলীর কাব্যে এই দেবীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তিনি আছেন পূর্ণ মর্যাদায়। বিশিষ্ট কবি রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে উঁনি দেবীকে বর্ণনা করেছেন খুব সুন্দরভাবে—

'বর্দ্ধমানে বন্দোদেবী সর্ব্বমঙ্গলা।
অধিষ্ঠান হন দেবী ঠিক দুপুরবেলা॥'

উল্লেখ্য, এই মন্দির চত্বরে দেবী মন্দির ঘিরে অনেকগুলি শিব মন্দিরও আছে।

কীর্তিচাঁদ আরও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জৌগ্রামের শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দে, কামার পাড়ার শিব মন্দির ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে, খাঁদরার রাধামাধব-এর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয় ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে, জাবুইগ্রামে হরগৌরী মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে—লক্ষ্মী জনার্দনের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় রামগোপালপুরে। ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে বড়ো বৈনানে প্রতিষ্ঠা হয় বিষ্ণু মন্দির। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে উখরায় প্রতিষ্ঠিত হয় সীতারাম মন্দির।

কীর্তিচাঁদ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে তাঁর একমাত্র ছেলে চিত্রসেন রাজ সিংহাসনের অধিকারী হন। বাবার সমস্ত সম্পত্তি ও জমিদারীর কর্তৃত্ব করেন। তিনিই প্রথম যিনি দিল্লির সম্রাট-এর কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। তাঁর মেয়াদ কাল মাত্র চার বছর ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। বাদশাহের কাছ থেকে ১২টি ফরমান ও পরোয়ানা পেয়েছিলেন। রাজার কাজকর্মে খুশি হয়ে সেই সময় বাদশাহের আদেশ ছাড়া কোনো জমিদারই কোনো পরোয়ানা নিতে পারতেন না, শুধুমাত্র বর্ধমানরাজ চিত্রসেন-ই সেই অধিকার অর্জন করেছিলেন।

সর্বমঙ্গলা মন্দির

রাজার দুই স্ত্রী। ছন্দকুমারী বড়ো, যিনি ছিলেন কাশীরাম শেঠ তলোওয়ার-এর মেয়ে। আর ছোটো রানী ইন্দুকুমারী ছিলেন ধরমচাঁদ মেয়েরার মেয়ে। যিনি কানপুর থেকে সরাসরি অম্বিকা কালনায় এসে বসবাস শুরু করেন। এদের কারোরই কোনো সন্তান ছিল না। চিত্রসেন সুনিষ্ঠ ও বড়োই শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তাঁর রাজসভার সভাপণ্ডিত ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত ও বিশিষ্ট কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। এই কবি সংস্কৃত ভাষায় রাজার জীবনী লিখেছিলেন। তাঁর রচনায় পাই যে রাজা দেব-দেবী সেবা, দুঃস্থ মানুষদেরকে নিয়মিত সাহায্য করতেন। তাদের নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। সেই সময় বাংলার সুবেদার ছিলেন নবাব আলিবর্দী খাঁ। তিনি

একবার ওড়িষার বিদ্রোহ দমন সেরে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাস নাগাদ তিনি বর্ধমানে রানী সায়রের পাড়ে এসে শিবির স্থাপন করে থাকেন। এদিকে মারাঠী সৈন্য বিশ হাজার অশ্বারোহী বর্গী নিয়ে বর্ধমানে হাজির হন দলপতি ভাস্কর রাম বর্ধমানে। ১৭৪২ সালের পনেরো এপ্রিল শেষ রাতে নবাবের শিবির আক্রমণ করে বসেন বিনা নোটিশে। শহরের অন্য প্রান্তে আগুন লাগিয়ে দেয়, রীতিমতো লুঠতরাজ শুরু করে দেয় মারাঠী বর্গীরা। ওরা সরাসরি নবাবী শিবিরকে ঘায়েল করতে না পেরে খাবার দাবার যাতে বন্ধ হয় সেজন্য শিবির ঘেরাও করে রাখে। এর ফলে সেনারা তিনদিন সম্পূর্ণ উপোস ছিল। বাংলার নবাবও তখন বর্ধমানে দিন সাতেক থাকতে বাধ্য হন। নগর বর্ধমানকে মাঝে রেখে মারাঠী দস্যুরা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বর্গমাইল জুড়ে লুঠতরাজ চালায় ভীষণভাবে। সাধারণ মানুষের জীবনকে নাজেহাল করে দেয়। এই ভয়াল পরিস্থিতিতে নবাব ঠিক করলেন বাইশে এপ্রিল মারাঠীদের কুচক্র ভেদ করে কাটোয়ার দিকে যাওয়া। নবাব কুলীদের ও মেয়েদের বর্ধমানে রেখে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু বর্গীদের ভয়ে তারা কেউ বর্ধমানে থাকতে চাইছে না। ২৪ এপ্রিল শেষ রাতে ভীষণ যুদ্ধ হয় নবাবের সৈন্যদের সঙ্গে মারাঠী বর্গীদের। সেনাধ্যক্ষ-এর পুত্র কোনওক্রমে বেগমকে উদ্ধার করেন, নিজের প্রাণত্যাগের বিনিময়ে। কোনওক্রমে নবাব আলিবর্দী খাঁ কাটোয়ায় পৌঁছায়। কিন্তু তার আগেই ওরা কাটোয়ার শস্যভাণ্ডারকে পুড়িয়ে ফেলে। বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম, কাটোয়া, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের বিশাল এলাকায় সবকিছু তছনছ করে দেয়। দাঁইহাটে কীর্তিচাঁদের বিশাল জমিদার বাড়ি দস্যুরা দখল করে নিয়ে ওখানে থাকতে শুরু করে। এইভাবে সাধারণ মানুষদের জীবন বর্গীরা তছনছ করে দেয়। বর্ধমানের রাজা ওদের সঙ্গে যুঝতে সর্বোচ্চ পদে আসীন সেক্রেটারিকে দায়িত্ব দেন। উনি শরণার্থীদের নিয়ে বিশাল নগরীতে হাজির হন। বর্ধমানরাজ বর্গীদের দমনে চেষ্টার কসুর করেননি।

তিলকচাঁদ রাই

রাজা চিত্র সেন অম্বিকা কালনায় সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরকে নবরূপে সাজায়। রাজার পরিবারের কেউ মারা গেলে চিতাভস্ম সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা তিনিই প্রথম করেন। ইন্দ্রেশ্বর শিব মন্দির তিনিই নির্মাণ করেন। এর পরে রাজ সিংহাসনে বসেন তিলকচাঁদ। তিনি ছিলেন রাজা চিত্রসেন-এর কাকার ছেলে। তাঁর রাজত্বের সময়কাল ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময় সারা দেশে নানা ঘটনাবলীর ভিড়। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ মহম্মদ শাহ-এর মৃত্যুর পরে দিল্লির মসনদে আহাম্মদ শাহ। তাঁর কর্তৃত্ব চলে ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই বাদশাহের কাছ থেকে তিলকচাঁদ রাই ফরমান পান ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে।

১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ আলম দিল্লিতে বসেন। তাঁর রাজত্ব চলে একেবারে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ইতিমধ্যে বাংলায় তথা ভারতের ইতিহাসের পট পরিবর্তন ঘটে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে নদিয়ার পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের সহযোগিতায় ইংরেজরা। কবিগুরুর ভাষায়—বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে। স্বাভাবিকভাবে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হল। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান পরগনা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে হস্তান্তর হয়। বর্ধমান মহারাজাধিরাজ তিলকচাঁদ ১৭৬০-৬১-র ট্যাক্স কোম্পানিকে দেন। ১৭৬২-১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি বর্ধমান চাকলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজ দখলে রেখে বর্ধমান রাজাকে মালিকানা প্রদান করে। এদিকে ইংরেজের হাতের পুতুল হয়ে নবাবীতে এলেন মীরজাফর। অপরদিকে মারাঠী বাহিনি শিউভাট-এর নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী সৈন্য বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলে অগ্নি সংযোগ ও লুঠতরাজ করতে থাকে। তখন নবাব মীরজাফর তাঁর জামাইকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে সৈন্যসহ বর্ধমানে হাজির। মীরজাফর মহারাজ তিলকচাঁদ-এর কাছে দশ লক্ষ টাকা দাবি করলেন। সেই টাকা থেকে মারাঠী সেনানায়ক শিউভাটকে

মীরজাফর

সাত লক্ষ টাকা দিয়ে দেন। সেই টাকা হাতে নিয়ে মারাঠীরা ওড়িষার কটকে ফিরে যায়। এদিকে দিল্লিতে দ্বিতীয় আলমগীরের ছেলে শাহ আলমের কাছে বাংলার জমিদাররা অপশাসক মীরজাফরের বিরুদ্ধে আর্জি পেশ করে। শাহ আলম বাংলাকে নিজের কব্জায় রাখতে বীরভূম, বর্ধমান পেরিয়ে বিষ্ণুপুরে সেনা ছাউনি ফেলে। তিনিও মারাঠীদের মতো মহারাজ তিলকচাঁদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ নিয়ে এলাহাবাদে ফিরে যান। মহারাজ তিলকচাঁদের সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্ম হয়। পলাশীর যুদ্ধে জিতে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িষা তাদের দখলে রাখে।

মহারাজ তিলকচাঁদ পরাক্রমী রাজা ছিলেন। পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভ বর্ধমান রাজের কাছে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সাহায্যের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু রাজা সরাসরি সেই আবেদন নাকচ করে দিলেন। উল্টে কোম্পানির দখলীকৃত এলাকায় কোম্পানির কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। এই বিষয়ে রেভারেন্ড লং সাহেবের গ্রন্থ: Unpublished Records of Government-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে: 'Tilak Chand was the Raja of Burdwan at this time; he was very much rich and wielded all the powers of Feudal chieftain in his district, as may be seen in this fact, he shut up all the English factories and stopped their business'. এরপর সমস্ত কিছু জানিয়ে কোম্পানি নবাবের কাছে আবেদন করে ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে পয়লা এপ্রিল যাতে আবার কোম্পানী ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে। ওই আবেদনের ভিত্তিতে নবাব ইংরেজের পক্ষে ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ম বর্ধমান মহারাজের কাছে এক আদেশনামা পাঠান। ওই আদেশবলে মহারাজা ইংরেজদের সব কুঠি হস্তান্তর করেন। তিলকচাঁদের সময়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে থাকে। একদিকে মুঘল রাজত্বের অন্তিম পর্যায়, অপরদিকে ইংরেজদের আগমন, পলাশীর যুদ্ধ, বর্গীদের অত্যাচার, মুঘল সৈন্যদের দ্বারা ফসলী জমি নষ্ট, বাংলার জমিদারের বিপর্যয়, সাধারণ মানুষ অতিমাত্রায় নাজেহাল। রাজার সেনাপতিরাও অদক্ষতার পরিচয় রাখে। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ—এইসব কারণে ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষিকাজে বলতে গেলে ভাঁটা পড়ে যায়। এইসব ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও মহারাজ তিলকচাঁদ সাধারণ মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠে।

দেওয়ান পরাণচাঁদ কাপুর

তিলকচাঁদের মৃত্যুর পরে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ছেলে তেজচাঁদ বর্ধমানের রাজ সিংহাসনে আসীন হন। তাঁর রাজত্বকাল ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু রাজাকে এখানে নিয়ন্ত্রণ করতো তাঁর দেওয়ান পরাণচাঁদ কাপুর। তার কথাতেই উঠত বসত। রাজার কর্মে নানা গলদ থাকার ফলে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ছেলে প্রতাপচাঁদ জমিদারি দেখভাল করতেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বুঝতে পারলেন যে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের নানারকম ফাঁক-ফোঁকর আছে। জমিদারদের স্বত্ত্ব তাতে ব্যাহত হচ্ছে। তিনি তাই সবদিক খুঁটিয়ে দেখে সরকারের কাছে এই বিষয়ে আর্জি পেশ

করে। পরবর্তী সময়ে সরকার তা বিবেচনা করে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম আইন প্রণয়ন করে থাকে (Regulation Act VIII of 1819)। এর ফাঁকে গোটা বাংলার অন্যান্য জমিদারদের থেকে তুলনায় বর্ধমান রাজ বেশি রাজস্ব সরকারের ঘরে জমা দেওয়ার ফলে বর্ধমানরাজ পত্তনিপ্রথা শুরু করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই কুচক্রীদের খপ্পরে পড়ে প্রতাপচাঁদ ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন। স্বাভাবিকভাবে তেজচাঁদ আবার রাজ সিংহাসনে বসলেন। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে তেজচাঁদ দেহত্যাগ করলেন।

মহারাজ প্রতাপচাঁদ

মহারাজ তেজচাঁদ-এর বড়ো অবদান শিক্ষাক্ষেত্রে। তিনি ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখন সেই স্কুলের নাম বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল। এক সময় এই কলমচিও এই স্কুলে শিক্ষকতা কর্মে যুক্ত ছিল বেশ কিছুদিন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'—দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে—ফিউডাল শ্রেণীর প্রতিভূ এক মহারাজা—যাঁর রক্তে বংশানুক্রমিকভাবে পরিবর্তনবিমুখ ঐতিহ্য থাকার কথা, তাঁর এই সংস্কারমুক্ত মন ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট বিস্ময় উৎপাদন করে। উল্লেখ্য, তাঁর একমাত্র ছেলে প্রতাপচাঁদকে বাবা চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে। সেইজন্য তিনি তাঁর ছেলের গৃহ-শিক্ষক হিসেবে রেখেছিলেন চার্লস্ ড্যু বোড্যু মহোদয়কে। যিনি ফরাসী ছিলেন। তিনি ছেলের স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন।

বিদেশী শিক্ষার পাশাপাশি মহারাজ তেজচাঁদ মেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়ে ভীষণ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, মেয়েরা লেখাপড়া না জানলে সমাজ পরিবার অন্ধকারে ডুবে থাকবে। তাঁর নিজের পরিবারের সকলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, এর পাশাপাশি সাধারণ পরিবারের মেয়েরাও যাতে বিদ্যার্জন করতে পারে সেদিকে তাঁর সুনজর ছিল। বর্ধমানে মিশনারীদের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বর্ধমান রাজার অর্থ সাহায্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্কুলগুলির মধ্যে 'বিবি ডিয়ার' নামে এক ইংরেজ মহিলা পরিচালিত স্কুলটি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিল। এই মহিলার নেতৃত্বে বর্ধমানের গ্রামেতে এইরূপ চারটি পাঠশালা চলত। সেখানে ১৯৯ জন মেয়ে পড়াশুনা করত। এই খবর 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার পাতায় 'বালিকাদের বিদ্যাভ্যাস' শীর্ষক সংবাদ থেকে জানা যায়।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'-র প্রথম খণ্ড থেকে জানতে পারা যায় 'বিবি পিয়ন' নামে সদাশয় এক ইংরেজ মহিলার দক্ষ পরিচালনায় ১২টি মেয়েদের পাঠশালা জোরকদমে চলত। তারপর উনি নিজের দেশে ফিরে যান স্বামীর অসুস্থতার খবর পেয়ে।

নারী শিক্ষা বিস্তারে মহারাজা তেজচাঁদ-এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বর্ধমান, হুগলির বাঁশবেড়িয়া, কাটোয়া, কালনায় চারটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ছাত্রীসংখ্যা ১৭৫ জন। এর মধ্যে খ্রিস্টান ছিল ৩৬ জন এবং মুসলিম ছাত্রী একজন পড়ত।

মহাধিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুর

মহারাজ তেজচাঁদের শিক্ষা খুব বেশি ছিল না। কিন্তু মহারানী কমল কুমারী এবং প্যারী কুমারী যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বেথুন সাহেব 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় বর্ধমান রাজবাটিতে, নাটোরের রাজবাটিতে স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রথা ছিল। বর্ধমান রাজ, তেজচাঁদ, প্রতাপচাঁদ ও তাঁর দুই মহীষী শিক্ষিত। শিক্ষাবিস্তারে তাঁদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এইসব কথা 'সংবাদ ভাস্কর'-এর পত্রিকার পাতায় সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মর্যাদা দিয়ে উল্লেখ করেছেন। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ও 'জাল প্রতাপচাঁদ বাঙালির সারস্বত অবদান'-এর উল্লেখ করেছেন। তেজচাঁদ বুঝেছিলেন শিক্ষা ছাড়া বাঙালীর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার নান্য পন্থা। বাংলার অন্যান্য রাজন্যবর্গের তুলনায় শিক্ষা বিস্তারে বর্থমান রাজের ভূমিকা সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবি করতে পারে।

মহারাজ তেজচাঁদ-এর মৃত্যুর পর তাঁর বালক দত্তক ছেলে মহাতাবচাঁদ রাজ সিংহাসনে বসেন ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি রাজত্ব করেন ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময় মুঘল শাসনের প্রায় অবসান এবং ইংরেজ শাসনের বাড়বাড়ন্ত।

দ্বিতীয় শাহ আলম-এর পর দ্বিতীয় আকবর শাহ দিল্লির বাদশাহ ছিলেন। তিনি ছিলেন ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এর পরেই মুঘল শাসনের সম্পূর্ণ বিদায়। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ-এর সময় থেকেই ইংরেজ শাসনের বিস্তার ঘটে।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মহাতাবচাঁদ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক-এর কাছ থেকে 'মহারাজাধিরাজ' খেতাব লাভ করেন। সেই সময় বাংলার জমিদারদের মধ্যে একমাত্র বর্ধমান রাজ মহাতাবচাঁদ-ই তাঁর নামের আগে His Highness লেখার অনুমতি পান। বর্ধমানের 'রাজপ্রতীক'টিও গভর্নর জেনারেল দ্বারা অনুমোদিত হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে। তবে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় মহারাজ মহাতাবচাঁদ ইংরেজ সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সৈন্য পাঠানোর জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করেছিলেন। খবরাখবর আনার জন্য রাজা ন'জন অশ্বারোহীকে পাঠিয়েছিলেন। আট-আটটি হাতি ছিল সৈনিকদের নেওয়ার জন্য। ১৬টি গরুর গাড়ি ছিল। ২২ জুন থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত শহর বর্ধমানকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ২০ জন সৈনিককে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইংরেজদের রক্ষার জন্য মহারাজ রাজবাড়ির একাংশ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। যাদের বন্দুক ছিল না তাদের বন্দুক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের কাজে পর্যবেক্ষণের জন্য জিটি রোডে পানাগড় থেকে চৈতখণ্ড পর্যন্ত ১০ জুলাই থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং মান্যতা দেওয়ার জন্য ভারতের গভর্ণর জেনারেল মহারাজ মহতাব চাঁদকে ভারতের 'ব্যাবস্থাপক সভার' সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর ব্যাবস্থাপক সভার মিটিং-এ যাওয়ার জন্য বর্ধমান মহারাজকে ভারত সরকারের সচিবের কাছ থেকে বিশেষ চিঠি এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিবের কাছ থেকে অনুমতিপত্র দেওয়া হয়।

মহতাব চাঁদ

মহারাজ মহতাব চাঁদ যখন জমিদারি করার সনদ পান, তখন ইংরেজদের আধিপত্য বেশ শক্তপোক্ত। ফলে, ইংরেজের প্রভুত্ব অস্বীকার করার উপায় ছিল না সেই মুহূর্তে। তবে কেউ কেউ মনে করেন, মহারাজের বিরাট ভুল হয়েছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের পাশে দাঁড়ানো। সেই সময় রাজাদের এমন কোনো বল ছিল না যে সকলে একত্রে ইংরেজদের কাজে বাঁধা দেবেন। মহতাব চাঁদ অনুগত হওয়ার ফলে সরকারের কাছে তিনি বিশেষ ব্যক্তিরূপে সম্মান পেতেন। তবে এটি স্বীকার্য তিনি জনস্বার্থে প্রচুর ভালো কাজও আগ্রহের সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন।

বাংলায় দুর্ভিক্ষ হল ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। এর পরে পরেই ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'বর্ধমান জ্বর' নামে একপ্রকার ম্যালেরিয়া এসে মহামারী আকার ধারণ করে। দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে বর্ধমান, হুগলি জেলার অগণিত গ্রামে-গঞ্জে। বর্ধমান মহারাজ

মহতাব চাঁদ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভীষণভাবে এগিয়ে এলেন। সাধারণ মানুষ যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে সেজন্য তিনি অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করেননি। বিভিন্ন বস্তি অঞ্চলে আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে স্বাস্থ্যকর্মী দল, চিকিৎসা ও পথ্যের যোগান দেয়। মানবদরদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেবাপরায়ণ সুচিকিৎসক ডাঃ গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহোদয়দের জন্য বর্ধমান রাজ বর্ধমানে কেশব গঞ্জের কমল সায়র এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির গঠনে সাহায্য করেছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় সরকারের কাছে ডাক্তার ও ঔষধের জন্য আবেদন করেছিলেন। সরকার বহু ডাক্তার নিয়োগ ও দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে দেন। অপরদিকে, রাজা মহতাব চাঁদ নিজে বর্ধমান, হুগলি, চুঁচুড়ার বিভিন্ন এলাকায় নিজব্যয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঔষধ পথ্যের সুব্যবস্থা করেন। তিনি বাংলার সরকারকে চিকিৎসার জন্য এককালীন ৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার) দিয়েছিলেন। এর ফলে সেই অঞ্চলে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচে। তিনি অন্নসত্র খুলেছিলেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের জন্য। দীর্ঘ লাইনে বসে তারা সুন্দরভাবে খাবার খেতেন এবং পরিবেশনকারীরাও সযত্নে খাবার পরিবেশন করতেন। দুর্ভিক্ষ একটু ভালোর দিকে ফিরলে তখন পীড়িত মানুষদের হাতে বস্ত্র ও পাথেয় দিয়ে বিদায় দিতেন—এইসব কথা রাখালদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থ 'রাজবংশানুচরিত' শীর্ষক থেকে জানতে পারি। ভারতের গভর্নর জেনারেল তখন একটি রিলিফ কমিটিতে রাজাকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। রাজার সাধারণ মানুষের প্রতি সহজ দরদী মনোভাব শুধুমাত্র তাঁর নিজের জেলা বা রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না সুদূর দক্ষিণ ভারতেও তাঁর অবদান ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে সর্বপ্রথম পেনশন প্রথা চালু করেন। হঠাৎ কোনো কর্মচারী মারা গেলে তার ছেলে বাবার পেনশনের অধিকারী হত। যদি কেউ নাবালক থাকে সেই পরিবারের মনোনীত ব্যক্তি বা আত্মীয় সেই পেনশন পাবার অধিকার লাভ করত। এইসব কিশোর বালকদের শিক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব মাসিক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা রাজা চালু করেছিলেন।

রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণে মহারাজদের রক্ষিবাহিনী

এইসব ছাড়াও, মহারাজ মহতাব চাঁদ ভীষণভাবে সাহিত্যপিপাসু ছিলেন। তাঁর রাজসভায় বহু সুপণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ থাকতেন—রামতনু তর্ক সিদ্ধান্ত, ব্রজেন্দ্র কুমার বিদ্যারত্ন, তারকনাথ তত্ত্বরত্ন, পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন, অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ অলঙ্কৃত করতেন। দেশবিখ্যাত ডাক্তার, বৈদ্য, পণ্ডিতগণ কমল কবিসৃষ্ট ভোলানাথ কবিরাজও উপস্থিত থাকতেন। সঙ্গীতে প্রসিদ্ধ যদুনাথ ভট্ট, বাদ্য বিশারদ উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজকার্য কুশলী তারকনাথ সেন, তারাপদ চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ ঘোষ, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতি মন্ত্রীগণ রাজসভা আলোকময় করে রাখতেন।

মহারাজ মহতাব চাঁদ স্ত্রীশিক্ষার জন্য অনেক কাজ করেছেন। তিনি বর্ধমানে একটি এবং অম্বিকা কালনায় একটি মেয়েদের স্কুল চালু করেছিলেন। কবীন্দ্র রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী করুণাময়ী দেবী শিক্ষকতা করতেন বর্ধমানের বালিকা বিদ্যালয়ে। তাঁর বড়ো মেয়ে অম্বুজা সুন্দরী দেবী ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হয়েছিলেন। তাঁরই প্রিয় ছাত্রী ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শৈলবালা ঘোষ জায়া। এই স্কুলের বর্তমান নাম মহারানী অধিরানী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যা ১২৫৮ বাংলা সন থেকে জানা যায়, এই বর্ধমান রাজ সেই সময়ে বেথুন স্কুলে ৫০০ টাকা এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত স্কুলকে ১০০০ টাকা দান করেন। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য তিনি নৈশ বিদ্যালয় খুলেছিলেন। এছাড়া তিনি ছবি আঁকার স্কুল ও জিমনাসিয়াম খুলেছিলেন। বিধবা মহলারানী নারায়ণ

কুমারী দেবীও 'শারীরিক উন্নতি সাধনী সভায়' অর্থাৎ শরীর শিক্ষণ সংস্থায় ৫০০ টাকা দান করেছিলেন। এইসব খবর সেই সময় 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার ডিসেম্বর, ১৮৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁর সময়ে, বর্ধমানে জোড়াসাঁকো থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর মহাশয়েরা নিয়মিত আসতেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাশে মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মহতাব চাঁদ ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে 'First Man of Bengal' আখ্যা দিয়েছিলেন।

মহারাজা বিপুল অর্থ ব্যয় করে বাল্মীকি রামায়ণ, ব্যাসদেব রচিত মহাভারত, হরিবংশ, সিকন্দরনামা, চাহার দরবেশ, আলাওল প্রমুখ লেখকদের বহু বই বাংলায় অনুবাদ করিয়ে সব জায়গায় বিনামূল্যে বিতরণের সুব্যবস্থা করেছিলেন। মহারাজ মহতাব চাঁদ শুধুমাত্র শিক্ষানুরাগী, সাহিত্য-পিপাসুই ছিলেন না, তিনি প্রচুর গান লিখেছিলেন, বহু পদ রচনা করেছিলেন। আধ্যাত্মিক গান ছাড়াও তিনি বহু রোমান্টিক গান লিখেছিলেন। সংখ্যায় ও গুণগত মান উচ্চমানের। সব মিলিয়ে তিনি মোট সতেরোশো সাতানব্বইটি গান লিখেছিলেন। মহতাব চাঁদের পর তাঁর দত্তক ছেলে আফতাব চাঁদ মহাতাব-এর রাজত্বকাল স্বল্প সময়ের। তিনি সিংহাসনে বসেন ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে এবং তিনি মারা যান ২৫ মার্চ, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ তিনি প্রকৃত অর্থে তিন বছর তিন মাস রাজ সিংহাসনে বসেছিলেন। ফলে জনগণের কল্যাণের জন্য খুব বেশি কাজ করার সুযোগ পাননি। তবুও এর মধ্যেই তিনি খাবার জলের উপযোগী বড়ো দিঘি খনন করেছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায়। শহর বর্ধমানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেইজন্য তিনি বর্ধমান পৌরসভাকে (প্রতিষ্ঠা—১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ) বিশুদ্ধ খাবার জলের জন্য এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দেন। লাকুর্ডি এলাকায় তা নির্মাণ হয়। মহারাজাধিরাজ দেব-দেউল প্রতিষ্ঠার থেকে বেশি লক্ষ্য দেন জনস্বাস্থ্যের দিকে। তিনি দার্জিলিং-এ দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য দশ হাজার টাকা দেন, বর্ধমান সরকারি হাসপাতালে চক্ষু বিভাগ চালু করেন। তিনি মাঝে মাঝে হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের দেখে আসতেন। রোগীদের হাতে গোপনে টাকা দিয়ে আসতেন। জেলখানায় তিনি নিজে গিয়ে যেসব কয়েদি টাকার জন্য জেল খাঁটছে, তাদের জন্য টাকা দিয়ে তিনি তাদের মুক্ত করে আনতেন।

আফতাব চাঁদ মহতাব-এর লেখাপড়ার প্রতি টান ছিল। এর একটা দিক এখানে তুলে ধরছি যা আগের রাজারা এবং সরকারও তা চিন্তা করেননি, তা হল তিনি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে, ন' হাজার টাকা খরচ করে তিনি নগর বর্ধমানে এই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে তিনি কৃতী মানুষদের হাতে দায়িত্ব দেন দেখাশোনার এবং রাজ্য সরকার সমস্ত ব্যয় বহন করে। পরে এই সাধারণ গ্রন্থাগারটি এখন সকলের কাছে উদয়চাঁদ গ্রন্থাগার বলে সুপরিচিত।

মহারাজাধিরাজ আফতাব চাঁদ

আর রাজ নির্মিত বড়ো গৃহে এই গ্রন্থাগারের নাম ছিল 'রাজ পাবলিক লাইব্রেরি, যা বর্ধমান রূপমহল সিনেমার পাশে ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি আরও বড়ো কাজ করেছিলেন—দুই কৃতী ছাত্রকে ৫০ টাকা করে ১০০ টাকা এবং দুজন ভালো অধ্যাপককে ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা বছরে বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। সেজন্য রাজ্য সরকারকে তিনি এককালীন এক হাজার টাকা দেন। সেই টাকা পেয়ে সচিব মিঃ সি এস বেলী সাহেব শিক্ষা দপ্তরের ডিরেক্টরকে অবগত করান।

মহারাজাধিরাজ আফতাব চাঁদ মহাতাব-এর মৃত্যুর দু-বছর পর তাঁর মহিষী বেন দেয় দেবী, রাজা বনবিহারী কাপুরের একমাত্র ছেলে বিজনবিহারীকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। তখন তাঁর নাম হয় বিজয় চাঁদ মহতাব।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩মে বিজয় চাঁদ-এর চূড়াকরণ সম্পন্ন হয়। এর পরে পরেই মহারাণী বেনদেয় দেবী পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। গভর্নর এনড্রু ফ্রেজার মহারাজ বিজয়

চাঁদকে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য করে নেন ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মিন্টোস রিফমস অনুসারে ভারতে প্রথম নির্বাচন চালু হয়। বাংলার জমিদাররা নিজ নিজ অঞ্চলে নির্বাচিত হন। বর্ধমানের মহারাজা বিজয় চাঁদও বিপুলভাবে ভোটে জয়ী হন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মহানগর কলকাতার উন্নয়নের জন্য Calcutta Improvement Trust বিলের প্রস্তাব রাখেন। বাস্তবে ভারতীয় সদস্যরা উপস্থিত না হওয়ার ফলে তা বাতিল হয়ে যায়। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই সময় ভারতে এসে লর্ড কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করে দেন। তিনি এককভাবে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচিত হয়ে আসেন। তিনি কোনো দলের মেম্বার হয়ে ভোটে দাঁড়াননি। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে Calcutta Municipal Amendment বিল, যার লক্ষ্য ছিল সরকারের 'ভেজাল' নিরোধক আইন পাশ করানো, এই বিষয়ে আলোচনা হয়। মহারাজ বিজয় চাঁদ এখানে বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এই বিল পাশ হয় এবং ভেজালকারির শাস্তির বিধান প্রয়োগ করা হয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরানোর আগে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানি মেরী কলকাতা এসেছিলেন। উদ্দেশ্য, সারা বাংলায় রাজনৈতিক দলগুলির ভিতরে যে অস্থিরতা চলছিল সেই সময় তা বোঝার জন্য এবং তা কীভাবে প্রশমিত করা যায়। ব্রিটিশ সরকারের ভাবনা ছিল, যদি সম্রাট এখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর মত ব্যক্ত করেন তাহলে হয়তো উত্তেজনা থামতে পারে। সেই ভাবনা থেকেই কলকাতায় সম্রাটের আসা। এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক, তাঁদের অভ্যর্থনা ও দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হল বর্ধমানরাজ বিজয় চাঁদ-এর উপর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার রাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর মহোদয়। এইসব কাজকর্মে সুন্দর ব্যবস্থাপনার সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বিজয় চাঁদ এবং তিনি সকলের প্রিয়পাত্রও ছিলেন।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরি

বড়লাট হয়ে ভারতে এলেন রোনাল্ডসে, কারমাইকেল মহোদয়ের পরে। এই সময় কাউন্সিল-এর পদ খালি থাকায় নতুন বড়লাট মহারাজ বিজয় চাঁদ-এর নাম প্রস্তাব করে ইংল্যান্ডে চিঠি পাঠান। কিন্তু তখন কারমাইকেল ও হার্ডিঞ্জ তার পক্ষে মত না দিয়ে বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত রোনাল্ডস্-এর মতকে গুরুত্ব দিয়ে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে মনোনীত হলেন বিজয় চাঁদ মহোদয়।

স্বদেশী আন্দোলন সেইসময় তীব্রভাবে চলছে, দেশ তোলপাড়। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে পুলিশী অত্যাচার শুরু হল। তখন বিখ্যাত জননেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারকে সরাসরি জানান। অভিযোগ পেয়ে সরকার বিজয় চাঁদকে তদন্তের ভার ন্যস্ত করেন। বিজয় চাঁদ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানালেন যে, তাঁর সঙ্গে বর্ধমানের বিশিষ্ট

প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর

সমাজসেবী রাজবিহারী ঘোষ কিংবা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় যেন সঙ্গে থাকেন। সরকার বিজয় চাঁদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে সম্মতি দেন। তাঁদের সহযোগিতায় সঠিক রিপোর্ট পেশ করেন, সরকার সেইরূপ পুলিশ কর্তৃপক্ষকে আদেশ দেন। স্বদেশী আন্দোলন সেই সময়ে দুটিভাগে বিভক্ত হয়ে চলছিল। একদল চরমপন্থী এবং অপরদল নরমপন্থী মনোভাবসম্পন্ন। নরমপন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের কাছে 'আবেদন-নিবেদন'-এর মাধ্যমে আলোচনার মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা। বিজয় চাঁদ এই নরমপন্থীদের মতকে গুরুত্ব দিলেন। তিনি ভাবতেন, চরমপন্থীদের আন্দোলনে দেশের মানুষেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বিশেষ করে মানুষেরা বেশি করে নিপীড়িত হবে। হিংসা এবং হত্যার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। তিনি বাংলার সমস্ত জমিদারদের জানিয়ে দেন যাতে চরমপন্থীরা সাধারণ মানুষদের উত্তেজিত করে ক্ষতি সাধন করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে চরমপন্থীরা বিজয় চাঁদের এই বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিতেন।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে এবং গৃহীত হয়েছে শান্তি প্রস্তাব। সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে সমস্যায় পড়লেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরকার বৈঠক করলেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হল। সরকার পরিশেষে বর্ধমান মহারাজ বিজয় চাঁদকে দায়িত্ব দিলেন এই কাজে। তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে বসলেন, আলোচনা করলেন, শেষে সমাধান সূত্র বেড়িয়ে এল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সরকার পক্ষ উভয়েই সম্মতি দিলেন।

মহারাজ বিজয় চাঁদ কাউন্সিলের মেম্বার থাকাকালীন দেশ ও দশের কল্যাণের কথা ভাবতেন। সেই সময় কলকাতায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-এর পদ খালি ছিল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন। তিনি যেন ওই খালি পদের জন্য উপযুক্ত পণ্ডিতের নাম সুপারিশ করে পাঠিয়ে দেন। সেই চিঠিতে আরও উল্লেখ ছিল, মনোনীত ব্যক্তি নিয়োগ পত্র হাতে পেয়ে যেন দেরি না করে কাজে যোগদান করেন। সেই চিঠি পাওয়ার পরে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পুনার একজন স্বানামধন্য পণ্ডিত ভাণ্ডারকর-এর নাম সুপারিশ করে পাঠান। সেই চিঠি পেয়ে বিজয় চাঁদ জানান, বাংলায় তো বহু বড়ো বড়ো পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, ফলে, তাঁদের বাদ দিয়ে বাইরে থেকে পণ্ডিত নিয়োগ করলে বিরূপ সমালোচনার সামনে পরতে হবে। সেই সময় বাংলার শীর্ষস্থানীয় সুপণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী মহোদয়ের নাম কাউন্সিলে পেশ করা হয় এবং তা অনুমোদন লাভ করে। শাস্ত্রী মহোদয়ই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। খিলাফত আন্দোলনের সময় কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্ররা আন্দোলনকে সমর্থন করে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এই বিষয়টি কাউন্সিল-এ উঠলে বিজয় চাঁদ ছাত্রদের অভিভাবকদের চিঠি দিয়ে জানান তাঁরা ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে ইচ্ছুক কিনা। এই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়কে চিঠি দেন, তাতে ছাত্রদের এই আচরণ বরদাস্ত করা যায় না। অভিভাবকরা চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়ে দেন। ঢাকার নবাব হবিবুল্লাহ এক চিঠিতে লেখেন, তাঁর বাবার সঙ্গে মহারাজ বিজয় চাঁদ-এর বন্ধুত্বপূর্ণ

নিবিড় সম্পর্ক ছিল। নবাব সাহেব অনুরোধ করেন, তাঁদের ও প্রজাদের মধ্যে যেন প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার বজায় থাকে। বিজয় চাঁদ ছিলেন উদারচেতা। তাঁর মনে ভুলক্রমেও কখনও সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব ছিল না। প্রতিবছর কোরবানি উৎসবে মহারাজ তাঁর মুসলিম প্রজাদের উট উপহার দিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের সহসভাপতি হিসেবে বিজয় চাঁদ সামসুল হুদা নামে এক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় বিজয় চাঁদ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তিনি বলেছিলেন, জনকল্যাণের জন্যই তিনি ওই কাজ করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার মেয়েদের লেখা-পড়ার উন্নতিকল্পে বর্ধমান রাজ বিজয় চাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। বর্ধমানে মহারাণী অধিরাণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়-এর প্রসারে উদার হস্তে অর্থদান করেন। তাঁর সম্পর্কে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'যিনি এত বড়োলোক হইয়াও মাতৃভাষায় অনুশীলন করেন, তাঁর মতো স্বদেশ হিতৈষী স্বজাতিবৎসল আর কে হইতে পারে। মহারাজ বিজয় চাঁদ যে শিক্ষাবিদ ছিলেন এই বিষয়ে তাঁর রচিত নিবন্ধ 'Defect of Modern Education of Bengal' শীর্ষক লেখাটি পড়লেই বোঝা যায়। বর্ধমান রাজ পরিবারে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে তাঁদের অবদান অতুলনীয়। মহারাজ বিজয় চাঁদ নিজে একজন সুলেখক ছিলেন। তিনি নিজে অনেক নাটক, নিবন্ধ গ্রন্থ, ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। তিনি অধ্যাত্ম পিপাসু ছিলেন। তাঁর বিলেত ভ্রমণের বই, Meditation- এর উপর বই—বই দুটিতেই মৌলিকত্ব বর্তমান। দু'শো বছর আগে বর্ধমান রাজ পরিবার পর্দানশীন মেয়েদের জন্যে পর্দায় ঢাকা বলদে টানা গাড়ির ব্যবস্থা করে মেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসতেন। এখনকার বর্ধমানে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে রমরমা ভাব তখন থেকেই শুরু হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

অ্যানি বেসান্ত

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও বর্ধমানের রাজ পরিবারের অবদান অনেক উচ্চে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড টেকনিক্যাল স্কুল অব বর্ধমান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই টেকনিক্যাল স্কুল চলতো বর্ধমানের মহারাজা, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও বর্ধমান পৌরসভার অনুদানে। এখন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এই কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম হল—নবকলেবরে মহারাজধিরাজ বিজয় চাঁদ ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি। যার খ্যাতি বর্তমানে ভারতজোড়া কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।

ডাক্তারি বিদ্যার প্রসারেও বর্ধমান মহারাজেরা অগ্রগণ্য। ১৯০৬ সালে বিজয় চাঁদ ইউরোপ বেড়াতে গিয়ে ওখানকার বহু প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে দেখেন। তিনি বর্ধমানে ফিরে এসে তৈরি করলেন মেডিক্যাল স্কুল। শহর বর্ধমানে শ্যামসায়রের পাড়ে তৈরি হল Lower Medical Faculty। দোতলা লাল রঙের বিশাল বাড়ি। এখানে ছিল উন্নতমানের পরীক্ষাগার, গ্যালারিসমন্বিত লেক্‌চার রুম। ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার হোস্টেল। এখানকার শিক্ষণ পদ্ধতি উন্নতমানের। পড়াতেন বহু স্বানমধন্য সাহেব ও বাঙালি ডাক্তাররা।

১৯১৫ সালে বর্ধমানে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন বর্ধমান মহারাজের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মুদ্রিত কার্য বিবরণী ও সংকলন গ্রন্থ এক অমূল্য সাহিত্য সম্পদ। অভ্যর্থনা—সমিতির সভাপতি ছিলেন মহারাজাধিরাজ বিজয় চাঁদ মহতাব এবং সহ সভাপতি ছিলেন রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কাপুর। এছাড়া বিভিন্ন শাখার সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভাপতি হয়েছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনিই ছিলেন সাহিত্য সভারও নির্বাচিত সভাপতি। ইতিহাস শাখার সভাপতি হয়েছিলেন ঐতিহাসিক শ্রী যদুনাথ সরকার। দর্শন শাখার শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হয়েছিলেন শ্রী যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

অধিবেশন শুরু হওয়ার বহু আগে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পণ্ডিতজনের কাছে প্রবন্ধ লিখে পাঠানোর অনুরোধ পত্র পাঠানো হয়, যে লেখাগুলি অধিবেশনে পাঠ হবে এবং মুদ্রিত আকারে স্মারক গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ পাবে।

দেওয়ানিরাজ বনবিহারি কাপুর

এই সম্মিলন তিনদিন অনুষ্ঠিত হয়। তিন, চার, পাঁচ এপ্রিল, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ। বঙ্গের সর্বত্রও বহির্বঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়। রেলওয়ে কনসেশন-এর ব্যবস্থা করা হয়। অধিবেশনের সময়ে সমাগত প্রতিনিধিদের জন্য থাকার জায়গা ও যান-বাহনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। অধিবেশন মঞ্চে দর্শক ও প্রতিনিধি মিলিয়ে সুধীজনেরা ছিলেন গড়ে দেড় হাজারেরও বেশি। প্রতিনিধিরা এসেছিলেন উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ ছাড়াও বিহার, ওড়িশা, অসম, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র থেকে।

সব মিলিয়ে তেইশটি বাড়ি নির্দিষ্ট ছিল প্রতিনিধিদের থাকার জন্য। তার মধ্যে কুড়িটি বাড়ি ছিল মহারাজের, দুটি বাড়ি শ্রী বনবিহারী কাপুর মহোদয়ের, একটি ছিল মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর। কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। বাসস্থানগুলির ব্যবস্থাপনাও খুব সুন্দর ছিল। তিনটি বাড়ি নির্দিষ্ট ছিল মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। একটি বাড়ি ছিল নিষ্ঠাবান হিন্দুদের জন্য। সম্ভবত তাঁরা ছিলেন স্বপাকী এবং কঠোরভাবে অন্যের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতেন।

প্রতিটি বাড়িতেই আমিষ ও নিরামিষ রান্নার ব্যবস্থা ছিল। নিরামিষাশী প্রতিনিধি ছিলেন শতাধিক। প্রতিটি গৃহে প্রতিনিধিদের জন্য নতুন মশারী রাখা হয়েছিল। প্রতিনিধিদের ব্যবহারের জন্য আলাদা চেয়ার, টেবিল, কাগজ, কলম, দোয়াত, প্যাড রাখা ছিল। প্রত্যেক বিছানায় একটি করে তালপাতার পাখা ছিল।

এই সম্মিলনের জন্য মোট চাঁদা উঠেছিল তিন হাজার দুশো সাত টাকা। মোট খরচ হয়েছিল ডাক-ব্যয়, মুদ্রণ, গাড়িভাড়া এবং একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে মোট খরচ হয়েছিল এক হাজার নশো সতেরো টাকা নয় আনা পাঁচ পাই।

কার্যবিবরণী থেকে পাওয়া যায়—প্রতিনিধিগণের আহার, যাতায়াত খরচ, ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদি, মণ্ডপ, গৃহসজ্জা, আলো, আসন ও আমোদ-প্রমোদের সমস্ত ব্যয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মান্যবর মহারাজাধিরাজ বহন করেছিলেন। এই সভার প্রথম অধিবেশন—৭ম সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুভেচ্ছা পান, সেটি পাঠ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অধিবেশনে সাহিত্য শাখার মোট প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল বত্রিশটি, দর্শন শাখার পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল আঠারোটি, ইতিহাস শাখায় পঠিত হয়েছিল বাইশটি প্রবন্ধ। তিনদিনই প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল। তৃতীয় দিনের অধিবেশনে প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়েছিল, উল্লেখ্য, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ছিল তিন দিনের—২০, ২১ ও ২২ চৈত্র ১৩২১ সাল। ইংরেজি ৩, ৪ ও ৫ এপ্রিল, ১৯১৫। পরের বছর যশোহর-এ এই সাহিত্য সম্মেলন হবে তা ঘোষণা করেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ও যোগদান করেছিলেন।

নাটক, বাউল সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল। প্রদর্শনীতে কৃষি, শিল্প, স্থানীয় উৎপাদন কাঞ্চন নগরের ছুড়ি কাঁচিও প্রদর্শিত হয়।

একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, চারটি শাখার অধিবেশন একত্র চলার ফলে অনেক সদস্য ইচ্ছে থাকলেও অনেক প্রবন্ধ পাঠ শুনতে পাননি।

সংস্কৃত কলেজ

বিজয় চাঁদ

সবশেষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বর্ধমানের মহারাজা সভাভঙ্গের ঘোষণা করেন অনেকটা সরসভঙ্গিতে। সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেছিলেন—'আমাদের এই সম্মিলন কতকটা রামলীলার মতো। সেও তিনদিনের ব্যাপার, এও তাই। সেখানকার রামকে তিনদিন সাজিয়ে কেবল বসিয়াই থাকিতে হয়, এখানকার সভাপতিকেও তাই করিতে হয়। এখন বাঁচিলাম। এইবার আসুন, সকলে আনন্দ করিয়া স্ব-রূপে ঘরে ফিরিয়া যাই।'

মহারাজ বিজয় চাঁদ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর ছেলে উদয় চাঁদ মহতাব রাজাসনে আসীন হন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি কোট-অব-ওয়ার্ডস-এর নির্দেশে মহারাজকুমার উদয় চাঁদ মহতাবকে সমগ্র এস্টেটের অবৈতনিক প্রধান ম্যানেজার এবং মনোরঞ্জন মৈত্রকে ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে মাসিক বেতনে নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি কাজকর্মে যথোপযুক্ত কুশলী কর্মী ছিলেন। রাজকোষে তখন ঘাটতি দেখা দেয়। কুচক্রী কর্মচারীদের অর্থ তছরূপ এবং পারিবারিক কিছু মানুষের অসহযোগিতার ফলে। উদয় চাঁদ নিরলস ও অমানুষিক প্রচেষ্টা ও খুরধার বুদ্ধির জোরে কুশলতায় ঘাটতি দূর করতে সমর্থ হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মধ্যে সাইত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণ এবং সাতষট্টি হাজার টাকা সুদসহ সমস্ত দেনা শোধ করে দেন এবং জানুয়ারির কিস্তি বাবদ অগ্রিম এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নশো টাকা সরকারের ঘরে জমা দেন। তাঁর এই কাজে মনোরঞ্জন মৈত্র সহ উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী রাজেন সেন ও রেবতীমোহন দত্ত প্রমুখের আন্তরিক নিষ্ঠা তুলনাহীন।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার অ্যাক্ট অনুসারে প্রতিটি রাজ্যে, আইনসভা গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর ফলে জনগণ অর্থাৎ সাধারণ, তপশিলি, মুসলিম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন নির্ধারিত হয়। উদয় চাঁদ সাধারণ আসনে প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়ান। সেই সময় তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন কংগ্রেস দলের গান্ধীবাদী কর্মী বিজয় কুমার ভট্টাচার্য মহোদয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উদয় চাঁদ বিজয়কুমারকে হারিয়ে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই আইনসভার মেয়াদ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়ার ফলে নির্বাচন আর হতে পারেনি। ফলে, উদয় চাঁদ মহতাব ১৯৪৭ সাল অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের সময় কাল পর্যন্ত সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার

পরে তিনি সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী স্পীকার নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে উদয় চাঁদ মহতাব কমিউনিস্ট নেতা বর্ধমানের সন্তান বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরীর কাছে পরাজয় বরণ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মহারাজধিরাজ উদয় চাঁদ মহতাবের মহীষী রাধারাণী দেবী প্রতিদ্বন্দ্বী সেই বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরীকে হারিয়ে উপমন্ত্রী পদ অলংকৃত করেন ডা· বিধান রায়-এর মন্ত্রিসভায়। এই সময় ভোটপ্রার্থী হিসেবে মহারাণী দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ভোট চেয়েছিলেন। মনে আছে, সেই সময় মহারাণী ভোট প্রচারে ইছলাবাদ হাইস্কুলে এসেছিলেন। আমার মা দেখতে এবং তাঁর কথা শুনতে গিয়েছিলেন। মায়ের মতো অনেক অন্তঃপুরের মহিলারা রানিকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেছিলেন। মা আমাকেও সেই সময় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। কিন্তু আজও তা স্মৃতিপটে উজ্জ্বল।

নবাব হবিবুল্লাহ

জমিদারি প্রথা বিলোপের পরে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মহারাজাধিরাজ উদয় চাঁদ তাঁর পূর্বতন পঞ্চদশ পুরুষের প্রিয় বর্ধমানকে ছেড়ে যাওয়ার আগে তাঁদের সুরম্য রাজপ্রাসাদ দান করে যান উচ্চশিক্ষাকল্পে। তিনশ একর সম্পত্তি সমন্বিত স্থানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজপ্রাসাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন স্থাপিত হয়েছে। এইসব গঠনমূলক কাজে ডা· বিধান চন্দ্র রায় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী জনপ্রিয় নেতা ফকির চন্দ্র রায়-এর শুভেচ্ছা ও সক্রিয়তা বর্ধমানের রাজ পরিবারের সঙ্গেই ছিলেন। প্রাসাদের অন্দরমহলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে MUA Womens Collage। তোষাখানায় মহারাণী অধি বালিকা বিদ্যালয়, ছাত্রী নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশাল রাজ-কাছারি ঘরে রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ জীউ দেবালয় সংলগ্ন হাভেলিটুকু দেবদেবী সেবাইতদের জন্য রেখে গেছেন, জীবদ্দশায় মহারাজ বিজয় চাঁদ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রী উদয় চাঁদের ছোটো ছেলে মহারাজকুমার প্রণয় চাঁদ মহতাবকে দেব সেবার ভার অর্পণ করেন। বর্তমানে তিনি একটি ট্রাস্ট কমিটি গঠন করেন। নাম দেওয়া হয় 'মহতাব ট্রাস্ট কমিটি'। এই কমিটি এখন বেশিরভাগ সময় বর্ধমান রাজ প্রতিষ্ঠিত দেব সেবা পরিচালনা করছে।

রাধারানী দেবী

মহারাজ উদয় চাঁদের ছয়টি ছেলে-মেয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ মহারাজকুমার প্রণয় চাঁদ-এর পড়াশুনা প্রথমে দার্জিলিং, এরপর দুন স্কুল, তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস নিয়ে এম এ এবং লন্ডনের School of Oriental and Africal Studies থেকে পি এইচ ডি অর্জন করেন।

খেলাধুলার ক্ষেত্রে বর্ধমান রাজের অবদান অনস্বীকার্য। রাজ পরিবারের নির্দিষ্ট কিছু খেলায় নিয়মিত তাঁরা অংশগ্রহণ করতেন। যেমন—ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার খেলা, বন্দুকের নিশানা অনুশীলন, পোলো খেলা অন্যতম। খেলাধুলা রাজ পরিবারে সীমিত না রেখে বর্থমান মহারাজাধিরাজ বিজয় চাঁদ মহতাব প্রথম সার্বজনীন পর্যায় খেলাধুলা ছড়িয়ে দেন। ১৯০১ সালে রাজা বনবিহারী কাপুরের পৃষ্ঠপোষকতায় বনবিহারী জেলা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

অ্যাথেলেটিক অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। রেভারেন্ড ললিত মোহন দে এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গিরীন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষের ছোটো ভাই অতুল চন্দ্র ঘোষ মহোদয়। বর্ধমান রেল স্টেশনের পাশে তৈরি হয় ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। এই ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডেই ১৯০৭ সালে প্রথম খেলাধুলা শুরু হয়। সেই সময় দুটি ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু ছিল। যে দুটি হল বনবিহারী লীগ কাপ ও বনবিহারী চ্যালেঞ্জ কাপ। স্থানীয় দল হিসেবে খেলত, মিউনিসিপ্যাল স্কুল, রাজ স্কুল, অ্যাথেলেটিক ক্লাব, রাজ কলেজ।

১৯২৯ সালে রাসবিহারী অ্যাথেলেটিক ইউনাইটেড ক্লাব আত্মপ্রকাশ করে। তারও আগে ১৯১২ সালে মেডিক্যাল স্কুল, বান্ধব সমিতি, ডায়মন্ড জুবিলি ক্লাব, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, আর এম সি এবং বর্ধমান অ্যাথলেটিক ক্লাব। চ্যালেঞ্জ কাপে কলকাতার ক্লাব অংশ নিত। ১৯১৮ সালের পর কয়েকটি মিলিটারি ফুটবল দল অংশ নিয়েছে। ১৯২৩ সালে বনবিহারী জেলা একাদশ ও মোহনবাগান এ সি কে ৩-২ গোলে পরাজিত করেছিল। এই বর্ধমান দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন ফণিভূষণ সামন্ত। দলের হয়ে গোল করেছিলেন—শ্যাম সুন্দর সামন্ত, হারান সেন ও জ্যোতিপ্রকাশ দে। ১৯২৪ সালে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, ভবানীপুর স্পোর্টিং ইউনিয়ন বর্ধমানে খেলে যায়। বিংশ শতকের ৬০-এর দশকেও বর্ধমান ফুটবল দল বনবিহারী জেলা একাদশ আই এফ এ শীল্ডে খেলছে। বর্ধমান রাজাদের সদিচ্ছায় বর্ধমানে শুরু হয় হকি, লনটেনিস, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলা। উল্লেখিত ক্যাপিং গ্রাউন্ড মাঠে আমরাও ফুটবল খেলা দেখেছি। প্রসঙ্গক্রমে বলি, এই মাঠে মহম্মদ রফি গান কয়েছেন, ইন্দিরা গান্ধির মিটিং হয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টির সর্ব ভারতীয় মিটিং হয়েছিল।

বর্ধমান রাজাদের পাশাপাশি রানিরাও জনকল্যাণ কাজে সদাতৎপর ছিলেন। মহারাণী বিষ্ণুকুমারী রাজকাজ নিরীক্ষণকালে বিশাল রাজস্ব জমা দিয়েও জমিদারি বজায় রেখেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি তৈরি করেছিলেন ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান কোটাল হাটে ১০৮ শিব মন্দির। অম্বিকা কালনায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে রামেশ্বর শিব মন্দির। রাণী ব্রজেশ্বরীর দেব-দেবী মন্দির স্থাপনের কথা পূর্বেই নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। মহারাজাধিরাজ উদয় চাঁদ-এর স্ত্রী মহারাণী রাধারাণী দেবী জনকল্যাণে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন বর্ধমানে। মহারাজ ছোটোকুমার ড· প্রণয় চাঁদ মহতাবের স্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী মহতাব উচ্চশিক্ষিতা। তিনি রাজ্য ইনট্যাক-এর চেয়ার পার্সন ছিলেন। তিনি একবার আমাদের বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে এসেছিলেন। সেই সময় আমি পোস্টিং ছিলাম। উনি আমার অফিস চেম্বারে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল রাজ্যের আর্কিওলজি সম্পর্কে। তাঁর গভীর জ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করেছিল। উনি এসেছিলেন ১৯৯০ সাল নাগাদ।

পরিশেষে বলি, বর্ধমান রাজাদের প্রায় তিনশ বছর রাজত্বে অনেক ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে টিঁকে থাকার কারণ হিসেবে কোষাগারে যেমন অর্থ এসেছে তেমনি তাঁদের জনকল্যাণমুখী কর্ম মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থান পেয়েছে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা (পুরুষ ও নারী), সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিত্রকলা, কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, খেলাধুলা, বিনোদন সব কাজেই রাজাদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল এবং অনুভূতি ভাণ্ডারকে স্থায়ীভাবে রূপ দেওয়ার জন্য, গ্রন্থ ছাপানোর জন্য উন্নত মানের ছাপাখানাও ছিল। সেই সঙ্গে অধ্যাত্ম চেতনা বিস্তারে দেব-দেবী সেবারও প্রচলন করেছিলেন বর্ধমানের রাজারা। তাঁরা ছিলেন পাঞ্জাবী। ক্ষেত্রী রাজ পরিবারের কুলদেবী চণ্ডিকা মাতার মন্দির। তাঁরা পাঞ্জাবী

হয়েও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের টান ছিল সুগভীর। বর্ধমানের রাজারা হিন্দু, মুসলমান, বুদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রিস্টান সকল ধর্মমতকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। রাজাদের লাইব্রেরি ছিল ভারতবর্ষের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরি। প্রথম হল মহীশূর মহারাজার লাইব্রেরি। এইসব দেখেই রায় গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র তাঁর বিদ্যাসাগর কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—'দেখি পুরী বর্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান/ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ/রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর/ভালোবটে জানিনু বিশেষ।'

গ্রন্থঋণ :

1. Bengal District Gazetteers—J.C.K. Peterson (March-1997)
2. Bardhaman Raj Itibritta—Nirodbaran Sarkar (First Published 2008)

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

(২) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর গ্রন্থাবলী

(৩) বর্ধমান ইতিহাস অনুসন্ধান (সম্পাদক: জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, গিরিধারী সরকার/প্রকাশক: দেজ পাবলিশিং)

(৪) উদয় চাঁদ গ্রন্থাগার—বর্ধমান ব্যক্তিঋণ: নীরদবরণ সরকার

লেখক পরিচিতি : *বিশিষ্ট কবি ও লেখক*

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ

বনকাটির পিতলের রথ

প্রণব ভট্টাচার্য

বন কেটে বসত কবে শুরু হয়েছিল তা বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। গড়জঙ্গলের গায়ে গা লাগিয়ে এই এলাকা। উত্তরে অজয়। গড়জঙ্গল থেকে নেমে এসেছে নালা। নালার নাম 'রক্তনালা'। পশ্চিমে 'গড়ঘাটা' কে রেখে 'পাষাণ চণ্ডী'।

বাগানের পাশ দিয়ে সে নালা গিয়ে মিশেছে অজয়ে। 'গড় ঘাটা' মানে গড়ে যাবার ঘাট। গড় জঙ্গলের ভিতর পর্যন্ত চলে গেছে এই নালা। কেন এই নাম? ল্যাটেরাইট রাঙা মাটি-র উপর জঙ্গল ভূমি। বর্ষায় সেই রাঙা মাটি ধোয়া লাল জল প্রবল বেগে গড়িয়ে আসে। তাই নাম রক্তনালা। আবার ধর্ম মঙ্গল কাহিনী-তে ইছাই-লাউসেন যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের রক্ত গড়িয়ে এসেছিল এই নালা বেয়ে। আবার ইছাই আরাধ্যা দেবী দশভূজা শ্যামারূপা-র তন্ত্র মতে পূজার সন্ধিক্ষণে শত সহস্রছাগ বলির রক্ত গড়িয়ে যায় এই নালা বেয়ে।

এই নালা দিয়ে আর অজয়ের জলপথে একদিন কত ব্যবসা বাণিজ্য হয়েছে। সে সব কথায় আমরা পরে আসব।

শুধু বনকাটি বললে ঠিক বোঝানো যায়না। অনেক বনকাটি আছে। আমাদের এই বনকাটি অযোধ্যা-বনকাটি এলাকায়। আর জোড়ে না বললে আমাদের মনও ভরেনা। আর অবস্থান বোঝাতেও সুবিধা। বনকাটি। পোষ্ট বনকাটি। জে এল নং-৩২।

এখনকার পশ্চিম বর্ধমান জেলা-র কাঁকসা থানা-র অন্তর্ভুক্ত এই এলাকা। সীমান্তবর্তী এলাকা। অজয়ের ওপারে উত্তরে বীরভূম। গঞ্জ ইলামবাজার। 'বীরভূমের প্রবেশ দ্বার'। শুধুমাত্র বীরভূমেরই নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গের প্রবেশপথ ইলামবাজারের উপর দিয়ে। ইলামবাজারের উপর দিয়েই চলে গেছে এখনকার পানাগড়-মোরগ্রাম হাইওয়ে। এই পানাগড়-মোরগ্রাম হাইওয়ের উপর 'এগারো মাইল' বাসস্ট্যান্ডে নেমে টোটো নিয়ে অযোধ্যা—বনকাটি-তে আসা যায়। বাসস্ট্যান্ড থেকে ৩ কিমি পথ। পাকা পিচ ঢালা রাস্তা।

যে দিক দিয়েই আসুন সে বোলপুরে নেমে বা পানাগড় বা দুর্গাপুরে নেমে স্টেট বাস; প্রাইভেট বাস সবই পাওয়া যায়।

দুর্গাপুর-বোলপুর বা দুর্গাপুরে ছেড়ে যে সব গাড়ি উত্তরবঙ্গের দিকে চলে যাচ্ছে সব গাড়িই থামে এই এগারো মাইল বাসস্ট্যান্ডে। কলকাতা-সিউড়ি বাসও থামে। আসার বা ফেরার কোনও সমস্যা নেই।

কেন আসবেন! 'গড় জঙ্গল' দেখবেন না। দেখবেন না বিখ্যাত ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি 'ইছাই ঘোষের দেউল'। দেখবেন না 'মন্দিরময় অযোধ্যা বনকাটি'-কে। আর এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিখ্যাত সেই বনকাটির পিতলের রথ।

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তার একটা ছবি আপনাদের মনে এঁকে দেবার। কিন্তু নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবেনা এই পিতলের রথের অলংকরণ-এর অসামান্যতা।

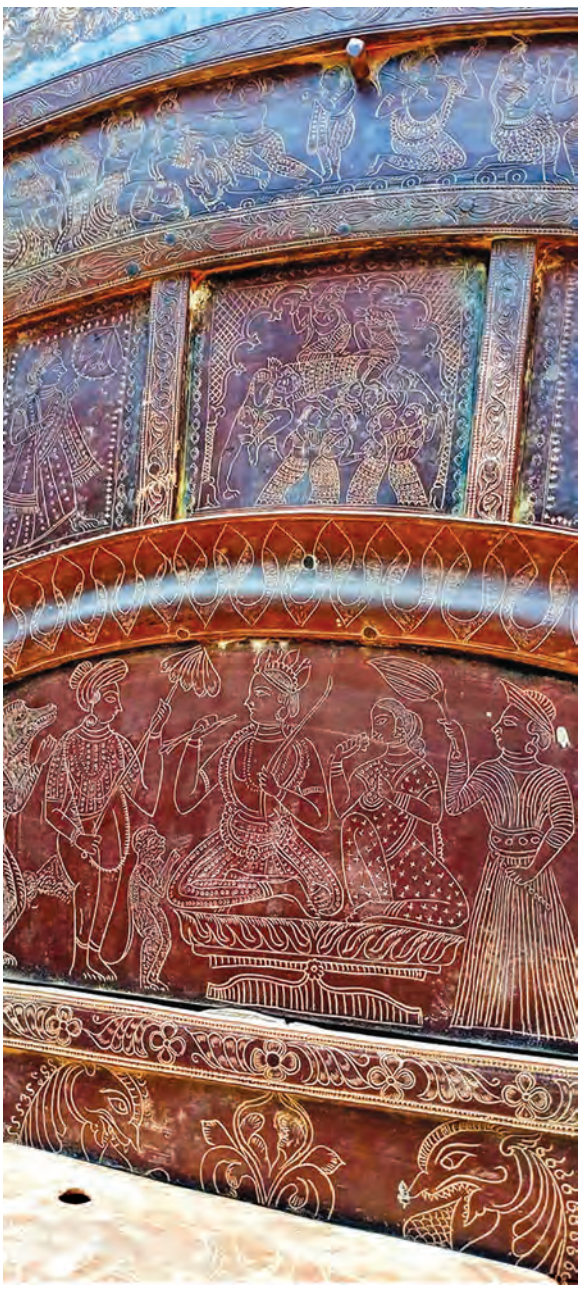

এখন আসা যাওয়া তো সোজা। কিন্তু এর শিল্প সুষমা-র সন্ধান পেয়েছেন শান্তিনিকেতনে আচার্য্য নন্দলাল। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে কমপক্ষে ২ বার এসেছেন। আনুমানিক '৪২ -'৪৩ সালে। ছাত্রদের দিয়ে স্কেচ করে বা রাবিং করে নিয়ে গেছেন।

এঁরা তো তখন এসেছেন হয়তো গোরু গাড়িতে চেপে।

মুকুল দে মশাই গোরু গাড়িতেই আসতেন। মৌখিরা-র জমিদার রায়বাবুদের আতিথ্য গ্রহণ করতেন। তাঁর তোলা সাদা কালো সব ছবি কথা বলে। সে সবই ইতিহাস। ওনার তোলা আমাদের এই বনকাটি-র পিতলের রথের যে ছবি সে অনবদ্য।

অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই বোলপুর-দুর্গাপুর বাসে চেপে 'এগারো মাইল' নামক গ্রামে নেমে পায়ে হেঁটে অযোধ্যা-বনকাটি পৌঁছেছেন। তাঁর 'দেখা হয় নাই' বইটি-তে চমৎকার বর্ণনা আছে।

"দীর্ঘ দিনের অনুসন্ধানের পর তারাপদ সাঁতরা মশাই সাহিত্য পত্র পত্রিকা-য় ১৩৭৭ খ্রীঃ বর্ষা সংকলনে জেলা ভিত্তিক ৪১টি পিতলের রথের তালিকা প্রকাশ করেন। কলকাতায় ২টি; বর্ধমানে ৪টি; বীরভূমে ৯টি; পুরুলিয়া-য় ১টি; বাঁকুড়া-য় ১২টি; মেদিনীপুর-এ ৬টি; মুর্শিদাবাদে ৪টি এবং হুগলি-তে ৩টি।"

"চিরাচরিত কাঠের রথের বদলে পিতলের রথ তৈরী হয়েছে নানা কারণে। প্রতিষ্ঠাতারা প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছিলেন বড় ভূস্বামী অথবা ধনী বণিক। অর্থব্যয়টা তাদের কাছে বড় কথা ছিলনা। একই আয়তনের কাঠের রথের থেকে পিতলের রথের খরচ অনেক বেশি পড়লেও তাঁরা কাঠের ক্ষয়িষ্ণুতা ও পিতলের দীর্ঘস্থায়িত্বের কথা বিবেচনা করে এই 'নতুন' সৃষ্টির দিকে ঝুঁকেছিলেন। 'নতুন' বলছি এই জন্য যে শ্রীযুক্ত সাঁতরা ও আমার দেখা যাবতীয় প্রতিষ্ঠালিপিসংবলিত পিতলের রথের মধ্যে বনকাটি-র নিদর্শনটি প্রাচীনতম"

এটির নির্মাণ কাল ১২৪১-৪২ বঙ্গাব্দ (১৮৩৪- ৩৫)

রথের সামনের প্রতিষ্ঠালিপিটি হুবুহু এখানে দেওয়া হল।

'সন ১২৪১ সান (ল!)তাঃ ২রা মাঘ আরম্ভ সন ১২৪২ সান (ল!) ১৫ ই আশাড় তোয়র'

সান-কে সাল ধরাই মনে হয় ঠিক। ব্রাকেটের ভিতরে (ল!) দেওয়া এই প্রবন্ধ লেখকের।

অর্থাৎ রথটি নির্মিত হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১৮৬ বছর আগে। ১৭৫৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৩২ ইংরেজি সালে নির্মিত হয়েছে

পঞ্চরত্ন অসামান্য টেরাকোটা অলংকরণ-এ সজ্জিত বিখ্যাত

গোপালেশ্বর শিব মন্দির। এই মন্দিরের আকৃতির অনুযায়ী পঞ্চচূড়া রথটিও নির্মিত হয়েছে। নির্মাতা সেই সময়ের বিখ্যাত ধনী লাক্ষা বা গালা ব্যবসায়ী

জমিদার রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিবার।

মন্দিরকে সামনে রেখে পিছনে ছিল দুর্গাদালান সমন্বিত; দ্বিতল বিরাট প্রাসাদ। সেই প্রাসাদে ছিল ভূগর্ভস্থ গুপ্ত কক্ষ।

সে প্রাসাদের একটি ভগ্ন দেওয়াল আজও দাঁড়িয়ে আছে।

কিভাবে যে এত বড়ো মোটা দেওয়ালের প্রাসাদটি এইভাবে ভেঙে পড়ল বা ইঁট কাঠ পাথর সব লুঠ হয়ে গেল; ভাবলে অবাক লাগে। হতে পারে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ধন রত্নের লোভে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। মাঝে প্রায় দু-শো বছরের ব্যবধান।

আজ আর কে বলবে—এর ভেঙ্গে পড়ার কারণ।

সেই সময়টাকে জানতে আমাদেরও পিছিয়ে যেতে হবে প্রায় দু-শো বছর আগে।

"অধ্যাপক হেনরি ব্লকম্যান এর মতে পাল আমলে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার আঞ্চলিক শাসন কর্তাদের 'ভূম' এর অধিপতিদের ভৌমিক রাজা নামে আখ্যা দেওয়া হত। বিভিন্ন সূত্র হতে বারোটি ভূম বা ক্ষুদ্র জনপদের নাম জানা যায়।

যথা বীরভূম; সেনভূম; শিখরভূম; গোপভূম; ব্রাহ্মণভূম; মানভূম; বরাভূম; ধলভূম; সিংভূম; তুণভূম; মালভূম; ভঞ্জভূম। উপরোক্ত ক্ষুদ্র জনপদগুলির মধ্যে সেনভূম; গোপভূম; শিখরভূম (আংশিক) বর্ধমান জেলার মধ্যে অবস্থিত।"

প্রাচীণ সেই গোপভূম; সেনভূম-এর যে জঙ্গল মহল এখনকার আউসগ্রাম এবং কাঁকসা থানা এলাকার উত্তরাংশ জুড়ে বিস্তৃত—যে জঙ্গলভূমি-র কথা উল্লেখ আছে হাণ্টার সাহেবের Annals of Rural Bengal-এ। মাত্র দুশো বছর আগে গুসকরা থেকে বরাকর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেই বনভূমি।

হিংস্র শ্বাপদের দল নির্ভয়ে বিচরণ করত এই জঙ্গলে। জঙ্গল কোথাও কোথাও এতই ঘণ ঘোর যে দিনের বেলাতেও সূর্যের আলো প্রবেশ করেনা। "মহাবৃক্ষ" রূপ শালই প্রধান বৃক্ষ।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে তো শালবৃক্ষকে মহাবৃক্ষই বলা হয়েছে। সেই বনভূমি সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অংশটি দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার স্বার্থে বিসর্জন দিতে হয়েছে।

এই জঙ্গলভূমি এবং বীরভুম সীমান্ত লাগোয়া বা তারও পশ্চিমের জঙ্গলভূমি-র নামই হয়ে গেছে ''লা মহল''।

মানে লাক্ষা মহল। প্রাকৃতিকভাবে প্রচুর লাক্ষা উৎপাদিত হয় এখানকার জঙ্গলভূমি-তে। শাল; পলাশ; পাকুড়; কুসুম গাছের ডালে ডালে লাক্ষা পোকারা (Coccus Lacca) তাদের দেহনিঃসৃত রস বা লালা দিয়ে বাসা বাঁধে। ঈষৎ হলুদ বা সাদা রঙের এই বাসা কিছুটা নলাকৃতি; বা গুটি গুটি।

কুসুম গাছের লাক্ষা সবচেয়ে ভালো। গাছের ডগার সেই সব ডাল কেটে নিয়ে আসে মূলতঃ আদিবাসী সাঁওতাল বা নিম্নবর্গের মানুষেরা। তারপর ডাল থেকে ছাড়িয়ে ভালো করে গুঁড়ো করে; জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। গরম জলে কার্পাস পাতা আর গন্ধক মিশিয়ে ফোটানো হলে তৈরি হয় 'যাবক' বা আলতা। আগে এই আলতা মহিলারা ব্যবহার করতেন। এটি ভালো রঞ্জক পদার্থও বটে। সাদা কার্পাস সুতো রাঙানো হত। তাঁতি বাড়ির মহিলারা সে কাজ করতেন।

ভালো করে ছেঁকে নিয়ে; আবার রোদে শুকিয়ে গনগনে আগুনের তাপে গলিয়ে বাজার জাত করার জন্য নানা আকারের ছাঁচে ফেলিয়ে গোলাকার; বোতামের মতো নানা আকৃতির গালা তৈরি করা হয়। চমৎকার প্রাকৃতিক এই রেজিন তৈরীর পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য থাকলেও মুল এইই।

এই গালার তখন বিশাল বাজার। বিদেশে যথেষ্ট আদর।

অজয়ের এপারের গ্রাম বসুধার 'লরি' বা 'নুরি'-রা ভালো গালা তৈরী করে। তবে ওপারে ইলামবাজার-এ ডেভিড আরস্কিন সাহেবের বিরাট কুঠিবাড়ি। তিনি এই লাক্ষা বা গালার ব্যবসা; নীলের ব্যবসাকে একটা বিরাট ব্যবসায়িক মাত্রা দিয়েছেন। একজন কুঠিবাড়ি-ভিত্তিক ব্যবসার সফল ব্যবসায়ী। সেদিনের গঞ্জ ইলামবাজার গড়ে উঠছে। Trade Centre of importance.

হান্টার সাহেবের Stastical Accounts of Bengal—1876-এ রয়েছে বড় বাণিজ্যিকভিত্তিতে গালার এই ব্যবসার উদ্বোধন ডেভিড আরস্কিন-এর হাতেই এবং নীল; গালা; কার্পাস বস্ত্র-এর ব্যবসার মাধ্যমে সেই সময়ে মরে যাওয়া সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থারও কিছুটা উন্নতি হয়।

কালীবাড়ি র গায়ের কাজ। বনকাটি র পিতলের রথে এই কাজ আছে।

ইলামবাজারের গালার কারিগররা বরাবরই ছিলেন।

তাঁরা ছোট আকারে ব্যবসা করতেন। গালার তৈরি নানা সামগ্রী তৈরি করতেন। গালা প্রস্তুতি-র কাজটা ভালোই জানতেন। আরস্কিন সাহেব সকলকে একত্রিত করে ব্যবসাটাকে বিরাট আকার দিয়েছিলেন।

২য় অংশ

সময়কাল বড়ই কণ্টকাকীর্ণ। ১৭৭০ এর (৭৬ এর) মন্বন্তর এর পর সব ছারখার হয়ে গেছে। এই মহা মন্বন্তরের পর বীরভূমের ৬০০০ গ্রামের মধ্যে ১৫০০ গ্রাম নিশ্চিহ্ন। কৃষিজমি সব পতিত পড়ে আছে। এপারের অবস্থাও তাই। ভাত খাবার চাল নেই। যে চাল এক টাকায় ২-৩ মন পাওয়া যেত সেইচাল টাকায় ৩ সের। তাও তো অমিল। এই দরে কিনবে কে। কাতারে কাতারে মানুষ মারা যাচ্ছে। সুপারভাইজার হিগিনসনের রিপোর্ট অনুযায়ী "বীরভূম বন্ধ্যা জনমানবহীন দেশ"। ১৭৭৯ সালে গরীব কৃষকদের স্বাভাবিক বিক্ষোভ দেখা দিল জমিদার আর কোম্পানির বিরুদ্ধে। কোম্পানির ট্যাক্স আদায় কমছে না বরং বাড়ছে। সারা বাংলা চষে বেড়াচ্ছে নানা ইউরোপীয় কোম্পানির লোকেরা। কোথায় হতে পারে কিসের ভালো ব্যবসা।

সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ প্রবল হচ্ছে। পশ্চিম থেকে নেমে আসছে দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল। তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে স্থানীয়রা। আরস্কিন সাহেবের কুঠিবাড়ির পাহারা সত্ত্বেও দিনের আলোয় ইলামবাজার লুঠ হচ্ছে। ভেঙে পড়েছে সাধারণের অবস্থা। শুকবাজারের তাঁতিদের বাঁচাতে সুরুল কুঠি থেকে সেপাই চেয়ে পাঠানো হচ্ছে। সেই ১৭৭৯ সাল। অজয়ের এপারে অযোধ্যা বনকাটির ধনী চট্টোপাধ্যায় পরিবারে ডাকাতি হচ্ছে।

১৭৯২ সালের সেই সময়ে গালা ব্যবসার একটা হিসাব ৫০০ মন গালার জন্য ১০,০০০ টাকা এবং ১৮০০ সালে ৫৪৪ মন গালার জন্য ৯৯১৫ মুদ্রা পেয়েছিলেন আরস্কিন সাহেব।

বনকাটিতে কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবার একসঙ্গে জোট বেঁধে থেকে একসাথেই নানা ধরনের ব্যবসা করেন। কাঠকয়লা; নানা বনজ দ্রব্য। পরবর্তীতে কয়লা। আর লাক্ষা তো প্রধান।

এঁদের মধ্যে মুখোপাধ্যায় পরিবার ব্যবসায় যথেষ্ট অগ্রণী।

বনকাটিতে মাল গুদামজাত করে পরে ছোট নৌকো দিয়ে রক্তনালা বেয়ে অজয়ের জলপথে নিয়ে যাওয়া।

অজয়ের শিমূলতলার ঘাট তখন খুবই কর্মব্যস্ত। গোরুর গাড়ির সার লেগেই আছে। মালের ওঠা নামা। মাল যাচ্ছে কুঠিবাড়িতে।

ইলামবাজার সাহেবকুঠির সঙ্গে ব্যবসা। আবার স্বাধীনভাবে ও ব্যবসা। ব্যবসা সূত্রে এখানকার বাবুরা পৌঁছে গেছেন কলকাতা। নানা সাহেব কোম্পানির সঙ্গে; ব্যবসায়িক হৌসের সঙ্গে স্বাধীন ব্যবসা। শোনা যায় উদ্বৃত্ত টাকা মুখোপাধ্যায় বাবুরা নিয়োগ করতেন অন্যভাবেও। এবং বিশাল ধনী হয়ে উঠছেন তাঁরা।

রায় পরিবারের বর্তমানে জীবিত প্রায় ৮০ বৎসর বয়সী শ্রী অনিল রায় মশাই-এর কাছ থেকে শোনা এই মুখোপাধ্যায় পরিবার তাঁদেরই বাড়ির জামাই। এঁরা তখন বসুধায় অবস্থান করছিলেন। বসুধার 'লরি'-দের গালা তৈরি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। সম্ভবত বসুধার 'লরি'-দের শিব মন্দির গুলির পূজারীব্রাহ্মণ। রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মশাই ব্যবসাটাকে ধরলেন দক্ষ হাতে। বিপুল অর্থাগম ছাড়া ঐ প্রাসাদ; মন্দির; বা পিতলের রথ তৈরি করানো সম্ভব নয়। ১৭০৪ শকাব্দ থেকে শুরু করে পরবর্তী ৫০-৬০ বছর ধরে চলেছে নানা নির্মাণকার্য্য।

শোনা যায়, একদিনের গালার ব্যবসার আয় থেকে না কি তৈরি করানো হয়েছে পিতলের এই রথ। তখনকার দিনে একটি মন্দির নির্মাণে খরচ হত ৮-৯ হাজার টাকার মতো। তাহলে লোহার ফ্রেমের উপর পিতলের পাত দিয়ে মোড়া এই প্রায় ১৫ ফুট উচ্চতার এই রথের খরচ কত হতে পারে তার হিসেব পাঠক মনে মনে করুন একবার।

রথটি প্রায় ১৫ ফুট উচ্চতার। ৮ টি লোহার চাকা। লোহার শক্ত ফ্রেম। প্রায় সমচতুষ্কোণ প্লাটফর্ম। ১ ম তলের দৈর্ঘ্য প্রস্থল ৬' ৫" আর ২ তলের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৪' ৫"। আগেই বলা হয়েছে পাঁচ চূড়া। প্রধান চূড়ার উপর বিষ্ণু চক্র। গোটা রথই লোহার ফ্রেমের উপর পিতলের পাত দিয়ে মোড়া। সারা গায়ে অজস্র অলংকরণ। এত তার বিচিত্রতা ; এবং স্বতঃস্ফূর্ততা যে অবাক হতেই হয়।

"নকশার নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট ধাতুশিল্পীরা মন্দির টেরাকোটা শিল্পীদের কল্পলোকেই শুধু বিচরণ করেননি। তাঁদের এবং পটুয়া শিল্পীদের আঙ্গিকেরও অনুসরণ করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। রামায়ণ; মহাভারতের উপাখ্যান; পৌরাণিক কাহিনী দশাবতার; সামাজিক মায় ফিরিঙ্গি জীবন চিত্র; শিকার; প্রমোদ ভ্রমণের দৃশ্য; ও অজস্র ফুলকারি নকশা স্থান পেয়েছে বনকাটির রথের গায়ে।"

সম্ভবতঃ খড়ি দিয়ে প্লেটের উপরে নকসা এঁকে নেওয়া হত।

তারাপদ সাঁতরা মশাই তাঁর অনুসন্ধানে 'খড়িপেত্যে' নামে এক শিল্পী গোষ্ঠীর নাম বলেছেন। তা যদি হয় একদল নকসা এঁকেছেন। আরেক দল খোদাই করেছেন। মাত্র ৬ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে হয়েছে। অর্থাৎ অনেককে নিয়োজিত করতে হয়েছে।

পিতলের পাত ধরে নেওয়াই যায় যে সেই সময়ের বিখ্যাত পিতল কাঁসার কেন্দ্র কেন্দুলী-টিকরবেতা বা আদুরিয়া-অমরপুর-এর কর্মকারেরা বানিয়েছেন। ঢালাই-এর যে কাজ আছে রথের 'মৃত্যুলতা' বা বর্শায় তা এখানেরই।

রথের সারথি; এবং দু-টি ঘোড়া তাও পিতলের। ধরে নেওয়াই যায় তা এখানের। স্থানীয় শিল্পী কারিগরদের সহায়তা আছেই।

আটটি ভারী চাকা। তার লোহার ফ্রেমিং অর্থাৎ কাঠামো বানানো; জোড়ের কাজ করা (এখন কার মতো ওয়েল্ডিং) এর যুগ নয়। সে বড়ো সহজ কাজ নয়।

আর নকসা অঙ্কনের কাজ যে বা যাঁরাই করে থাকুন না কেন তাঁরা অন্ততঃ টিকরবেতা বা অমরপুরের নন। এঁদের কাজের থেকে এখানের কাজ উচ্চাঙ্গের। রেখার চলন অনেক সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত। বাবুরা কলকাতা থেকে শিল্পীদের নিয়ে এলেন। এমন অনেক শিল্পী তো তখন আপার চিৎপুর এলাকায় ছিলেন। এলাকার প্রাচীন মানুষেরা বলেন মুখুজ্জে বাবুরা কলকাতা থেকে সবাইকে নিয়ে এসেছিলেন।

"শেষ মধ্যযুগে বাঙালী সূত্রধর শিল্পীরা কাষ্ঠ; পাষাণ; মৃত্তিকা ও চিত্র এই চারটির মাধ্যমে যে উচ্চাঙ্গের শিল্পচর্চা করে গিয়েছেন ঠিক এই সময়টিতে তার কিছু অবনতি ঘটলেও পাথরের স্থাপত্য ভাস্কর্য ছাড়া অন্যগুলি অল্পবিস্তর সজীবই ছিল। সেজন্য কাঠ খোদাই; পোড়ামাটির মন্দির অলংকরণ বা পটচিত্রের আঙ্গিকের সাথে পিতলের রথের নকশি কাজের বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়।"

"এই বইয়ের অন্যত্র সন্নিবিষ্ট বনকাটির পিতলের রথ থেকে আহৃত বলরাম ও বেহালা বাদিকার ছবি দুটি যে মন্দির টেরাকোটার সগোত্র তা যে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই নজরে পড়বে। আবার বলরামের ছবিটির সঙ্গে পটচিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। সেজন্য সূত্রধর শিল্পীরা যে পিতলের মাধ্যমে কাজ করেছেন এরকম একটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। যদিও এ বিষয়ে অকাট্য কোনও প্রমান নেই। তবে কাঁসারী বা কর্মকার সম্প্রদায়ের কারিগর যাঁরাই এ শিল্পের চর্চা করে থাকুন না কেন; সমকালীন সূত্রধর শিল্পীদের কলাকৌশল যে তাঁদের খুবই প্রভাবিত করেছিল তা সন্দেহাতীত।"

কে না মুগ্ধ হয়েছেন এই রথের অলংকরণ দেখে। এর সহজ; সাবলীল; স্বতঃস্ফূর্ত রেখার চলন দেখে। বিষয় বৈচিত্র্য দেখে। এত বিষয়ের সন্নিবেশ কমই দেখা যায়। মহিলা জিমন্যাস্ট; পাখি শিকার; চরকের দৃশ্য; সহ নানা সামাজিক চিত্রন। এই রথের অলংকরণ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন আচার্য্য নন্দলাল।

এই রথের একটি কৌতুককর চিত্রের অনুকরণে কালো বাড়ির গায়ে রিলিফ ভাস্কর্য করিয়েছেন। টিকিধারী পিঠ বাঁকা এক বৃদ্ধের পিঠে বসে বানরের ছানা। বেশ মজারই বটে।

বিশিষ্ট শিল্পী মুকুল দে খড়ের গাদার পিছনে অবহেলায় পড়ে থাকতে দেখেছেন অমূল্য এই শিল্পকীর্তিটিকে।

শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই এসেছেন কষ্ট করেই এগারো মাইল থেকে হেঁটে অযোধ্যা হয়ে বনকাটির এই রথের সামনে। তাঁর অমূল্য লেখা

থেকে এখানে নানা অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। শ্রী গুরুসদয় দত্ত মশাই বীরভূমের জেলাশাসক থাকাকালীন লোক শিল্পের সন্ধানে অবিশ্রান্ত ঘুরেছেন।

বীরভূমের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা ছিল। বারবার বীরভূমে ফিরে ফিরে এসেছেন। আর এ তো সংলগ্ন এলাকা। একই মাটি। মাঝে শুধু অজয়। এপার আর ওপার।

তিনি বলেছেন যেন গুটিয়ে রাখা পটচিত্রকে মেলে ধরা হয়েছে তার সকল সৌন্দর্য নিয়ে।

এই রথে রয়েছে দুটি erotic চিত্রণ। মুকুল দে মশাই লিখেছেন 'Among the engravings on the ratha there are also two erotic subjects. As this type of erotic engraving in temples is not common in Birbhum.'

পুরোহিত ব্রাহ্মণকে তিনি এই চিত্র দুটি কেন এই রথের গায়ে জিজ্ঞাসা করেছেন। ব্রাহ্মণ উত্তর দিয়েছেন, রথের মেলায় অনেকে দেখে আনন্দ পায়। তিনি যে খুব ভুল বলেছেন তা নয়।

মানুষ তো মজা পায়ই। মেলার মজা তো আলাদাই। গ্রাম বাঙলায় চাষের আগে রথের মেলা সে এক বিশেষ আনন্দ।

পাঁপড় ভাজা; গরম জিলিপি; আর ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দ।

এই erotic চিত্র দুটির বিষয়ে অন্যত্রও আমি লিখেছি। আমি যেভাবে দেখেছি। বুঝেছি শিল্পী মনকে।

রথের উপরের দিকের গঠন অনুযায়ী অর্ধবৃত্তাকার প্যানেল।

সেভাবেই সাজানো যুদ্ধের দৃশ্য। সৈন্য দলের যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য।

এই যুদ্ধে যাওয়াই কি শেষ যাওয়া! তার আগে শেষবারের মতোই কি নরনারীর শারীরিক মিলন ? দুপাশে দুটি মৈথুন দৃশ্য। ভাবায়।

যুদ্ধ অবিরাম। রথের গায়ে লিখিত 'কুরুক্ষেত্র'। সম্মুখভাগের প্রধান চিত্র ভীষ্মের শরশয্যা। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ। রাম-রাবণের যুদ্ধ।

আর একদিকে সবার উপরে 'নবনারীকুঞ্জর'।।

নীচে 'রাম-সীতার রাজ্যাভিষেক'।

আর এক দিকে লেখা 'সুধন্নার জুর্ধু'।

অপর এক দিকে 'অক্রুর গমন'। চৈতন্য লীলার নানা দৃশ্য।

শরশয্যায় ভীষ্মকে অর্জুন মাটিতে তীর নিক্ষেপ করে পাতাল গঙ্গা থেকে জল উত্তোলিত করে পান করাচ্ছেন।

নীচের দিকে থাকলেও 'সমুদ্র মন্থন' একটি অনেকগুলি ফিগার সমন্বিত চিত্র। প্রতিটি চিত্রেই শারীর সংস্থান বা কম্পোজিশন বেশ উঁচু মানের।

কি ধরনের ধৈর্য; নিষ্ঠা; শিল্পের প্রতি ভালোবাসা; শিল্পজ্ঞান থাকলে এই জাতীয় অঙ্কন সম্ভব ভাবলে অবাক হতে হয়।

নমস্য সেই সব শিল্পীরা। তাঁরা স্থানীয় বা আগত সূত্রধরই হোন আর কর্মকার যাই হোন না কেন তাঁরা রেখে গেছেন অমর এক শিল্পকীর্তি।

এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের আর এক নামী ব্যক্তির নাম শোনা যায়। শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়। পুরুষানুক্রমে সেবাইত নীলমণি রায় (বয়স ৬৭) তিনি শশীভূষণ-এর নাম করেন।

তিনি নাকি তেমনটাই বাপ ঠাকুর্দার কাছে শুনেছেন।

কিন্তু মুকুল দের লেখায় বা অন্যত্র রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর নামই আমরা পাচ্ছি। যদিও বিশাল ছিল না কি এই মুখোপাধ্যায় পরিবার। ব্যবসাসূত্রে এক শাখা কলকাতাতেই না কি বসবাস করতেন। আবার মারাত্মক কলেরায় এই পরিবারের কয়েকজন একদিনেই মারা যাওয়ায় তাঁরা স্থান ত্যাগ করেন।

আবার এমনটাও শোনা যায় যে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর অনেক গোপন অসাধু কারবারের কথা জানতেন এঁরা। বর্দ্ধমানের রাজা দের সাথে যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছিল। রাজা ত্রিলোকচাঁদকে ইংরেজরা আক্রমণ করতে পারে ভেবে রাজা সেনপাহাড়ী কেল্লায় অবস্থান করছিলেন। রাজা চিত্রসেন এই কেল্লা বানিয়েছিলেন। কামান এনে বসিয়েছিলেন। তার আগে ১৭৪০-৪৪ নাগাদ রাজা চিত্রসেন এই সেনপাহাড়ী পরগনার (বর্তমানের থানা কাঁকসা) পুনর্গঠনের কাজ করেছিলেন। রাজা ত্রিলোকচাঁদ ছিলেন স্বাধীন চেতা। সিরাজের বিরুদ্ধে যে

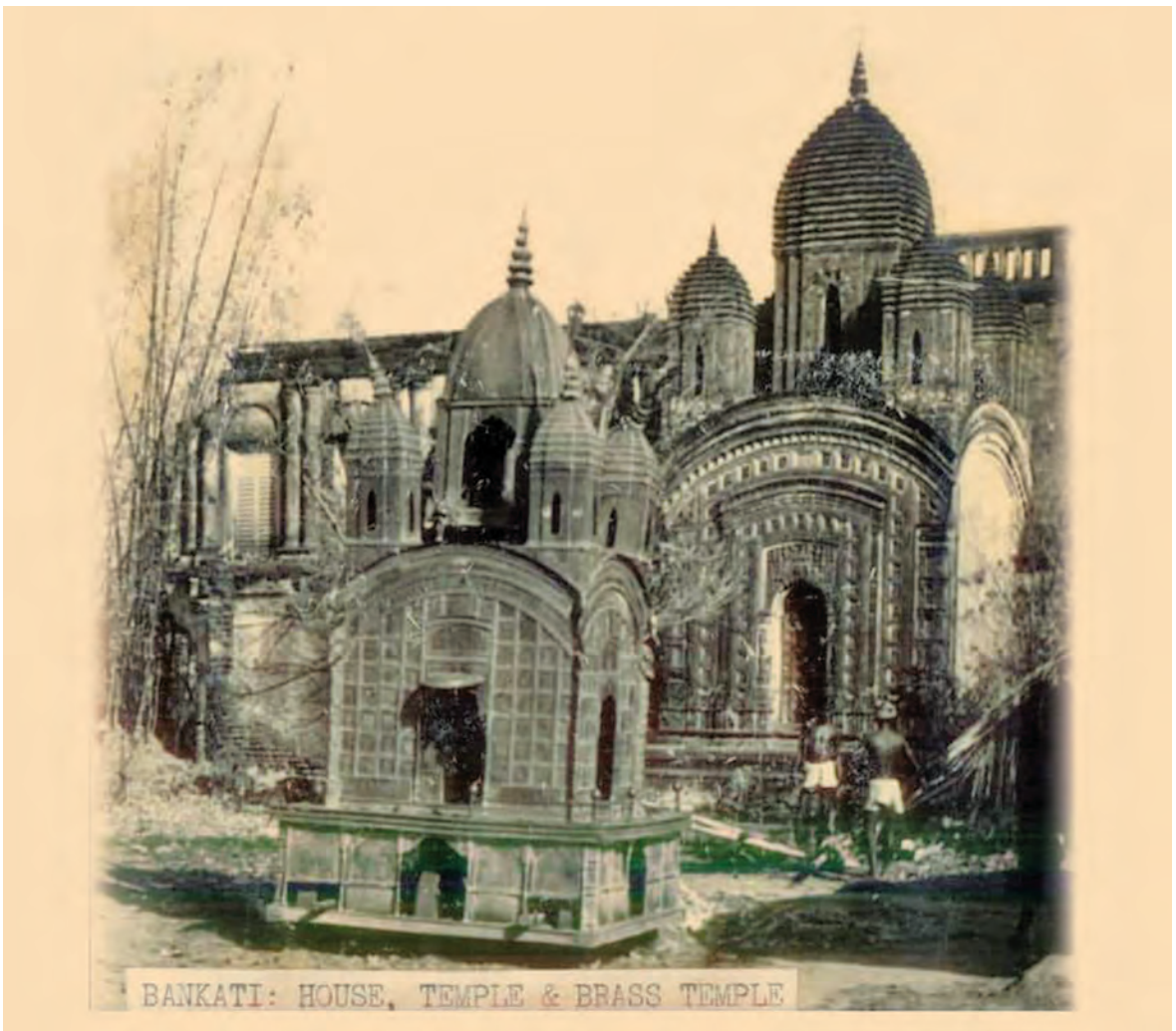

চক্রান্ত হয়েছিল তাতে তিনি এবং বীরভূমের পাঠান রাজা আসাদুল্লাহ খান যোগদান করেননি। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মহারাজ নন্দকুমার এর অভিযোগপত্র নিয়ে তখন মামলা চলছে। নন্দকুমার এর পক্ষে স্থানীয় বিশিষ্ট ধনী প্রভাবশালী জমিদাররা যাতে সাক্ষ্য দিতে না পারেন বা না দেন তার জন্য নানাভাবে চাপ তৈরি করা হয়।

শোনা যায় মেজর হোয়াইট নাকি এই মুখোপাধ্যায় পরিবার-এর উপর প্রবল চাপ তৈরি করেছিলেন। আক্রান্ত হবার ভয়ে রাতারাতি না কি এই স্থান তাঁরা ত্যাগ করেন বা ত্যাগ করতে বাধ্য করানো হয়। নানা জায়গায় তাঁরা ছড়িয়ে যান।

আর এক বাল্যের স্মৃতি এই রথের সব অলংকরণ চিত্র কপি করে নিয়ে গেছেন জনৈক মন মোহন দাস। বছরে একবার নিজেদের গাড়ি নিয়ে দিল্লি থেকে স্বামী স্ত্রী আসতেন। নীলমণি রায়ের পিতা প্রয়াত শম্ভুনাথ রায়ের বাইরের দিকে মাটির একটি কোঠা ঘরে তাঁরা থাকতেন। আর রথ চিত্র কপি করতেন।

নিশ্চিত ভাবেই ব্যবসায়িক কারণেই।

আগে রথটিকে তেঁতুল দিয়ে মাজানো হত। পিতলের রথ চকচক করত। সামগ্রিক খরচ বহন করতেন উখরার জমিদাররা। রাণী বিষ্ণুকুমারীর একটা সদর্থক ভূমিকা ছিল। তিনি ছিলেন উখরার হাণ্ডা জমিদার পরিবারের মেয়ে। পরবর্তীকালে তা বন্ধ হয়ে গেলে আর রথ মেজে পরিষ্কার করা হয় না।

রথের মেলা আজও বসে। আগে রথ যেত অযোধ্যা গ্রামের উত্তরে আমবাগানের 'রথ তলার ডাঙায়'। এখন আর এতটা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়না। অযোধ্যা-বনকাটি হাটতলা পর্যন্ত রথ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ছোট্ট গ্রামীণ মেলা বসে।

চারপাশের গ্রাম থেকে অনেক মানুষ এই মেলায় আসেন। রথের রশি ধরেন অনেক মানুষ ভক্তিভরে আর রথের বিগ্রহ এখানে জগন্নাথ নন। গোপাল বা গোপালেশ্বর।

''ভক্তেরা লুটায়ে সবে করিছে প্রণাম''।

গ্রন্থ সহায়তা ও অন্যান্য সূত্র ও সহায়তা—

(১) দেখা হয় নাই। শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) বীরভূম জেলা গেজেটিয়ার। ও ম্যালি

(৩) বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি। শ্রী যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

(৪) সাক্ষাতকার। শ্রী অনিল রায় বয়স ৮০।

(৫) শ্রী নীলমণি রায়। বয়স ৬৭।

(৬) শ্রী আশীষ মুখোপাধ্যায়। বয়স ৬৫।

(৭) নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং নিজের লেখা নানা প্রবন্ধ।

(৮) বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গনে। সম্পাদনা শ্রী স্বপন ঠাকুর। নিজের প্রবন্ধ।

(৯) সাপ্তাহিক বর্তমান। নিজের লেখা প্রবন্ধ।

(১০) রাঢ়ভাবনা পত্রিকা। সম্পাদক। শ্রী সৌরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

''বীরভূমের নীল গালা রেশম শিল্প। বিশেষ সংখ্যা।

(১২) ফেসবুক পোষ্ট। সৌজন্যে শ্রী সত্যশ্রী উকিল। শুভদীপ সান্যাল। ইন্দ্রনীল মজুমদার।

(১৩) চিত্র ঋণ। সত্যশ্রী উকিল।

লেখক পরিচিতি: আঞ্চলিক ইতিহাসের লেখক

অজয় নদ : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ডুবকিতে চাটি মেরে গ্রামের মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনামী গায়কের গেয়ে ওঠা 'মায়ের একফোঁটা দুধের ঋণ/শোধ হবে না কোনও দিন'—শুনতে শুনতে ভাবছিলাম গর্ভধারিণী ও নদী মায়ের ঋণ মানুষ কোনওদিনই শোধ করতে পারবে না। কিন্তু শোধ করা তো দূরের কথা। তার উল্টো ছবিই আমরা দেখতে পাই। মাকে দিয়ে অসছে বৃদ্ধাশ্রমে। আর অবৈজ্ঞানিকভাবে বালিমাফিয়ারা বালি তুলে নদীকে করে দিচ্ছে পঙ্গু। বর্ষাকাল ছাড়া তাকালে মনে হয় বালির তোষকে শীর্ণ অজয় নদ যেন ধুঁকছে।

অজয় নদের কথাই লিখতে বসেছি। উৎস থেকে মোহনা পযর্ন্ত অজয় নদের বয়ে চলার সেই কথকতায় উঠে এসেছে কত জানা-অজানা কথা।

ছোটনাগপুর থেকে যাত্রা শুরু অজয়ের। ঝাড়গ্রামের জামুই জেলার চাকাই পাহাড়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় এক হাজার ফুট। উৎপত্তি সেখানে। তারপর সাঁওতাল পরগনার দেওঘর মহকুমার (বর্তমান ঝাড়খণ্ডে) মধ্যে দিয়ে জসিডি, সারাথ, জামতাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। চিত্তরঞ্জন শহরের কাছে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। বর্ধমান, বীরভূম হয়ে হয়ে আবার বর্ধমানের কাটোয়ায় গিয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে।

ফিরে যাই অতীতে। দেখব, এই অজয়ের নাম তখন অজাবতী। কোথাও আবার অজয়া, অজসা। অজয়ের উত্তর অংশ উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ অংশ দক্ষিণ রাঢ়।

খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, বর্তমানের অজয় হল নদ আর অতীতের অজাবতী, অজয়া বা অজসা নামের জলরেখাকে কী বলা হতো, নদ না নদী। নদ ও নদীর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই নিয়ে নানা মত আছে।

একদল বিশেষজ্ঞ বলছেন, যার কোনও শাখানদী নেই এবং কম সংখ্যক উপনদী গ্রহণ করে তাকেই নদ বলে। অনেকের কাছেই এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ 'ব্রহ্মপুত্র'-কে নদ বলা হলেও শীতলক্ষ্যা ও যমুনা এর শাখানদী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অভিজ্ঞ অধ্যাপকের মতে, নদ ও নদীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল অ-কারন্ত বা পুরুষবাচক যেগুলি সেগুলি নদ আর আ-কারান্ত বা ই-কারান্ত অর্থাৎ স্ত্রী-বাচক যেগুলি সেগুলি নদী। তাই অজয়, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ আর গঙ্গা, যমুনা, তিস্তা প্রভৃতি নদী।

অজয়ের যাত্রাপথ অনেক উপনদীর মিতালীতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। যেমন, পাতরো,জয়ন্তী, হিংলো, সাউরা, টুমনি, কুনুর প্রভৃতি। পাতরো ও জয়ন্তী ঝাড়খণ্ডে অজয়ে মিশেছে। উখরার (বর্ধমান) কাছে ঝাঝরা গ্রামের কোনও এক জায়গায় কুনুর উৎপন্ন হয়েছে। মঙ্গলকোট থানার কো-গ্রাম ও নতুনহাটের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে অজয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, এখানে কুনুরের গভীরতা অজয়ের থেকে বেশি।

২৮৮ কিমি পথ পাড়ি দিয়েছে অজয়। ১৩৬ কিমি পথ বয়ে এসেছে ঝাড়খণ্ডে। বাকি ১৫২ কিমি পথ বয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে। অ্যারিয়ানের বিবরণী থেকে জানা যায়, কটুদীপ অর্থাৎ কাটোয়া নগরীর পাশ দিয়ে অমাস্টিস বা অজয়ের জলধারা প্রবাহিত। এই তথ্য থেকে আমরা দু-হাজার বছর আগে অজয়ের তীরে কাটোয়া শহরের অবস্থানের কথা অনুমান করতে পারি।

এইসব উপনদী অজয়ের যাত্রাপথকে বিস্তৃত করেছে। কমেছে নাব্যতা। হয়েছে খরস্রোতা। তাই বারে বারে দেখা দিয়েছে বিধ্বংসী বন্যা। অজয় পাড়ের বিখ্যাত, অখ্যাত গ্রাম কেবলই ভেসে গিয়েছে প্রবল জলস্রোতে। ভেঙেছে শান্ত সুন্দর গ্রামের নিকোনো বাড়িঘর। বালিতে ঢেকে গিয়েছে সবুজ শস্য খেত। চিরতরে। ১৯১৪, ১৯৭৮, ১৯৯৫, ২০০০ সালের বন্যায় এই একই চিত্র দেখা গেছে।

প্রত্নতত্ত্ব : অজয়ের ধারে

পাণ্ডুরাজার ঢিবি

অজয়ের দক্ষিণে পাণ্ডুক গ্রাম। বর্ধমানের আউসগ্রাম থানার এই গ্রামে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫ ও ১৯৮৫-তে উৎক্ষণন চলে। উৎক্ষণনের ফলে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলির ভিত্তিতে জানা যায়, এখানে প্রায় ৩০০০-৩৫০০ বছর আগে এক উন্নত মানব সভ্যতা ছিল।

রাজ্য পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় এই নিদর্শনগুলি রক্ষিত আছে।

এই নিদর্শনগুলির কালবিন্যাসের মাধ্যমে এই সভ্যতার ৬টি স্তরবিভাগ করা হয়। অর্থাৎ ৬টি সময়কালের বা যুগের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথম যুগ বা স্তর

১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই স্তরে পাওয়া গিয়েছে লালচে, ধূসর, বাদামী রঙের মৃৎপাত্রের ভাঙা অংশ। কালো বা খয়েরি রঙের মৃৎপাত্র বা ভাঙা অংশও পাওয়া গিয়েছে। পাওয়া গিয়েছে করোটি-বিহীন ৬টি কঙ্কাল।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ধাতুর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় যুগ বা স্তর

১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই স্তরে ৯টি মানবসমাধি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটি সমাধিতে ২টি শিশু-সহ ৩টি পূর্ণবয়স্ক মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায়। এদের প্রত্যেকটির পায়ের নিচের অংশ কাটা।

অন্য নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে তামার তৈরি চুরি, আংটি, কাজলকাঠি, বঁড়শি, বর্শাফলক, হরিণের শিং-এর তৈরি তীরের

ফলা, হাতির দাঁতের মাদুলি ধরনের জিনিস। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এগুলি তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার সুস্পষ্ট নিদর্শন। বিশেষভাবে নজর কেড়েছে শিমুল তুলোর তন্তুনির্মিত বস্ত্রখণ্ড। এর থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে সে যুগের মানুষ বস্ত্র ব্যবহার করত।

তৃতীয় যুগ বা স্তর

৮৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। এই তৃতীয় স্তরে একটি টেরাকোটা ধরনের মাতৃমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া পাওয়া গিয়েছে বহুছিদ্রযুক্ত নলওয়ালা জলপাত্র। পাওয়া গিয়েছে তামার তৈরি কানের দুল, লোহার তৈরি তরবারিযুক্ত অস্ত্র, তীর, কাস্তে জাতীয় অস্ত্র প্রভৃতি। পাওয়া যায় কালো ও পোড়া চালযুক্ত বস্তু।

চতুর্থ যুগ বা স্তর

৫৯৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই সময়কালের স্তরে একটি হাতলযুক্ত কড়াই, একটি হাপরযুক্ত উনুন পাওয়া গিয়েছে। ময়ূর সাপকে ধরে আছে এইরকম একটি মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল একটি শিলমোহর প্রাপ্তি, যেটির শিলালিপির পাঠোদ্ধার করা এখনো সম্ভব হয়নি। ক্রিট দ্বীপের মিনোয়ান সভ্যতার সঙ্গে এর মিল আছে বলে জানিয়েছেন একদল ঐতিহাসিক।

পঞ্চম যুগ বা স্তর

৩০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খিস্টাব্দ। এই স্তরে মাটির তৈরি নানাধরনের সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলি পালিশ করা। যেমন- ফুলদানি, পেয়ালা, জলপাত্র ইত্যাদি। এই স্তরের উপরের অংশ থেকে কণিষ্কের আমলের একটি মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে।

ষষ্ঠ যুগ বা স্তর

৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ। এই স্তরের উল্লেখযোগ্য একটি আবিষ্কার হল একটি পাতকুয়ো। এটি পোড়ামাটির রিং দিয়ে তৈরি। মাত্র ৩৬ বছর আগে, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে এটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে সেইসময় এখানকার মানুষ যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করে।

বীরভূমের বোলপুরের থেকে পূর্বদিকে ৭ কিমি দূরে বাহিরি গ্রাম। ১৯৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালায়। প্রাপ্ত উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র। প্রাচীন কৃষিজীবী নরগোষ্ঠীর বসতি হিসেবে এই প্রত্নস্থলটি চিহ্নিত হয়।

বোলপুর থেকে কিছুদূরে নানুর। সেখানে বিশালাক্ষী মন্দিরের পাশে একটি ঢিবিতে উৎখনন চলে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। আশুতোষ সংগ্রহশালার পক্ষে, কে জি গোস্বামীর তত্ত্বধানে এই উৎখনন চালানো হয়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চল শাখা খনন কার্য চালিয়ে এদের কৃষ্ণ-রক্তিম মৃৎপাত্র ব্যবহারকারী হিসেবে সনাক্ত করে। যে প্রত্নসম্পদ পাওয়া যায়,সেগুলিকে তাম্রাশ্মীয় পর্বের দুটি পর্যায়ের বলে চিহ্নিত করা হয়।

ফলে দেখা যাচ্ছে, অজয়-তীর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়ে এক সুপ্রাচীন সভ্যতা কীভাবে গড়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে উঠে আসে এর পাশাপাশি অঞ্চলগুলির নদী-তীরবর্তী কিছু অঞ্চলে প্রাচীনতার কিছু নিদর্শনের কথা। যেমন-ময়ূরাক্ষীর বাঁদিকে সাঁইথিয়ার কাছে কোটাসুর। আজও যেখানে একটি বিশালকায় প্রদীপকে দ্রৌপদীর সঙ্গে যুক্ত করে নানা কাহিনির বর্ণনা চলে। যেমন বক্রেশ্বর নদীর বামতীরে হাট-ইকরা, কোপাই-তীরে মহিষদল বা মহিষাজল প্রভৃতি। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, খননকাজ কিছু করলেও সেভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু করেনি। তথ্য কিছু পাওয়া গেলেও জানতে পারেনি সাধারণ মানুষ। নিদর্শন যা পাওয়া গিয়েছে সেসব নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতায়। স্থানীয় ইতিহাসপ্রেমী মানুষদের মধ্যে স্বভাবতই কৌতুহলের পাশাপাশি দানা বেঁধে আছে ক্ষোভও। এইসব প্রত্নসামগ্রীর একটি মিউজিয়াম থাকলে বীরভূম, বর্ধমানের প্রতি যেমন পর্যটকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেত, তেমনি স্থানীয় মানুষেরাও এসব চাক্ষুষ করে আরও বেশি করে স্থানীয় ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী হত।

লেখক পরিচিতি- আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষক ও লেখক

জেলায় জেলায় শিক্ষাঙ্গন

বাংলার মানুষ সনাতন ভারতের সেই বাণীকে হৃদয়ের গভীরে স্থান দিয়েছে বহু বছর আগে থেকে। দূর দূরান্ত থেকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃত টোলের মাধ্যমে শিক্ষাচর্চা চলত। যেমন চলত মাদ্রাসার মাধ্যমেও। এই অঞ্চলে বাণিজ্য করতে এসে ইংরেজরা শাসনক্ষমতাকে ধীরে ধীরে মুঠোবন্দী করে। পাশ্চাত্যের নবজাগরণের ঢেউ এসে পৌঁছায় এই অঞ্চলে বিদেশিদের মাধ্যমে। শুধু ইংরেজ নয়, জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে নানা বিদেশি বণিকেরা বৃহৎ বঙ্গ জুড়ে তাদের কাজকর্মের প্রসার ঘটায়।

এই অঞ্চলে রাজা, জমিদার, নবাবদের সঙ্গে যারা প্রশাসনিক কাজে যুক্ত ছিলেন, তারা বাংলার শিক্ষিত সমাজের মানুষ। বছরের পর বছর কাজ করতে করতে তারা ক্রমশ দক্ষ হয়ে উঠতেন।

বাংলার গ্রামসমাজ ছিল 'আত্মনির্ভরশীল' গ্রাম সমাজ। আজও যদি পুরোনো গ্রামগুলিতে যাওয়া যায়, দেখা যাবে, বিভিন্ন পাড়ায়, বিভিন্ন পেশার মানুষ বাস করে। ছোট ছোট গ্রামগুলিকে নিয়েই বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্বের কাছে পৌঁছেছিল বহু যুগ আগেই।

অনার্য বাংলায় আর্যের আগমন ঘটে অনেক দেরিতে। এখানে তার আগে এক উন্নত কৃষি-সভ্যতা ছিল। অনার্য মানুষদের কিছু গোষ্ঠী এই নদী-সংলগ্ন অঞ্চলে নিজস্ব জীবনসংস্কৃতির ঘরানায় অভ্যস্ত ছিল। আজও আছে। অনেকটা সেইরকমই।

এখানে আর্যদের আগমন ঘটে। কিন্তু অনার্য সংস্কৃতি মুছে যায় না। একধরনের স্বীকরণের মাধ্যমে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে এবং বঙ্গসংস্কৃতির একটি নিজস্ব ধারা গড়ে ওঠে। একসময় বলা হতো, এই শস্যশ্যামলা অঞ্চলের মানুষ কিছুটা অলস প্রকৃতির। এখানে যেহেতু সহজে শস্য উৎপাদিত হত, এখনও হয় তাই মানুষ অনেক অবসর পেত। শিল্প তাই এখানে কৃষির পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে। তেমনি, মানুষ অবসর পেয়েছে মানস-চর্চার। ভাবনা-চিন্তার জগৎ প্রশ্নে প্রশ্নে আকুল হয়েছে। কাব্য-মহাকাব্যের ধারার বিন্দু বিন্দু জল সিঞ্চিত করে এই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের হৃদয়। উদর পূর্তির জন্য খাদ্যের কথা ভেবেছে। কাজ করেছে। জমি চষেছে। ঠিকই। কিন্তু মন-চষার কাজটা নিয়ত করে চলেছে। অবসর মজেছে আধ্যাত্মিকতায়। এই জীবনের অর্থ বুঝতে চেয়েছে। জীবনের পরেরও কোনও জীবন আছে কি না তার ভাবনাতেও অধীর হয়েছে বাংলার

মানুষ। এই ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদে গেয়ে উঠেছে গান। বিষয় গভীরতায় ধরা পড়েছে একই ভাবনা।

পারিবারিক পেশার সঙ্গে বংশপরম্পরায় যুক্ত হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই দক্ষ ও অভীজ্ঞ কর্মীর অভাবও খুব তীব্র ও প্রকট হয়ে ওঠেনি। সংসার চালিয়ে নেওয়ার জন্য মানুষ তার নির্দিষ্ট কাজ করত। এক পেশা থেকে আরেক পেশায় ঝাঁপিয়ে পড়ত না। যদিও একাধিক ধরনের কাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত কারণে যুক্ত থাকত। নিজের ও সংসারের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসই নিজে হাতে তৈরি করার চেষ্টা করত। তবে সেটা পেশা হতো না। কামারের কাজ কামার বা কুমোরের কাজ কুমোর করত। কৃষকের কাজ কৃষক করত। তবে কমবেশি সকলেই কৃষিকাজ জানত।

উচ্চবর্ণের মানুষেরা শিক্ষাগ্রহণ করত, শিক্ষাদানও। নিম্নবর্ণের মানুষেরা শিক্ষাঙ্গন থেকে অনেক দূরে ছিল। শিক্ষিত সমাজ মাতার উপরে ছিল। বাকি সমাজ ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন ও শ্রমমুখী ও সেবামূলক কাজে ব্যস্ত থাকত।

বিদ্যান সর্বত্র পূজ্যতে—এই কথা সকলের মধ্যেই ছড়িয়ে গিয়েছিল। গ্রামীণ পাঠশালা বা টোলের চৌহদ্দিতে সকলের প্রবেশের অধিকার ছিল না। ম্লান মুখে শিশুরা দূর থেকে দেখত। শিশুর মা-বাবারা দেখত। পরনে ওদের পোশাক নেই। ধূলি-ধূসরিত চেহারা, পেটে খিদে।

এই অঞ্চলে নানা জনজাতির বাস। সমাজ নানা জাত আর জাতিতে তখন বিভক্ত। তেমনি অর্থ-কৌলিন্যেও। 'Have' আর 'Have not'—সমাজের দুটো ভাগ। একদলের কিছু নেই। আরেকদলের সব আছে। এই চরম বৈষম্য বাংলার সমাজব্যবস্থায় শুধু নয়। অর্থব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলে খুব দৃঢ়ভাবে ছিল। আজও কিছুটা আছে।

চর্যাপদ-এর আবিষ্কার আমাদের এই প্রান্তিক মানুষের জীবনযাবন ও জীবন-দর্শনের হদিশ দিয়েছে কিছুটা। এই অঞ্চলের প্রান্তবাসীদের জীবনসাহিত্য আজও যেমন অনেকটাই একইরকম ছিল কয়েক দশক আগেও। আবার এখানেই বহুযুগ ধরে ঝলমলে জীবনের ধারায় আমাদের আজও চোখ ঝলসে যায়।

বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য থেকে যে প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির সন্ধান মিলছে সেটা এই অঞ্চলের মানুষকে গর্বিত করছে। সন্দেহ নেই কোনও। বিভিন্ন গবেষণার ফলে যে সব তথ্য উঠে আসছে সেগুলিও আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সে ভাষা বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই হোক বা কৃষি ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রেই হোক। কিংবা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়ের ক্ষেত্রেই হোক।

বর্তমানে যে পৃথিবীতে আমরা আছি, সেখানে জ্ঞানের আলোর কোনও বিকল্প নেই। এই যুগটাকেই বলা হয় জ্ঞান-যুগ (knowledge-age)।

মানুষের জানার ইচ্ছে অপরিসীম। আর এখন জ্ঞানও মুঠোবন্দী। সকলের হাতে হাতে জ্ঞানভাণ্ডার। এক আঙুলের স্পর্শে খুলে যায় জানার জগৎ। কিন্তু সকলের কাছে কি এই জগৎ উন্মুক্ত? কীভাবে সেটা সম্ভব হল? একদিনে তো নয়! ঠিকই। দীর্ঘ প্রয়াসের ফলেই আজ আমরা সকলেই মুক্ত জীবনের জগতে বিচরণ করছি।

এই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে, একটু আমাদের আবার পিছন ফিরে তাকাতেই হবে।

আজকের পশ্চিমবঙ্গ একটি ছোট্ট রাজ্য। কিন্তু এই অঞ্চলে বহুযুগ ধরে যেভাবে শিক্ষার বিস্তার ঘটে চলেছে সেই প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটু স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার।

বর্তমান ভারতবর্ষ ও প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে এই অঞ্চলের সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। প্রাচীন এবং মধ্যযুগই শুধু নয়। আধুনিক যুগের সূচনালগ্ন কীভাবে এই অঞ্চলের মানুষকে প্রভাবিত করল জ্ঞানচর্চায় সেকথা বিস্তারিতভাবে এবং বিশ্লেষণাত্মকভাবে আলোচনা ও জানার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে গুরুগৃহে থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হতো। আর্যসংস্কৃতিতে জীবনকে চারটি আশ্রমে ভাগ করা হতো। একে বলা হত 'চতুরাশ্রম' প্রথা। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। জীবনের প্রথম পর্বে ব্রহ্মচর্য অর্জন করতে হত। এই ব্রহ্মচর্য অর্জনের মধ্যে যে গভীর দর্শন লুকিয়ে আছে, সেই বিষয়ে না ঢুকেও আমরা জেনে নিতে পারি মূলত এইসময় কি করতে হতো।

সেইসময়, উচ্চবিত্ত মানুষের সন্তানদের সঠিকভাবে 'মানুষ' করার জন্য গুরুর কাছে পাঠানো হতো। গুরু তাকে বাকি জীবন সুন্দর ও সফলভাবে অতিবাহিত করার জন্য তৈরি করে দিত। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতীয় উচ্চতম দর্শনের বাস্তব প্রয়োগের ধারাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বইয়ে দেওয়া হতো। তাদেরই এই জ্ঞানচর্চার অধিকার ছিল যারা সমাজের মাথায় থাকা পরিবারে জন্মগ্রহণ করত। এই জ্ঞানচর্চার বা শিক্ষার সুযোগ সকলে পেত না। শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি।

যে গুরুগৃহে এই উচ্চবিত্ত সন্তানেরা জীবনের প্রথম অংশটি কাটাতেন, তাদের সবধরনের সুখ ও আরাম থেকে দূরে থাকতে হতো। কঠোর, কঠিন এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তারা জীবনের শিক্ষা অর্জন করত। নিজেদের এইভাবে গড়ে তুলতো সেই দরিদ্র গুরুগৃহে। দারিদ্র্য ছিল খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। গুরু ছিলেন এক ধ্যানী জ্ঞানী ব্যক্তি। সত্যের আলোয় পথচলা মানুষই শুধু নন, পথ দেখানোর গুরুগিরিই তিনি করতেন। সত্যনুসন্ধান বড়ো কঠিন ব্রত। তাই শিক্ষার্জন ছিল সবচেয়ে কঠিন কাজ। এর জন্য প্রয়োজন অসীম ত্যাগ। গভীর অন্ধকারের মধ্য থেকে আলোক বিন্দুর দর্শন সাধনালব্ধ।

এই জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন বিপুল শক্তির। আর ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে সেই শক্তির মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা হত যা জ্ঞানশক্তির ভাণ্ডার হয়ে ওঠায় সাহায্য করত। আমরা জানি, knowledge is Power। কিন্তু এই 'Power' অন্য 'Power'-র রূপান্তরের ফলেই সম্ভব।

ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। এই ছিল ভারতীয় জ্ঞানসাধনার প্রকৃত মন্ত্র। শিক্ষার্জন তপস্যা বিনা হয় না। এই তপস্যার জন্য সঠিক পরিবেশ প্রয়োজন। গুরুরা থাকতেন তপোবনে। সেখানকার নির্জনতায়, প্রকৃতির শক্তির মাঝে শরীর, মন বিকশিত হতো। চিন্তার গভীরে চলে যাওয়া যেত সহজে।

তারপর ফিরে এসে শুরু হতো কর্মের জীবন। গার্হস্থ জীবন। কেউ নিতেন পিতার প্রজাপালনের ভার, কেউ বা নিতেন পিতার রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব নিতেন একে একে এই সফল শিক্ষার্থীরা। তখন আবার তাদের পিতামাতার বাণপ্রস্থে যাবার সময় হয়ে গিয়েছে।

এই জীবনচরিত কিন্তু কেবলই উচ্চবিত্তের। প্রান্তিক মানুষেরা এই 'বৃত্ত' থেকে বহু দূরে।

বুদ্ধদেব, রাজপুত্র হয়েও ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে ভাবিয়েছিল। বাস্তব জীবন তাঁকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছিল। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার দেওয়ার কথা ভাবলেন তিনি। তিনি 'মানুষ'-এর কথা ভাবলেন। বিশেষ কোনও বৃত্তের মানুষের কথা নয়। সমগ্র মানবসমাজের কথা ভাবলেন। ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে উঠছিলেন হিমালয়ের পাদদেশে ছোট্ট এক রাজ্যের রাজপুত্র। সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে চললেন সত্যের খোঁজে। 'বোধি'জ্ঞান লাভের পরে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে দান করলেন পাঁচ শিষ্যের মধ্যে। সারনাথ-এ। তারপর নানা স্থানে ছড়িয়ে দিলেন এই সত্য। জীবনপথের সন্ধানী মানুষেরা জড়ো হল একে একে তাঁর কাছে। সমাজের প্রান্তিক মানুষ, যাদের কোনও শিক্ষার

সুযোগ ছিল না, তাদের কাছে জীবনসত্যকে পৌঁছে দিতে লাগলেন বুদ্ধদেব ও তাঁর অনুগামীরা। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভিত আলগা হতে লাগল। সংস্কৃত ভাষার বদলে এল পালি ভাষার দিন। বুদ্ধদেবের সময় সাধারণ মানুষেরা সংস্কৃত ভাষা জানত না, জানত পালি ভাষা।

সেই সময় বুদ্ধদেবের জীবনদর্শনে আকর্ষিত হল একের পর এক রাজা। অর্থকৌলিন্যের কারণে গঙ্গা তীরবর্তী মগধ, কাশী, কোশল সহ বিভিন্ন জনপদে তখন বণিককুলের প্রতিপত্তি। ক্ষত্রিয় রাজারা শক্তির কেন্দ্রে। বুদ্ধদেবের কাছে নতমস্তকে এঁরা জ্ঞানভিক্ষা চাইছেন। এইভাবে দিকে দিকে সব বেড়া ভেঙে মানুষ ছুটল বুদ্ধের জ্ঞানপ্রদীপ হাতে

নিয়ে। গড়ে উঠল মঠ। জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র। ছড়িয়ে পড়ল সব সীমারেখা ছাড়িয়ে। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্রেরা আসতে লাগল। জ্ঞানের পাঠ দিতে শিক্ষকেরা চললেন দূরদেশে। এক বিস্তৃত সময় ধরে এইভাবে জ্ঞানচর্চা চলল। গড়ে উঠল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। সময় পাল্টাতে থাকে। ধীরে ধীরে মূল কেন্দ্র থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশ কমতে থাকে। আবার মাথাচাড়া দেয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শক্তি।

এই বাংলায় পাল-রাজত্বের অবসান ঘটে। শুরু হয় সেন রাজত্ব। সুদূর দক্ষিণ থেকে আসা 'সেন বংশ' বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সূচনা করে। ধীরে ধীরে এখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতির জায়গায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শিকড় পোতা হয়। কিন্তু খুব বেশিদিন সেই আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। ঘোড়া বেচার ছলে চলে এলো বখতিয়ার খিলজি। বাংলায় ইসলামের এই প্রবেশ নতুন যুগের সূচনা করল।

ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। সমাজব্যবস্থায় এল পরিবর্তন। শুধু ধর্ম নয়, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, শিল্পকলা, এক কথায় সবকিছুতে লাগল পরিবর্তনের ছোঁয়া। শিক্ষাক্ষেত্রেও এল নতুন যুগ। সংস্কৃত টোলে যা পড়ানো হত, জীবিকার ক্ষেত্রে সেটা হয়ে পড়ল অপ্রয়োজনীয়। ইসলামি শাসকেরা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষা সংস্কৃত নয়। যে ভাষায় শাসনকার্য চালায় সে ভাষা সংস্কৃত নয়। সাধারণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেটাও সংস্কৃত নয়।

তাই 'টোল' নয়, মানুষ যেতে লাগল মক্তবে, মাদ্রাসায়। রাজনৈতিক পালাবদল অনেক পালার বদল ঘটায়। চিরকালই বাংলার ইসলামি যুগ এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে অবশ্যম্ভাবী রূপে। বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ইসলামি সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় শাসনব্যবস্থায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠা পায়।

নিজ ধর্মে থেকেও অনেক রাজভাষা শিক্ষা করে উপার্জনের সুযোগ পায়। পারসী ভাষায় তখন রাজকার্য বা প্রশাসনিক কাজকর্ম চলত। আরবী ভাষাও শেখানো হতো। মাদ্রাসা ও মক্তবের মাধ্যমে শিক্ষাদান চলত। ইসলামি ধর্মচর্চা ও কোরাণ পাঠের শিক্ষাদান, ব্যাকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান চলত। অনেক হিন্দুও মক্তবে যেত এইসব ভাষা শিক্ষার জন্য। মসজিদ বা সংলগ্ন এলাকায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হতো। তৎকালীন বাংলায় নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃতচর্চা তথা হিন্দুদের শিক্ষার কেন্দ্র। এগুলিকে টোল বলা হতো। বাংলার শান্তিপুর ও কুমারহট্টেও এরকম অনেক টোল ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্রেরা এইসব টোলে আসত। এইসব কেন্দ্রগুলি গঙ্গা-তীরবর্তী। সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম এইসব জায়গায় মক্তব গড়ে ওঠে। এগুলিও নদী-তীরবর্তী ও উপকূলবর্তী।

বর্তমানে টোলে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, পৌরোহিত্য ও দর্শন পড়ানো হয়। নদিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, কোচবিহার, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা এবং কলকাতাতেও কিছু টোল আছে। সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাজ্যে বর্তমানে টোলের সংখ্যা ৪২৭টি। নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে টোলগুলিকে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য নানাদিক থেকেই দাবি আছে দীর্ঘদিনের। ৫০৯ জন পণ্ডিতও আছেন এই টোলের জন্য। শতাব্দী-প্রাচীন এই টোলগুলিকে নিয়ে সরকার সক্রিয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা করছে। টোলে দুটি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। 'আদ্য' ও 'মধ্য'। যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের সমতুল। 'মধ্য' পাশ করলে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা করলে 'উপাধি' পাওয়া যায়। স্নাতকোত্তর পাশ করলে 'আচার্য' হওয়া যায়।

ইংরেজ আমলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা শাসকদের ভাবনায় গড়ে ওঠে। সেও এক দীর্ঘ ইতিহাস। বর্তমানে মধ্যযুগের ধারার ক্ষীণ প্রবাহের পাশাপাশি চলছে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা রাজ্যের জেলায় জেলায় উচ্চশিক্ষার একটা চিত্রকে ধরা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কলেজ বা মহাবিদ্যালয়ের একটি তালিকা প্রকাশ করে।

শিক্ষা বিস্তারের সুদীর্ঘ ইতিহাস গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। এই বিভাগে ধারাবাহিকভাবে সেকথাই তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

ঝাড়গ্রামে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

রাজভবনে নতুন মন্ত্রিসভার শপথের পর মুখ্যমন্ত্রী

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের
সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলির
৪৯ তম জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা।
বেহালায়, সৌরভের বাড়িতে।
৮ জুলাই, ২০২১।

ভবানীপুরে উপনির্বাচনে জয়ের পর (ওপরে)। ৩ অক্টোবর, ২০২১।
ক্ষমতায়ন। রাজ্যের নতুন মহিলা মন্ত্রীরা, একসাথে, শপথের পর (নীচে)। ১০ মে, ২০২১।